হে মোর দুর্ভাগা দেশ

৩য় পর্ব্ব—মৃত্যুঞ্জয়

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

ভারতের মৃত্যুঞ্জয় আত্মার উদ্দেশে—

বর্ত্তমান গণসংঘাতের বিপর্য্যয়কর দিনে মানবচেতনা যে বলিষ্ঠ রূপ গ্রহণ করবার জন্য জননী-জঠরে ভ্রূণরূপে অধিষ্ঠিত, তার প্রকাশবেদনায় ধরিত্রী-জননী আজ অধীর। মানুষের দুশ্চর তপশ্চর্য্যার শিব-সুন্দর মূর্ত্তি একদিন প্রকাশিত হবে মর্ত্ত্য-ভূমিতে, সেই অনাগত সম্ভাবনার পূর্ব্ব-সংকেত রূপায়িত করতে চেয়েছেন শিল্পী এই পুস্তকে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পর্ব্ব একত্রে একখানি পুস্তক,—বর্ত্তমানখানি তৃতীয় পর্ব্ব—'মৃত্যুঞ্জয়'। রসজ্ঞ পাঠক বইখানি পড়ে আনন্দ লাভ করলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করবো।

নিবেদক,—

জ্যোতি প্রকাশ।

আকাশের বিস্তীর্ণ পটভূমিকায় আদিত্যের আবির্ভাব ঘটলো; আনন্দে অভিসিঞ্চিত ভারতভূমি। স্বাধীনতার সূর্যোদয় হয়েছে। স্বাধীনতা—যার জন্য কোটি প্রাণ বলি হয়েছে—লক্ষ লক্ষ আজও কারান্তরালে।

জীবনকে জানবার জন্য ভারতীয় ঋষি সাধনা করে গেছেন। "আদিত্যবর্ণং পুরুষং মহান্তং"—তাঁকে জানতেই হবে—নান্য পন্থা! তাঁকে জানবার সাধনায় হাজার বছর কেটে গেছে, হয়তো হাজার হাজার বছর। যে সাংস্কৃতিক গরিমায় উদ্ভাসিত ভারত পৃথিবীর পথনির্দেশ দিয়ে গেছে জীবনের পর জীবনের মহিমোজ্জ্বল দেবভূমির দিকে, সেই দিগদর্শন আজ মৃতভাষার রুদ্ধদ্বার পিরামিডে বন্দী, মমীতে পরিণত হয়ে দিন গুণছে; কে জানে, কবে আবার হবে তার উদ্ধার? স্বাধীনতার এই মহামহোৎসবের দিনে হয়তো আশা জাগছে তার গোপন অন্তরের অন্তঃপুরে;—দিন আগত ঐ।

মানবজীবনের মহিমোজ্জ্বল প্রভাত আজ। ভারতের যুগার্জিত সাধনবাণী উদ্ধৃত হয়ে আবার শান্ত তপোবনের সামমন্ত্রে উদ্গীত হবে,—এমন আশা করা কি অন্যায়, নাকি উচ্চাশা! সাম্য-মৈত্রী করুণার বেদধ্বনি, আর্ত্ত-অসহায়-নিপীড়িত মানবতার অবসানমন্ত্র আজ আবার উচ্চারিত হবে। ভারতের সাধনালব্ধ মৃত্যুঞ্জয় মহাকালের আজ ঘুম ভাঙলো। পৃথিবীর সুপ্রভাত!

কিন্তু কে জানে সে-দিন সত্যি ফিরবে কি না! ফেরাবে কি না আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ! আজ নব জাগ্রত বিজ্ঞানমুগ্ধ জগৎ মৃত্যুকে

অতিক্রম করে অমৃত লাভের সাধনা করে না—মৃত্যুকে আহ্বান করে এ্যাটোম বোমের আঘাত হেনে, অভাবকে সৃষ্টি করে আহার্য্যকে অগ্নিসাৎ করে—মানুষকে যন্ত্র করে তোলে অর্থনীতির যান্ত্রিক ব্যবহারে। মানুষকে শাসন করে যে ক্ষুধা এবং কামনা তাকে শাণিত করবার জন্য আজকার মানুষ অনন্যপরায়ণ। লোভের অত্যুগ্র নেশায় তাকে অন্ধ করে দিয়েছে, তার বিবেক বুদ্ধিকে আড়ষ্ট করে তুলেছে। যদি কোনোদিন এই ধূলার ধরণীতে মানবতার উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে আজকার দম্ভী মানুষদের জন্য কী শাস্তি তাঁরা ঠিক করবেন, চিন্তার বিষয়। অথচ, আজকার মানুষ বলে, জ্ঞানে-গুণে-গরিমায় তারা অতীত পৃথিবীর মানুষদের থেকে অনেক এগিয়ে এসেছে। হয়তো এসেছে, কিন্তু হারিয়ে এসেছে তার মনুষ্যত্ববোধ, তার দয়া, ক্ষমা, ত্যাগমহিমার উচ্চতম বৃত্তি; তার জীবন-সাধনার শান্তি-মন্ত্র, সত্যবাণী।

মানুষের জগতে কি কোনোদিন মানবতার উচ্চতম আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে না—যেখানে আইনের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই আইন—মনুষ্যত্বের দিক থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য, মানবত্ববোধে উন্নীত করবার জন্য থাকবে কয়েকজন সুমহান মহা বিচারক?

নিরর্থক আশা! মানুষ কোনদিন তার অতীতের মানবত্ববোধে জাগবে না। পশু থেকে নিজকে যেদিন সে পৃথক বলে বুঝেছিল, নিজকে মানুষ বলে চিনেছিল, সেইদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে তার লোভ, তার দম্ভ, তার উচ্চাশা! শক্তির মত্ততায় শাসননীতিকে সে অমানুষ করে তুলেছে, শোষণ নীতিকে সে সমর্থন করার আইন সৃষ্টি করে নিয়েছে, প্রভুত্বস্পৃহাকে সে পুরুষার্থ বলে ভেবে নিয়েছে।

কিন্তু আজও এই সুপ্রাচীন ভারতভূমির রুদ্ধদ্বার তপোবনের অতীত ঐশ্বর্য্যে রয়েছে মানবতার মর্ম্মবাণী—মৃত্যুঞ্জয় হবার মহামন্ত্র! আজকার নবলব্ধ স্বাধীনতার চক্রলাঞ্ছিত বৈজয়ন্তীতে সেই বাণী উচ্চারিত হোক, উদ্ভাসিত হোক, উল্লসিত হোক! নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়!

অগণ্য বাস্তুহারার মিছিল চলেছে। মানবতার বিকৃত, বীভৎস মূর্ত্তি! মহাযুদ্ধ-মন্বন্তর আমরা পার হয়ে এলাম। স্বাধীন হোল ভারত, কিন্তু মানুষ আজ গৃহহারা, সর্ব্বস্বহারা। এই হৃতসর্ব্বস্ব মানুষের জন্য দরদী রাষ্ট্র বলে চলেছেন, ভয় নাই, অবিলম্বে সব ঠিক হয়ে যাবে—অনতিবিলম্বে নিশ্চিত শান্তি, নিশ্চিন্ত আরাম, নিরবচ্ছিন্ন নিরাপত্তার সব ব্যবস্থা পাকা করে তোলা হচ্ছে—ভয় নাই।

শিশুরাষ্ট্র, জনপ্রিয় সরকার, গণসেবা-প্রতিষ্ঠান! মানুষ মেনে নিল সবই, স্বীকার করে চলেছে সহস্র দুঃখ, অযুত জীবনবলি! রকমারী পরিকল্পনার আশ্বাস, আর অজস্র বিশেষজ্ঞের আবির্ভাবে সারা দেশ আচ্ছন্ন, অন্নহীনের মোগলাই পোলাও খাবার দুঃস্বপ্ন।

বাস্তুহারার দল চলেছে, পথে প্রান্তরে, মাঠে-ঘাটে-বাটে। জীবনের সব সংস্কৃতিটুকু হারিয়ে ওরা আজ যাযাবর। নিঃসীম আকাশের তলায় ওরা আজ নিঃস্ব—ঐশ্বর্য্যময় বসুন্ধরার বুকে ওরা আজ ঐতিহ্য, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নশেষ, পুঁথীর কীটদষ্ট পত্রশেষ, উচ্ছিষ্ট অন্নের অবশেষ। তাদের জন্য চোখের জল নয়—মৃত্যুর অমৃত দাও!

কিন্তু এতখানা নিরাশার কি কারণ আছে? আবার ওরা ঘর বাঁধবে, আবার জীবনে সুপ্রতিষ্ঠ হবে, সৃষ্টি করবে নূতন ইতিহাস, নবীন ঐতিহ্য। সমাজের স্তরে স্তরে ওরা আনবে নবীন রক্তের উল্লাস—নব যৌবনের আনন্দ! হয়তো আনবে, হয়তো তার পূর্ব্বেই ওরা শেষ হয়ে যাবে—কে জানে!

দলে দলে ওরা আসছে পশ্চিমবঙ্গে। প্রান্তর গ্রাম হয়ে যাবে, নগর হয়ে যাবে কত শ্মশান। এই তো সময় অর্থার্জ্জনের! মানুষের দুস্থতার দুর্ব্বলতাকে এই ভাবেই তো কাজে লাগাতে হয়!

খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়বে বড় বড় অক্ষরের বিজ্ঞাপন, "সায়ন্তনী"—'সম্ভ্রান্ত অভিজাত বাস্ত-হারাদের আবাসভূমি। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যকর প্রান্তরে, অজয়ের উত্তর তীরে সুন্দর নিসর্গ দৃশ্যের পটভূমিতে সায়ন্তনী গড়িয়া উঠিতেছে। অভিজাত বাস্তহারাদের আবেদন অগ্রগণ্য!'

বাস্তহারাদের আভিজাত্য শব্দটা থেকে কি বোঝায় জানা নেই! স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে যদি কোনো আভিজাত্য থাকে তাহলে এঁরা অভিজাত আছেন আজিও। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তা নয়! আর্থিক সম্পদ যাঁদের বেশি আছে, বিজ্ঞাপন দাতাদের কাছে তাঁরাই অভিজাত। প্রচুর টাকা জমা দিয়ে এঁদের দরজায় অহোরাত্র ধর্ণা দিলে যে-কেউ অভিজাত হতে পারে। যে জায়গায় এই সায়ন্তনী গ্রাম পত্তন হচ্ছে, সেটা সত্যি ভাল জায়গা—মিঃ চাটার্জ্জি কয়েক বারই গেছেন সেখানে ইতিপূর্বে! তিনি নিজে অভিজাত, ব্যাঙ্কের অংশীদার—নামডাক যথেষ্ট। তাঁকে কেন্দ্র করে একটি কোম্পানী গড়ে উঠেছে এই 'সায়ন্তনী' গ্রামের পত্তনের জন্য। হাজার বিঘা জমি নাকি কেনা হয়েছে, এবার বিলি হবে—দশ কাঠা, পনর কাঠা, কুড়ি কাঠা—এর কমে কোনো প্লট নাই! কারণ এখানের ব্যবস্থা সবই অভিজাতদের জন্য! বাড়ী, গাড়ী—গ্যারেজ, ঝি-চাকরদের ঘর, বাগান ইত্যাদি ওর কমে হয় না। পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে নাম রেজিষ্টারী করলে আপনি ঐ অভিজাত পরিবারের অন্যতম হয়ে উঠতে পারেন—তার কমে নয়।

বিরাট অফিস খোলা হয়ে গেছে—বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে। বাড়ীটা মিঃ চাটার্জ্জিরই। উচ্চহারে ভাড়া দিয়ে জনকয়েক অভিজাত

বাস্তুহারা এখানে আশ্রয় পেয়েছেন। তাঁরাই মিঃ চাটার্জিকে ধরে এই কাজে নামিয়েছেন। কিন্তু কাবেরী হঠাৎ গোল বাধালো একদিন।

—টাকা শীকারের যদি এটা অন্যতম উপায় হয়ে থাকে বাবা, তাহলে তুমি অন্ততঃ যোগ দিও না—ও বললো এসে বাবাকে।

—টাকা শীকার করা মানুষের ধর্ম্ম মা কাবেরী!—বাবা বললেন!

—হ্যাঁ—সৎ পথে। ফাঁদ পেতে নয়, ঝোপের আড়ালে থেকে গুলি করে নয়···

—তোকে কে বললো যে আমরা ফাঁদ পেতেছি, কাবেরী?

—তোমার মেয়ের বুদ্ধিটা তোমার থেকে কম ধারালো নয় বাবা, ও সব বুঝতে আমি পারি। আমার জন্যই যদি এই মহাসম্পদ তুমি অর্জন করতে চাও তো এখানেই থামো। ও টাকা আমার ভোগে লাগবে না!

মেয়েকে চেনেন মোহিতবাবু। তর্ক করলে ওর জেদ বেড়ে যাবে। এখনকার মত ওকে থামানো দরকার। তাই বললেন,

—তুই ভুল শুনেছিস মা কাবেরী, কিম্বা ভুল বুঝেছিস। ঘর ছেড়ে যারা আজ পথে বসেছেন তাদের জন্য ঘর করে দেওয়া মানুষের ধর্ম্ম। টাকা অবশ্য কিছু রোজগার হবে এতে। কিন্তু সেটা অসৎ উপায়ে নয়।

—সত্যি তোমরা ঘর করে দেবে ওদের?

—হ্যাঁ—অসত্যি হবে কেন?

—নিত্যি হাজার রকম নগর-পত্তনের বিজ্ঞাপন দেখি। এত নগরে থাকবে কে—কে জানে। কিন্তু অনেকের মুখে শুনলাম, টাকা দিয়ে নাম রেজিষ্টারী করেছে আজ বছরের উপর, কোথাই বা জমি আর কেইবা বিলি করবে! কত কোম্পানী এর মধ্যে উধাও হয়ে গেছে।

—খুব কমই হয়েছে এমন! কিন্তু তোর বাবা অন্যায় কিছু করবে না!

—ঐ ফটো-গ্রাফারটাকে আমার ভয় করে বাবা, ওকে অন্ততঃ বাদ দাও।

—সে এ ব্যাপারে নিতান্তই নগণ্য।

—নগণ্যের গণ্য হতে বেশি দেরী লাগে না বাবা, এমন কি মান্য হয়েও উঠতে পারে।

—আচ্ছা, সে আমি দেখবো—হেসে বললেন মিঃ চ্যাটার্জি।

কাবেরী চেয়ারের হাতলটায় বসে ছিল। ওর হাতে উল আর কুরুশ; কি-যেন বুনছে। মাঝে মাঝে এই সব করে ও। ভেতর থেকে ডাক এল। কাবেরী উঠে গেল মার কাছে। মা রান্না ঘরে ঠাকুরকে উপদেশ দিচ্ছেন। কাবেরীকে রান্না শেখাবার চেষ্টা প্রায় বছর খানেক থেকে আরম্ভ করেছেন উনি। কাবেরী শিখে ফেলেছে। কিন্তু মার কাছে বলতে চায় না। সে জানে,—রান্না শিখেছে জানলেই মা তাকে পুরোপুরি রান্নাশালায় নিযুক্ত করে দেবেন। গান গাওয়া, বই পড়া, সেলাই বুননের জন্য যেটুকু সময় হাতে আছে, সব ডুবে যাবে ঐ ধোঁয়ার অন্ধকারে। আর এত রান্না শিখে করবে কি কাবেরী? যার জন্য এ সব শিখতে হয়, সে যে করে আসবে, কে জানে! হয়তো আসবেই না। মুখ খানা কালিমাঙ্কিত হয়ে উঠলো ওর মুহূর্তের জন্য।

—অজিত সিংহ খাবে আজ এখানে, জানিস তো?

—অজিত সিংহ কে আবার?—কাবেরী ঠোঁট উল্টে বললো!

—কেন, সেই যে সুন্দর ছেলেটি, তোর বাবার কাছে আসছে কিছুদিন!

—ওমা, সেই যার পিছন দিকটা মেয়েদের মতন?

—ওর মাথায় চুল আছে, তাই ওরকম দেখায়। সামনেটা দেখিস, খুব সুন্দর দেখতে।

—তাতে আমার কি? ঐ দাড়ীওয়ালা লোকটাকে আমি বিয়ে করতে যাব নাকি? আশ্চর্য্য মা তুমি!

—তোকে বিয়ে করতে বলছি না হারামজাদী! শোন, বিয়ে তুই কাকে করবি, তা তুই জানিস; আমি আর কিছু তোকে বলছি না, ও আজ খাবে রাত্রে; মাংসটা রান্না কর।

নিরুপায় কাবেরী হাতের উল আর কুরুশকাঁটা ঝির হাতে দিয়ে রান্না ঘরে ঢুকলো। ওর মা চলে এলেন ওর বাবার কাছে। মিঃ চাটার্জি স্ত্রীকে দেখে শুধুলেন—কিছু বলছো?

—হ্যাঁ, শোনো তো একটু!

—যাই। মোহিত বাবু উঠে এলেন অন্য ঘরে। মিসেস চাটার্জী বলতে লাগলেন,

—মেয়েটাকে কেন দুঃখ দিচ্ছ বলতো! ও কোনো সিংহ বাঘকে নেবে না।

—ময়ূর কোথায় পাব?

—ময়ূর ত চাইছে না—ও চাইছে সেই ধর্ম্মের ষাঁড়টাকে।

—তার মানে?

—মানে, ও ভালবাসে ইন্দ্রজিৎকে। ইন্দ্রজিৎ আছে কোথায়, খবর নাও।

—কি করে বলবো সে কোথায়? তাছাড়া সে কি যোগ্য নাকি তোমার মেয়ের?

—যোগ্য-অযোগ্যের কথা পরে, মেয়ে তোমার ওকেই ভাল বাসে।

—আরে রেখে দাও! ওসব ছেলেমানুষী মোহ! অজিত দেখতে আশ্চর্য্য সুন্দর—একেবারে আপনার হয়ে গেছে। কোটিপতির ছেলে ছিল, আজ না হয় অবস্থা বিপাকে পড়েছে। বড় ইঞ্জিনীয়ার। মা-

বাবাকে হারিয়ে বেচারা আমার আশ্রয়ে এসে পড়েছে। ছেলের চেয়েও বেশী আপনার হয়ে উঠবে দু'দিনে। মেয়ের খোশ খেয়াল মেটাতে গিয়ে এমন ছেলে হাতছাড়া করবো নাকি ?

—কিন্তু মেয়েটার জীবন...

—সার্থক হবে। তুমি অনর্থক ভেবো না। অজিত দুদিনে ওকে ভালবাসতে বাধ্য করবে—দেখে নিও।

—অত সোঝা হবে না। কাবেরী অনেকদিন থেকে ইন্দ্রজিৎকে ভালবাসে। আর আমিও এটা চাই না যে আমার মেয়ে ভালবাসবে একজনকে আর বিয়ে করবে আর একজনকে। তুমি অজিত সিংকে নিয়ে যা করছো কর, মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে তাকে জড়িও না।

—আচ্ছা, কিন্তু তুমি ওকে দিনকতক অজিতের সঙ্গে মেলামেশা করতে দাও। ইন্দ্রজিৎকে পাব কোথায় ? সে নাকি সন্ন্যাস নিয়েছে ?

—তা নিক ! সে আসবে। আমার মেয়ের ভালবাসা যদি খাঁটি হয় তো তার না এসে উপায় নেই।

—কিন্তু মেয়ে তোমার যথেষ্ট বড় হয়েছে। এবার বিয়ে দেওয়া একান্ত দরকার।

—বড় হলেও বুড়ো হয় নি—তোমার থেকে আমি ভাবছি অনেক বেশি।

কথা এই পর্য্যন্ত কয়ে চলে এলেন মিসেস চ্যাটার্জি ভেতরে। এসে দেখলেন, রান্নাঘরে কাবেরী রান্না করছে—যত্ন করেই কাজ করছে দেখে মনে হোল। মেয়ের জন্ম তিনি যথেষ্ট চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, কিন্তু স্বামীর মত তাঁর মন বিশ্বপ্রেমিক নয়। অতখানি কসমোপলিটন হতে পারেন নি তিনি—হয়তো আর পারবেন না। জাতিগত ঐতিহ্য, প্রদেশগত আচার ব্যবহার আর বংশগত ধারাকে অত সহজে যে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া

যায়, এটা স্বীকার করতে তাঁর বাধে। মোহিতবাবু অবশ্য বলেন যে প্রাচীন যুগে রাজারা বহু দূর দেশ থেকে মেয়ে বিয়ে করে আনতেন। বণিকগণ বহু দূর দেশের কন্যা এনে সংসার করতেন। ব্রাহ্মণগণও দূরদেশস্থ কন্যাকে স্বদেশে এনে সমাজে রাখতেন। দেশগত বিভেদ বা জাতিগত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার কথা এতে ওঠে না, বরং সমাজকে প্রসারিত করা হয় এতে। মোহিতবাবু বলেন, মিসেস শুনে যান—শেষে ছোট কথায় জবাব দেন,

—আমার মেয়ে যাকে ভালবাসবে সেই তার হবে বর, তা সে পাঞ্জাবীই হোক, আর পারস্যবাসীই হোক...আমি দেখবো মেয়ের মন।

মোহিতবাবু চুপ করে যান। কারণ মেয়েটা একা তাঁর নয়। এই ভাগের মেয়েকে নিয়ে তাঁর হয়েছে মুস্কিল। ওদিকে মেয়ে হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়, আত্মদান করে বসেছে ইন্দ্রজিৎকে। মোহিতবাবু এর জন্য স্ত্রীকেই দায়ী করেন মনে মনে, মুখে কিছু বলেন না।

মোহিতবাবু আবার উঠে গেলেন বসবার ঘরে। কয়েকজন লোক আসবেন, 'সায়ন্তনী' গ্রাম-সংগঠন ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হবে, এবং তাঁরা আজ এখানে খাবেন। শীতকাল, স্বাধীন হযে গেছে দেশ, তাই উৎসব আনন্দ অনেক রাত অবধি চলে আজকাল, অবশ্য বড়লোক-দেরই ঘরে চলে,—দরিদ্র মধ্যবিত্তরা শেষ হতে বসেছে। তাদের না আছে ভাত. না বা কাপড়। রেশনের চালের কাঁকর বাছতে গিন্নীদের যায় ঘণ্টা চার পাঁচ রোজ, আর রেশন আনবার জন্য ধরণা দিতে পুরুষের যায় ততোধিক সময়। তার পর আছে অর্থার্জ্জনের জন্য ছুটাছুটি। কুখাদ্য আর অখাদ্যতে জাতিটা একান্তভাবেই নির্জ্জীব হয়ে গেল। কিন্তু তাতে কি ক্ষতি, ধনীরা বেঁচে থাকবেন—তাঁরাই রক্ষা করবেন মানব বংশ, মানব-সংস্কৃতি, মানবেতিহাস। তাঁরাই গড়ে তুলবেন নতুন সমাজ, নব-

সংস্কৃতি। কিন্তু যাক সে কথা, মোহিতবাবু অপেক্ষা করতে লাগলেন অতিথিদের জন্য—অকস্মাৎ ঝড়ের বেগে কাবেরী এসে উপস্থিত হোল; চোখ দুটো একেবারে রক্তাভ হয়ে উঠেছে। এসেই কোন কথা না বলে বাপের পিঠের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো। মোহিতবাবু বুঝতে পারলেন, ব্যাপার গুরুতর। আস্তে হাত দিয়ে সুমুখ দিকে টানতে গেলেন—

—নাঃ—তোমরা আমায় নিয়ে কি পুতুল খেলা আরম্ভ করেছ নাকি বাবা ?

—হোল কিরে মা ?

—তুমি আনবে কোন্ সিংহ-বাঘ, তিনি আনবেন কোন্ ভালুক-নেকড়ে, আর কেউ আনবে সাপ-ছুঁচো-ইন্দুর—আমি বিয়ে করবো না বাবা, তোমরা থামো।

—আচ্ছা মা, আচ্ছা,—থাক !—

মোহিতবাবু মেয়েকে ধরে টেনে কোলের কাছে বসালেন, বললেন, —শোন মা, মেয়ের জন্য দুশ্চিন্তা মা-বাবার মনে থাকেই, কিন্তু তোর অমতে কিছু আমরা নিশ্চয় করবো না। তবে আমাদের তুই একমাত্র সন্তান—তাই উৎকণ্ঠা হয়তো আমাদের কিছু বেশি।

—আচ্ছা, বাবা, বিয়ে যদি আমি করি তো আমি নিজেই ঠিক করবো কাকে করবো বিয়ে—তখন তোমরা যা হয় কোরো। এখন অন্ততঃ কিছুদিন আমাকে সময় দাও।

—আচ্ছা, তোকে তো আমরা কিছু বলছি না, মা।

—প্রত্যক্ষভাবে বললে সে ভাল ছিল বাবা, সরাসরি জবাব দেওয়া চলতো; তোমরা বলছো পরোক্ষভাবে। এই পৃথিবীতে জন্মাবার পর তুমি আর মা ছাড়া যখন আমার আর কোনো আত্মীয় নেই, তখন পরোক্ষ-

ভাবে কেন কিছু বলবে তোমরা ? আমি এমন কিছু হাবাগোবা মেয়ে নই যে লজ্জায় মারা যাব। যা কিছু কথা আমার সমুখে হোক, যদি সেটা দরকার হয়।

—বেশ, তাই হোক। তোর মা বলছিল, তুই নাকি ইন্দ্রজিৎকে ভালবাসিস ?

—হ্যাঁ, ভালবাসি, কিন্তু বিয়ে করতে চাই না।

—কারণ ?

—ওর মধ্যে পার্থিব পদার্থ কিছু নেই, ও শুধু একটা আইডিয়া, স্বপ্ন !

মোহিতবাবু খুসী হলেন, এমন কি বিশেষ আশান্বিত হয়ে উঠলেন অজিত সিংহের কথাটা ভেবে ; তথাপি কন্যার মন পরীক্ষার জন্য শুধুলেন.
—হোলইবা আইডিয়া, তোর স্বপ্নের সঙ্গে যদি মেলে ?

—আমার বাস্তবের সঙ্গে একেবারে গরমিল হবে বাবা, ওকে ধরা-ছোঁয়া যায় না।

—আমি তো সেই জন্যই ওর কথা তুলি না মা কাবেরী—ও আছে, ও থাক, ওকে নিয়ে মাটির ধূলোয় ঘর বাঁধা যায় না। আমি জানি, আমার মেয়ে নির্ব্বোধ নয যে এটা না বুঝবে। কি বলিস ?

—ও আমি অনেক দিন বুঝেছি বাবা, কিন্তু মাটির ধূলোতে যাকে নিয়ে ঘর বাঁধা যায়, তেমন কেউ তো আসে নি—তোমরা যাকে আন, ঐ বাঘসিংহের দল, তাদের সবটাই বাস্তব, তিলমাত্র স্বপ্ন নেই। আহার আর নিদ্রায়, বাড়ীতে আর বড় মানুষীতে, ব্যসনে আর ব্যভিচারে মানুষের আত্মা কলুষিত না হোক, অন্ততঃ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন তার দরকার হয় আইডিয়ার, স্বপ্নের—কাবেরী একটু থেমে বলল,—তোমায় মেয়ের মধ্যে বাস্তবটাই থাকবে, আর কিছুমাত্র স্বপ্ন থাকবে না, এরকম ভুল তুমি অন্ততঃ

করো না বাবা—। মানুষ শুধু জীব নয়, তার জীবত্বকে অতিক্রম করে যায় তার স্বপ্ন, তার আদর্শ, তার ঊর্দ্ধাভিমুখী আত্মা—তাকে অস্বীকার করার মত পাপ আর নেই।

—আচ্ছা মা, আমি বুঝলাম—তুই এখন ভেতরে যা, ওরা এসে পড়লেন।

বাইরে গাড়ী দাঁড়াবার শব্দ হোল। কাবেরী ত্বরিতে উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু দেখতে লাগলো, অত্যন্ত সুন্দর চেহারার জনৈক যুবক নামলো গাড়ী থেকে। বছর পঁচিশ মাত্র বয়স হবে, মাথায় লম্বা চুলে পাগড়ী, মুখে দাড়িগোঁফ—যুবক বাঙালী কিনা বোঝা যায় না! দীর্ঘদিন পশ্চিমে থাকার জন্য ওর সবটাই ঐ দেশের হয়ে গেছে, শুধু বাঙলা ভাষা ভাল জানে। এই অজিত সিংহ—কাবেরী দেখেছে তাকে দূর থেকে, কোনোদিন কথা বলেনি। আজ হয়তো বলতে হবে। ওর বাবা অমর সিংহ দীর্ঘ দিন থেকে লাহোরে কারবার করতেন, বিশেষ ধনী হয়ে উঠেছিলেন। কলকাতায় ঐ কারবারের ব্রাঞ্চ রয়েছে এবং মোহিতবাবুর সঙ্গে বহুদিনের আলাপ, হৃদ্যতা ছিল তাঁর। অজিত তাঁর একমাত্র ছেলে।

সম্প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের গণ্ডগোলে অজিতের বাবা-মা মারা গেছেন। অজিত বিলাতফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার, কিন্তু কারবার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বোঝে না। বিস্তর লোকসান হয়ে গেছে ওদিকে, ঘর-বাড়ী-সম্পত্তি সবই। যা আছে যৎসামান্য তা কলকাতায়। তাই সে এখানে এসে মোহিতবাবুর সাহায্য নিয়েছে। কারণ মোহিতবাবু তার পিতৃবন্ধু এবং পরিচিত। কাবেরী ভাল করে দেখে নিল অজিতকে, তারপর ভেতরে চলে গেল।

গোটানো প্লানখানা হাতে অজিত সিংহ এসে ঘরে ঢুকলো। বড় ইঞ্জিনিয়ার সে। ইউরোপীয় পোষাক পরণে, চোখে সেলুলয়েডের ফ্রেমের চশমা। প্রথম দৃষ্টিতে খুবই সুন্দর মনে হয় ওকে, কিন্তু কিছুক্ষণ দেখলে ওর চেহারায় অনেক খুঁৎ বেরিয়ে পড়ে; কয়েকদিন দেখলে তখন আর বিশেষ সৌন্দর্য্য চোখে পড়ে না। এর কারণ ওর সত্যকার রূপের থেকে সজ্জার পারিপাট্য অনেক বেশি। বড়লোকের ছেলে, বিলাতী কায়দায় বেশবাস করতে অভ্যস্থ, তাছাড়া নিজকে শিক্ষিত এবং আভিজাত বলে গর্ব্ব করবার ওর যথেষ্ট কারণ আছে।

অজিত সিংহ পাঞ্জাবী কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে আসন গ্রহণ করলো। তারপর প্ল্যানখানা খুলে মিঃ চাটার্জিকে দেখাতে আরম্ভ করলো। কোথায় জলের কল বসবে, কোথায় ডায়নামো বসাতে হবে এবং কোনদিক দিয়ে সহরের ময়লা বের করে নদীর জলে চালান করা হবে—সব দেখাতে লাগলো অজিত। মোহিত বাবু দেখতে দেখতে প্রশ্ন করলেন,

—তোমার কাকা নাকি বর্ম্মী মেয়ে বিয়ে করেছিলেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কাকা মারা গেছেন, কাকীমা রয়েছেন দিল্লীতে!

—খুড়তুতো ভাইবোনেরা ?

—ভাই নেই, একটা বোন আছে—ইন্দ্রানী। অনেকদিন দেখা হয়নি ওদের সঙ্গে। এই বিপ্লবের মুখে ওদেরও যা কিছু ধন-সম্পত্তি ছিল—গেছে। মেয়েটাকে নিয়ে কাকীমা কি করছেন, কে জানে?

—তাহলে তো খবর নেওয়া উচিৎ।

—হ্যাঁ—কিন্তু খবর নিয়ে করবো কি? নিজের অবস্থাই তো বেসামাল।

মোহিত বাবু ও-বিষয়ে আর কিছু শুধুলেন না। অজিত সিংহ

প্ল্যানটা বোঝাতে লাগলো। কথায় কথায় বললো, এই সায়ন্তনীতে খুড়তুতো বোনের জন্যও সে একটু জমি রাখবে।

ছেলেটা ভাল; মোহিতবাবু ওর মুখ পানে চেয়ে বললেন, —তা বেশ তো, তোমার বাড়ীর কাছেই ঐ প্লটটা রিজার্ভ রাখ।

ইতিমধ্যে কয়েকজন পূর্ব্ববঙ্গীয় বাস্তুহারা ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলেন, সঙ্গে সেই ফটোগ্রাফার। ইনিও বাস্তুহারা ব্যক্তি তবে অন্য কারণে। এঁরই উৎসাহ সর্ব্বাধিক এই নগর পত্তন ব্যাপারে। এসেই আরম্ভ করলেন,—দু'দিনে স্বাস্থ্য ফিরে যাবে। গালে দাড়িমের রং ধরে যাবে।

—থাক—ওসব বলবেন ক্যানভাস কর্ব্বার সময়—অজিত বলল।

—বলে অভ্যাস করে রাখছি স্যার—জবাব দিল ফটোগ্রাফার।

কাবেরী চাকরের হাতে ট্রে ভর্ত্তি চা নিয়ে এল সকলের জন্যে। মা পাঠিয়েছেন তাকে। সান্ধ্যবেশ ওর—চন্দ্রপ্রভা শাড়ীর আঁচলে বিদ্যুৎ। গলায় মুক্তার মালাটাতে ওকে সাগর-তল-বিহারিণী রূপকন্যার মত দেখাচ্ছে। মোহিত বাবু পিতৃত্বের গৌরব নিয়ে তাকালেন সকলের পানে। অজিত সিংহ এত কাছে দেখেনি কোনদিন কাবেরীকে। নামটা শুনে রেখেছে। মনে মনে শুধু বললো—সত্যিই কাবেরীর জলপ্রপাত! সার্থকনামা মেয়ে!

কাবেরী ধীরে শান্ত হাতে চা পরিবেশন করে দিল সকলকে। ওর আবির্ভাবে এদের সায়ন্তনী নিয়ে আলোচনাটা বন্ধ হয়ে গেছে। ফটোগ্রাফার কথা কইল—চমৎকার চা হয়েছে, বাঃ!

—সায়ন্তনী নামটা বুঝি এঁরই দেওয়া? অজিত প্রশ্ন করলো মোহিত বাবুকে।

—হঁা—সগর্ব্বে উত্তর দিলেন মোহিত বাবু!

—ওর মানে কি? সন্ধ্যার সঙ্গে কিছু যোগ আছে নাকি ওর?

—আছে। মানুষের বিশ্রামনীড়—মনের শান্তির ইঙ্গিত রয়েছে ওর মধ্যে!

—চমৎকার নাম! নামের জন্যই হাজার লোক এসে জুটবে, দেখবেন।

ফটোগ্রাফার সচীৎকারে ঘোষণা করলো। লোকটা বেতালে কথা বলে বড় বেশি। কিন্তু বলবার কিছু নাই, এখানে সকলেই ভদ্রলোক। অজিত বিরক্ত হয়েও কথা কিছু বলতে পারছে না। ফটোগ্রাফার বুদ্ধিমান—অজিতের মুখের ভঙ্গী ও দেখলো; বললো—আপনি বিরক্ত হবেন না সিংহজী, কথা আমি একটু বেশী বলি, ওতে কাজও হয়, হজমও হয়, আর···

—থাক আর······মোহিত বাবু থামিয়ে দিলেন। কারণ কাবেরীর মুখভঙ্গী—শীতের কুয়াসার মত ক্লান্তিভরা। বাবার চাযে একটু কম চিনি দিতে হবে—তারই মাপ করছিল সে। মোহিত বাবু মেয়েকে উদ্দেশ করে বললেন,

—অমর সিংহকে তো তুই দেখেছিস, এই তাঁর ছেলে অজিত। বিলাত ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার—ওই আমাদের সায়ন্তনীর ডেভেলাপমেন্ট স্কীমের কর্ত্তা।

এতক্ষণ পরে পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা আইনসঙ্গত না হলেও আপাততঃ আর কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না মোহিত বাবু। চামচেটা রেখে কাবেরী নমস্কার জানালো অজিতকে। অজিতও সবিনয়ে হাত তুলে বললো—নমস্তে।

চোখাচোখী হয়তো হতে পারতো ওদের, কিন্তু কাবেরী চোখ তুললো না। অজিতকে অবসর দিল তার মুখখানা ভাল করে দেখতে। অজিত মিনিটখানেক নির্ণিমেষ চোখে চেয়ে থেকে বললো,

—আপনার দেওয়া নাম সত্যি আমার ভাল লেগেছে—সায়ন্তনী।

—ধন্যবাদ—এখন গ্রামটাকে নামের যোগ্য করতে পারলে খুসী হই আমি।

হাসলো কাবেরী একটু। অজিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখলো, বললো,

—আপনার আইডিয়া কি ? কি হলে গ্রামটা সুন্দর হয় ?

—তা জানিনা—আমি নিজে শিল্পী নই—সুন্দর হলে বলতে পারবো যে সুন্দর !—কৌশলে ও এড়িয়ে গেল অজিতের প্রশ্নটা।

—মানুষ সৌন্দর্য্যের পূজা করে চির দিন। আমরাও করবো, সুন্দর যাতে হয় তা করতেই হবে।—অজিত বলল।

—নিশ্চয় নিশ্চয়। কি হলে সুন্দর হবে, কাবেরী দেবী সেটা খুব ভালই বলতে পারবেন—ফটোগ্রাফার অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠলো।

—মাফ করুন মশাই—অজিত হাত জোড় করে বললো ফটো-গ্রাফারকে—উনি যখন বলতে চাইছেন না, তখন জিজ্ঞাসা করাটা উৎপীড়ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু আমার একটা নিবেদন শুনুন কাবেরী দেবি···

—বলুন—কাবেরী হাসিমুখে ফিরে দাঁড়ালো। অজিত আস্তে বলতে লাগলো—সায়ন্তনীকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে চাইছি আমরা। প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ ঘর বাঁধে, গৃহস্থালী পাতে, চাষআবাদ করে, কিন্তু ঘরের দেওয়ালে, কলসীর কাণায়, লাঙ্গলের ঈষে কারুকার্য্য করে সে তার সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর অর্চ্চনা করে এসেছে আদিম যুগ থেকে—এমন কি, আরণ্যক জীবনেও সে তার তীরের ফলায়, বর্শার হাতলে কারুকার্য্য করেছে,—প্রয়োজনের মধ্যেই এই অপ্রয়োজনীয় অংশটা তার জীবনস্বপ্নে অতি প্রয়োজনীয়।

মোহিতবাবু কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন, যদিও চোখ তাঁর ছিল প্ল্যানটার ওপর নিবদ্ধ। কাবেরী নির্লিপ্তের মত শুনে যাচ্ছে,

মুখ ভাবলেশহীন তার। অজিত একবার তাকিয়ে বললো,—কি করলে সায়ন্তনীকে সুন্দর করা যায়, তার একটা তালিকা আমি পরশু আপনাকে শোনাবো, আশা করি আপনার মনঃপুত হবে।

—বেশ, শোনাবেন! কাবেরী আস্তে সম্মতি জানালো শুধু।

আরো কেউ চা নেবেন কি না জিজ্ঞাসা করে জানলো, চা আর কারো দরকার নেই; সব গুটীয়ে নিয়ে ফিরে যাবার সময় বলল,—নিত্য নূতন নগর পত্তনের কথাই তো শুনছি, কাজ কিছু দেখি না; গোড়াতেই বলে রাখি, আপনাদেরটাও যেন সেরকম না হয়।

—সেরকম ইচ্ছা থাকলে আমরা কোনো বড় এবং বিখ্যাত নেতার নাম দিয়ে মানুষ ঠকাতাম—অজিত উত্তর দিল—শুধু ঐ কারণেই আমি মিঃ চ্যাটার্জিকে বলেছিলাম, নামটা নিশ্চয়ই কোনো দেশনেতার নামে করা হবে না।—কারণ আমরা চাই সত্যিকার একটা ভাল গ্রাম তৈরী করতে।

—ধন্যবাদ—কাবেরী বললো—শুধু এই ইচ্ছাটার জন্যই আপনাকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। নেতাদের নামে গ্রাম-নগর গঠনের বিজ্ঞাপন পড়ে পড়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করতে থাকে। অযোধ্যার নাম 'রামগড়' রাখা হয় নি, যুধিষ্ঠিরের নামে 'ইন্দ্রপ্রস্থ' তৈরী হয় নি,—এমন কি, উজ্জয়িনীর নাম 'বিক্রমাদিত্য নগর' ছিল না। আমেরিকায় ওয়াশিংটন বা রাশিয়ায় লেলিনগ্রাদ যাঁরা তৈরী করেছেন, তাঁরা সত্যিকার কাজের মানুষ॥ আর এখানে নাম ভাঙিয়ে পয়সা রোজগারের ফিকির ছাড়া আমি তো আর কিছু দেখি না। যাই হোক, সায়ন্তনীকে যদি সুন্দর করতে পারেন তো আমি সত্যি খুসী হব; শুধু দেখবেন, কেউ না ঠকে।

ও ধীরে ধীরে চলে গেল।

অজিৎ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল কাবেরী চলে যাওয়ার পরও। কোণের দিকে রেডিওটা আপন মনে গান বাজাচ্ছিল, কেউ এতক্ষণ গ্রাহ্যও করেনি। অকস্মাৎ কে যেন অতি মিষ্ট কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত আরম্ভ করলেন—ওরে আয়—

আমায় নিয়ে যাবি কে রে বেলা শেষের শেষ খেয়ায়।
দিনের শেষে ঘুমের দেশে
ঘোমটা পরা ঐ ছায়া
ভুলালো রে ভুলালো মোর প্রাণ,…
ওপারেতে সোনার কূলে
আঁধার মূলে কোন্ মায়া
গেয়ে গেল কাজ-ভুলানো গান…

সবাই উৎকর্ণ হয়ে উঠলো গানটা শুনবার জন্য। চমৎকার গাইছেন শিল্পী। এই রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনবার জন্য কাবেরী অপেক্ষা করে প্রতিদিন। কিন্তু তার জন্য ওকে নীচে নেমে আসতে হবে না, ওর নিজের ঘরেই ভাল রেডিও আছে। কিন্তু কি-জানি কেন, ও এখানেই এসে রেডিওটার চাবি ঘুরিয়ে আওয়াজ আরো একটু জোর করে দিল। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইছেন গুণী গানটি। সায়ন্তনীর কাজের কথা চাপা পড়ে গেছে এই গানের মোহে। অকস্মাৎ ফটোগ্রাফার বলে উঠলো—হ্যাঁ—গলা বটে একখানা—বাঃ! কাবেরী ঠোঁটে আঙুল তুলে নিষেধ করল ওকে কথা বলতে। গান তখনো চলছে। ফটোগ্রাফার নিঃশব্দে হাত যোড় করে ক্ষমা চাইলো কাবেরীর কাছে। কাবেরীর দৃষ্টি জানালা পথে ঘরের বাইরে নিবদ্ধ।

হঠাৎ ও গানের স্বরে স্বর মিলিয়ে গেয়ে উঠলো—

বরে যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘর পানে
পারে যারা যাবার গেছে পারে—
ঘরেও নহে পারেও নহে যেজন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যেবেলা কে ডেকে নেয় তারে……

ওর কণ্ঠস্বরে করুণতম হয়ে উঠলো ঘরের আবহাওয়া—"সন্ধ্যেবেলায় কে ডেকে নেয তারে"—যেন আকুল আহ্বানের প্রত্যাশায় ও বসে আছে—বসে আছে অনাদিকাল থেকে। অজিত মোহাবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। অকস্মাৎ কাবেরীর চোখ পড়ে গেল ওর চোখে—যেটা সে আশঙ্কা করছিল, নিশ্চিত হতে দেবেনা বলে ভেবেছিল, সেইটাই ঘটে গেল একান্ত আকস্মিক ভাবে। অজিতের চোখ চশমায় ঢাকা, কিন্তু কাবেরীর উজ্জ্বল আয়ত চোখের দৃষ্টি সে দেখলো ভাল করে। কাবেরী যেন লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো হঠাৎ ; লজ্জার কারণ বিস্তর। তার মধ্যে প্রধান, এভাবে রেডিওর সঙ্গে গলা মিশিয়ে বাইরের ঘরে এতগুলো স্বল্পপরিচিত লোকের সামনে গান গাওয়া। বাবা নিশ্চয় ভুল বুঝবেন কাবেরীকে, হয়তো ভাববেন, অজিতকে তার ভাল লেগেছে। কাবেরী তাড়াতাড়ি উঠে পালিয়ে গেল কাউকে কিছু না বলে। মোহিতবাবু হাসলেন একটু।

নদীতে বান এসেছে। সারা বছরের শুকনো নদীর দু'কানা ভর্তি গৈরীক বন্যা—উচ্ছল, উগ্র, মৃত্যুর মত ভয়াল। মানুষের যৌবনবন্যার মত কামনাকীর্ণ। সুবোধবাবুর জমিদারীর কিনারাটায় ভাঙন ধরেছে, মন্দিরটা ধ্বসে যাবে। উচ্ছল জলস্রোত অবিরাম আঘাত করছে মন্দিরের সুউচ্চ পীঠবেদিকায়। কিন্তু এ মন্দির যেন মহাকালের অক্ষয় ঐশ্বর্যে গড়া—আজ চার পাঁচ দিন অবিশ্রান্ত চেষ্টা করেও নদী ওকে ভাঙতে পারলো না—তবে পদপ্রান্ত অসুন্দর করে গেল। নদী-কিনারে মন্দিরের আশে-পাশে অসংখ্য বাড়ী উঠছে—বাস্তুহারাদের কলোনী। সুবোধ নিজে উদ্যোগ করে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। বাড়ী তৈরীর মাল-মশলার বড্ড অভাব দেশে—কিন্তু তাল আর শালগাছ দিয়ে কড়ি-বরগা-দরজা জানালা করানো সুবোধের পক্ষে অসুবিধার কথা নয়। অন্যান্য বস্তুও জোগাড় করা শক্ত হোল না। কলোনীটা বেশ জমে উঠেছে এর মধ্যে।

উত্তর দিকে পাহাড়ের মত উঁচু জায়গাটা, তাতে নানারকম লতা-গুল্ম জন্মায়। দেখতে খুব সুন্দর—অসংখ্য বড় বড় পাথরের চাঁই, বসবার বেদী হয় চমৎকার। কিন্তু সাপ আর কাঁকড়াবিছেতে ভর্ত্তি। তবে সাপ জানোয়ারটা মানুষের গতায়াত পেলে পালিয়ে যায়, মারাও পড়ে। এখানে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা ঐ জায়গাটাকে বিকালের গড়ের মাঠ করে তুলেছেন—অর্থাৎ প্রায় সকলেই ওদিকে খানিকটা বেড়িয়ে আসেন বিকালের দিকে। নারী এবং পুরুষ সকলেই যান। কিন্তু কথা হচ্ছে যে এদিকে মেয়েদের এরকম করে জামাজুতো পরে বেড়ানোর রেওয়াজ নেই। এ দেশের আদি বাসিন্দারা দিনকতক খুব নাক সিঁটকালো—তারপর দেখা গেল যে সঙ্গগুণে তারাও যোগ দিতে আরম্ভ

করলো ওঁদের সঙ্গে। এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে বিকালে একটু না বেড়ালে কারোরই চলে না।

সুবোধবাবুও প্রায়ই বেড়াতে আসেন। চমৎকার সাজ-পোষাক করে পায়ে ব্রাউন কালার জুতো পরে তিনি আসেন এখানে; হাতে থাকে একগাছা সৌখীন লাঠি। সেদিনও এসেছেন এবং আরো অনেকে এসেছেন।

সুন্দর সন্ধ্যা। নানারকম সাজপোষাক করে বেড়াতে এসেছেন নবাগতা মহিলারা। এদেশে এরকম দৃশ্য সম্পূর্ণ অভিনব॥ নিতান্ত কুরূপাকেও সুন্দরী দেখায় সজ্জার চারুতায়। সুবোধ নির্নিমেষ চোখে দেখছিল। কিন্তু সুরূপাই যথেষ্ট নয় সুবোধের কাছে। কোনো সুরূপা সুন্দরীকে নিয়ে দুচার দিন আনন্দ করতে তার আপত্তি নাই—গৃহলক্ষ্মী করতে রাজী নয় সুবোধ। এর মূলে আছে তার শৈশবের আকাঙ্ক্ষা, যৌবনের ঈর্ষা, আর এখনকার আভিজাত্য! আভিজাত্য বস্তুটা বরাবরই ছিল সুবোধের মধ্যে। বর্ত্তমানে সেটা অসম্ভব রকম বেড়ে উঠেছে। ব্ল্যাকমারকেটের গুণই এই যে খাঁটি সীসাকে সোনার পাতে মোড়া যায়। সে সোনা পাকা সোনা নয়—খাদ মিশানো গিনি সোনা—কিন্তু কদর তো তারই বেশী।

সুবোধ কিছুক্ষণ বসলো, কয়েকটি পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে (নবলব্ধ বন্ধু) আলাপ-আলোচনা করলো। জনপ্রিয় শিশু রাষ্ট্র অবিলম্বে মহীরাবণের পুত্র অহীরাবণের মত সমস্ত বিদ্যায় অদ্বিতীয় হয়ে উঠবে—এই মত প্রকাশ করলো। নিজেকে অত্যন্ত বিজ্ঞ মনে করে সুবোধ, কাজেই কেউ তার বিরুদ্ধে কোনো মত প্রকাশ করলে অত্যন্ত চটে যায়; তার মনের এই রহস্য এখানকার প্রায় সকলেরই জানা হয়ে গেছে। এঁরা চান নিজেদিকে স্থায়ী করতে সুতরাং পারতপক্ষে সুবোধকে কেউ চটাতে চান না।

আর যাই হোক, লোকটা যথেষ্ট সাহায্য করছে তাঁদের বসবাসের। বড় একটা মিলও খোলা হয়েছে, সেখানে বহু বেকারের কাজ হবে—স্কুল, পাঠশালা, পোষ্টাপিস ইত্যাদির জন্যও চেষ্টা হচ্ছে। কলোনীর এখনো নামকরণ হয় নি, 'সুবোধডাঙা' বলে এটা এখনো পরিচিত। কিন্তু ভাল নাম একটা ঠিক করে গভর্ণমেণ্টকে লিখতে হবে পোষ্টাপিসের জন্য।

মহাত্মাজী মহাপ্রয়াণ করলেন অকস্মাৎ—দেশ শোকে অভিভূত, হাজার রকমে তাঁর নামটি অক্ষয় করবার জন্য লক্ষ লোক মাথা ঘামাচ্ছেন, অধিকাংশের মত, ভারতের সবকিছু নাম বদলে মহাত্মাজীর নামই শুধু রাখা হোক—যেন ভারতবর্ষে মহাত্মাজীর নাম ছাড়া আর কিছু থাকা উচিত নয়; কিন্তু দেশে একদল এমন আছেন, যাঁরা এখনো স্বকীয় চিন্তার অভ্যস্থ। তাঁরা বললেন—সারা দেশের পক্ষে এটা একান্ত বিড়ম্বনা—এবং বিনামূল্যে মহাত্মাজীকে শ্রদ্ধা জানাবার চেষ্টার জন্য দেশবাসী অপরাধী হচ্ছেন। সুবোধ ঐ শেষের মতটাই গ্রহণ করেছে।

—কি নাম দেওয়া যায় তাহলে আপনাদের গ্রামের? সুবোধ শুধুলো।

—গান্ধীগ্রাম—বলে উঠলেন দু'তিনজন একসঙ্গে।

—গান্ধীনগর—বললেন জনৈক মহিলা।

—গান্ধীপুরী—বললেন একটি তরুণী; পুরী নামটার ওপর ওর আকর্ষণ আছে হয়ত।

—না—সুবোধ বেশ জোরের সঙ্গেই বললো—মহাত্মাজীর উপর আমাদের যে শ্রদ্ধা তাকে এই রকম করে ভেংচি কাটা উচিত নয়। গ্রাম আমাদের প্রয়োজনের তাগিদে গড়তে হচ্ছে, তাতে তাঁর অমর নাম জুড়ে অনর্থক তাঁর পবিত্র স্মৃতির অসম্মান করতে চাই না, বরং গ্রামের মাঝ খানে তাঁর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করে আমরা গ্রামের বুকে তাঁর স্মৃতি

অক্ষয় করে রাখবো—সুবোধ সগর্ব্বে তাকালো সকলের দিকে কথাটা বলেই।

সকলেই প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, শুধু সেই তরুণীটি একটু নিরাশ চোখে চেয়ে বললো,—গ্রামের নামের সঙ্গেই তো তাঁর স্মৃতি থাকতো!

—সারা ভারত জুড়ে গান্ধী আর গান্ধীনগর হয়ে উঠবে ওরকম ভাবে স্মৃতি রাখলে। তাঁর মহান মানবত্বকে আমরা অক্ষয় করবো আমাদের অন্তরের ঐশ্বর্য্য দিয়ে, আমাদেব মানবত্ব দিয়ে—ফাঁকা নাম দিয়ে নয়।

কংগ্রেসে যোগদানের পর বহু যায়গায় বহুরকম বক্তৃতাদি দিতে অভ্যস্থ হয়েছে সুবোধ—কথা সে ভাল বলতে পারে এবং বিরুদ্ধমতবাদীকে স্বমতে আনতে সমর্থ সে। মেয়েটি আর তর্ক তুললো না, ছোট করে বললো—হলে খুবই ভাল, তবে হবার মত আমরা হইনি!

—কেন? হইনি কেন?

—মানুষ যদি কোনদিন মহান হোত, তাহলে আততায়ীর হাতে তাঁর প্রাণ যেতো না! মানুষ চিরদিনই বর্ব্বর পশু, নইলে আমরা দেশছাড়া হয়ে এখানে আসতাম না। দু একটা যে বুদ্ধ, খৃষ্ট, গান্ধী আসেন ওগুলো মানুষের পশুত্বে ভগবানের কড়া চাবুক।

মেয়েটি সুশিক্ষিতা, তরুণী এবং সুন্দরী। ওর কথায় সকলেই আকৃষ্ট হলেন। সুবোধ তো হলোই। শুধুলো—কি নাম রাখা যায় তাহলে?

সমস্যাটা গুরুতর! সকলেই ভাবতে লাগলেন। কন্যা জন্মালে তার নাম রাখবার জন্য বাপ-মার দুশ্চিন্তা কম হয় না, গ্রামের নাম রাখার চিন্তাটা তার থেকে কম তো নয়ই, বরং বেশী; কারণ কন্যার

নামটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, এটা সমাজগত, সর্ব্বসাধারণের। ঘোষাল মশাই আর লাহিড়ীমশাই মাতব্বর ব্যক্তি, সেনগুপ্তও আছেন ঐ দলে। ওঁরা তিন জনেই যুক্তি করে সুবোধের ওপর ভার ছেড়ে দিলেন। সুবোধ খুসী হয়ে উঠলো।

—আমাকেই যদি ভার দেন, তাহলে আমি নাম রাখতে চাই সেঁজুতি।

—সেঁজুতি—বেশ সুন্দর নাম তো—তরুণীটিই সমর্থন জানালো সর্ব্বাগ্রে।

অতঃপর নাম সকলেরই মনঃপুতঃ হতে দেরী লাগলো না, কিন্তু নাক সিঁটকালো একজন, সে সুবোধের গাঁয়ের উমাচরণ চক্রবর্ত্তীর ছেলে অসিত। বয়সে সুবোধের থেকে কিছু ছোট, রূপে এবং গুণেও খাটো কিন্তু মনে সে যথেষ্ট দৃঢ়; দুবার জেল খেটে এসেছে ইংরাজ আমলে, এখন কিন্তু কংগ্রেসে নেই ও। সুবোধ যে কেন গ্রামের নামকরণ করলো সেঁজুতি, তা ও জানে, এবং আরো জানে যে সুবোধের এ আশা নিশ্চিত দুরাশা। সেঁজুতি আর যারই হোক, সুবোধের কোন আশা নেই। সেঁজুতির ঢলঢলে লতানো চেহারাখানা মনে পড়ে গেল অসিতের। পাড়াতেই বাড়ী, তবে ইদানিং ওকে আর বড় বাইরে দেখা যায় না। বড় হয়েছে, এখনো বিয়ে হোল না, দুস্থ সংসার, তাই অতি সাবধানে থাকে সেঁজুতি—জানা আছে অসিতের। কিন্তু সুবোধ কোন লজ্জায় তার নামে গ্রামের নামকরণ করতে যায়? অসিত শুধু ক্ষুন্ন হোলনা, বেশ চটেই উঠলো। অথচ তার কিছু বলবার নেই, কারণ সেঁজুতি কথাটা বাংলার অভিধানে আছে এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর বইএর নামকরণ করে ঐ কথাটাকে বিখ্যাত করে দিয়েছেন। 'সেঁজুতি' নামের ওপর কারো একাধিপত্য থাকা তো

সম্ভব নয়। অসিত দেখলো, এখানে উপস্থিত সকলেই নামটিকে অতিমাত্রায় আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। তাদের গ্রামের নাম হবে সেঁজুতি—চমৎকার হবে। বোলপুর এবং শান্তিনিকেতন খুব দূর নয় এখান থেকে। ওখানেই মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেঁজুতি কাব্য লিখেছিলেন কিনা কে জানে? কিন্তু ঐ নামের সঙ্গে তাঁর স্মৃতি জড়ানো থাকবে—সবাই সুবোধকে ধন্যবাদ জানাল।

—সেদিন দেখে এলাম, অজয়ের ওদিকটাতে জমি জরিপ হচ্ছে; ওখানেও কোনো গ্রামের পত্তন হবে হয়তো সুবোধ দা,—অসিত জানালো।

—তাই নাকি! কোথায় বলো তো? সাগ্রহে শুধোলো সুবোধ।

—তেলেঙ্গার ঐ জঙ্গলটার দিকে কাঁটি পাহাড়ীর কাছাকাছি। ওদিকে আবার রেললাইন গেছে, তাছাড়া গ্রাণ্ডট্রাঙ্করোড খুব কাছে হবে ওদের—যায়গা চমৎকার।

—তুমি কোথায় গিয়েছিলে ওদিকে?

—বেলবুনী গিয়েছিলাম সেদিন মিনিকে দেখতে। মিনির ছেলে হয়েছে, তাই দেখে এলাম। সাইকেলে গিয়েছিলাম, ফেরার পথে দেখলাম, কয়েকজন জমিটা জরিপ করাচ্ছেন; জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ওখানেও কলোনী হবে।

—কি নাম দিয়েছেন ওঁরা?

—তা জানি না—ওঁরা খুব বিরাট বিরাট লোক; তিনখানা মোটরে সব এসেছেন।

—ওটা কার জমিদারী, জান?

—না, ওটা বোধ হয় বন্দনার মহারাজার খাস, না হয় তো উখার জমিদারদের।

সুবোধ আর কিছু শুধোলো না; কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। তরুণীটি বলল,

—পশ্চিমবঙ্গ ভর্ত্তি হয়ে উঠবে দু' এক বছরের মধ্যে—কি বলেন?

—হোক না, সব ডাঙ্গা-ডহর ভর্ত্তি হয়ে-যাক মানুষের পদধ্বনিতে, শিশুর কলকাকলিতে, সভ্যতার শুভাগমনে।

—কথাগুলো ঠিক লকুদার কথার মত শোনাচ্ছে!—অসিত আস্তে বলে উঠলো।

সুবোধ ভেতরে অত্যন্ত চটেছে, কিন্তু বাইরে তিলেকমাত্র প্রকাশ পেতে দিল না। এমন কি, অসিতের পানে তাকালো না পর্য্যন্ত। লকুদা নামক কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে এঁরা কিছুই জানেন না, কাজেই কেউ-ই অসিতের কথাটা শুনেও শুনলেন না। সুবোধ বলতে লাগলো,—এ দেশটা একেবারে আধমরা অসভ্যের দেশ। পাথর, কাঁকর, বন-জঙ্গল, বানর-বনমানুষেই ভর্ত্তি।

—বনমানুষ একটাও নেই, অবশ্য বুনোমানুষ অনেক আছে—অসিত বলল।

—তোমার মত নেকড়ের তো অভাব নেই—সুবোধ আর রাগ সামলাতে পারলো না।

—নেকড়ের থেকে কাঁকড়াবিছে ভয়ঙ্কর সুবোধদা! এই চত্বরটা কাঁকড়াবিছেতে ভর্ত্তি। নেকড়েকে দেখতে পাওয়া যায় চোখে, কাঁকড়া বিছে অদৃশ্য শত্রু।

ভয় পাবার ছেলে নয় অসিত, জানে সুবোধ। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ওকে উপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ, তাই ওর কথার উত্তর না দিয়ে বললো,—আপাততঃ ডাকঘর যাতে শিগ্রী হয় তার ব্যবস্থাই করা দরকার;

অতদূর থেকে চিঠিপত্র আসা খুবই অসুবিধার কথা—দরখাস্ত করুন আপনারা।

সেনগুপ্ত রিটায়ার্ড জজ। বললেন—বেশ, আমি রাত্রে ড্রাফট্ করে রাখবো।

লাহিড়ী বললেন—এখন কি পোষ্টঅফিস পাব আমরা? আরো একটু এগিয়ে যাই—গ্রামটা গড়ে উঠুক, এখন যেমন চলছে, চলুক।

—আপনি কিছু ভাববেন না লাহিড়ীমশাই।—সুবোধ বললো—ওসব করিয়ে নেবার মত ইনফ্লুয়েন্স আমার আছে, তবে মেয়েদের স্কুলটা শিগ্গী করে ফেলা উচিত। কারণ ইন্‌স্পেকশানে যিনি আসবেন তাঁকে দেখাতে হবে। আপাততঃ তালের বাগড়ো দিয়েই ঘর ছেয়ে ফেলি।

—উত্তম প্রস্তাব—লাহিড়ী এবং সেনগুপ্ত বললেন।

—আপনিই উপস্থিত হেডমিস্ট্রেস হয়ে কাজ করুন,কেমন? তরুণীটির দিকে চাইল সুবোধ। সে গ্রাজুয়েট কিন্তু বয়স খুব কম। কুমারী, তা ছাড়া বি, টি নয় এবং মাষ্টারী করে জীবন কাটানো ওর বাপ-মায়েরও ইচ্ছে নয়। তাই বলল,

—আমার দ্বারা কি হবে! বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, তারপর···

সেনগুপ্তর সঙ্গে ওদের আত্মীয়তা আছে। তিনি বললেন,—তোমার বাবার মত আমি করিয়ে দেব মা শ্যামলা, ওর জন্য ভাবনার কিছু নেই; তুমি তো পারমেনেণ্ট নও, দু'চার মাস।

—কিন্তু আমি হেডমাষ্টারীর কিছুই জানি না, জ্যেঠা মশাই।

—ও আমি শিখিয়ে নেব—বললেন ঘোষালমশাই। উনি প্রথম জীবনে কিছুকাল মাষ্টারী করেছিলেন। এখন করেন ওকালতী। অবশ্য ওঁকে নূতন করে এখানে আবার পসার জমাতে হচ্ছে কিন্তু উনি সত্যিই ভাল উকিল।

শ্যামলিমা চুপ করে রইল একটু, তারপর কি ভেবে বলল.

—আমাকে মোটে মানাবে না হেডমিষ্ট্রেসের চেয়ারে।

—ঠিক মানিয়ে যাবে—বললো সুবোধ—আমি কালই মজুর পাঠিয়ে দেব স্কুলঘরটা ছাদন করার জন্য। আপনারা দেখে শুনে করিয়ে নেবেন। আজকের মত উঠি, আমাকে আবার অনেকটা যেতে হবে।

সুবোধ উঠলো, অসিত ওর সঙ্গে আসতে পারে. একই গ্রামে যাবে ওরা, কিন্তু অসিত এলো না। সুবোধের যাওয়ার পর এদের মধ্যে কি কথা হয়, শুনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো সে! কথা তাদের আর বেশী কিছু হোল না। কে একজন বললেন,—সেঁজুতি নামটা সুন্দর। কে জানে, এই গ্রাম কোনোদিন পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান সহর হবে না?

—অতটা উচ্চাশা না করাই ভাল—শ্যামলিমা বললো।

—আশাতেই মানুষ ঘর বাঁধে মা,—বললেন সেনগুপ্ত।

সবাই একে একে উঠতে লাগলো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো তখনো মাঠে খেলা করছে, কোনোদল ফুটবল, কোনোদল ব্যাটমিণ্টন, কোনোদল হাডুডু! ওদের মধ্যে শ্যামলিমার ছোট ভাই বাদল আছে। বারো বছরের বালক—অতিশয় দুরন্ত। ওকে নজরছাড়া না করার জন্য মা শ্যামলাকে পাহারা নিযুক্ত করেছেন।

—বাদল।—শ্যামলিমা ডাক দিল।

—যাই দিদি—উত্তরটা এলো সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু বাদলকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। গেল কোথায়? সাড়াই বা দিচ্ছে কোথা থেকে? মিনিট চার-পাঁচ পরে দেখা গেল, একটা লম্বা রিল সুতোতে আট-দশটা কাঁকড়াবিছে বেঁধে ঝুলিয়ে সে আসছে এইদিকে। প্রকাণ্ড কালো কালো বিছা। সবাই ভয়ে পাশ কাটাচ্ছে।

—ওগুলো কি করবি রে শয়তান ?—শ্যামলী রেগে শুধুলো।

—খোস-পাঁচড়ার ওষুধ হয়—পুষবো বাড়ীতে রেখে।

সবাই হেসে উঠলো। বাদলের দৃকপাত নেই। সে কাঁকড়াবিছেগুলো ঝুলিয়ে দিদির আগে আগে চলতে লাগলো বাড়ীর দিকে।

* * *

সুবোধ চলতে লাগলো বাড়ীর পানে। ওর সঙ্গে দারোয়ান আছে। সৌখীন লাঠিগাছটা ঘোরাতে ঘোরাতে চলছে। দু'পাশে শস্যক্ষেত্র, কোথায়ও বা কাটা হয়ে খালি ক্ষেত পড়ে আছে, কোথাও বা মেঠো ফুলে সান্ধ্যসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করছে। কিন্তু মাঝে মাঝে ঝোপজঙ্গল যথেষ্ট আছে। ছোট মত একটু জঙ্গল পার হতে হবে, আতুড়ীখাঁড়ার গাছ আর পলাশ বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন। এই যায়গাটায় এতো বেশী পলাশ গাছ আছে যে সুবোধ অনেকবার মনে করেছে এখানে লাক্ষা জন্মানো যেতে পারে—নানা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার জন্য ওকাজটা আর হয়ে ওঠে নি। আর একটু এলেই সেই মন্দিরটা; সুপ্রাচীন, সুদীর্ঘ চূড়া আকাশ পর্য্যন্ত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে। সুবোধ একটুক্ষণ থামলো ওখানে, মন্দিরের পদপ্রান্ত সত্যি অসুন্দর হয়ে গেছে। সন্ধ্যারতি আরম্ভ হয়েছে ওখানে। ঢুকবে নাকি সুবোধ একবার? বহুকাল ভেতরে যায় নি—কে জানে আজকাল পূজো ইত্যাদি কেমন হয়! অথচ মন্দিরটা এবং ঠাকুর আর সেবাইত সবই তার জমিদারীর অন্তর্গত, এবং তারই তত্ত্বাবধানে চালিত। দেখা উচিৎ—সুবোধ দারোয়ানকে ইঙ্গিত করলো ঐ দিকে যাবার জন্য। দোনলা বন্দুক হাতে ছক্কুসিং মোড় ফিরলো। হুজুরের পিছনে সে সব সময়েই থাকে, কিন্তু সন্ধ্যার দিকে চলে হুজুরের আগে আগে।

এই রকম আদেশ রয়েছে সুবোধের। ছক্কু সিংকে আগিয়ে সুবোধ এসে ঢুকলো মন্দিরের আঙ্গিনায়।

উঁচু বারান্দায় জনৈক সন্ন্যাসী বসে ধ্যান করছেন। সাধু-সন্ন্যাসী এই প্রাচীন মন্দিরে অনেকেই এসে থাকেন কিন্তু এই সন্ন্যাসীর মধ্যে কিছু যেন বিশেষত্ব দেখতে পেল সুবোধ। সাধারণ সন্ন্যাসীর মত ছাইভস্ম মাখা এবং অর্দ্ধ উলঙ্গ নন ইনি। গৈরিক বাস, মাথায় উষ্ণীষ, সুদীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু আবক্ষ লম্বিত, সৌম্য-শুভ্র সুন্দর দীর্ঘ বপু। কতকটা মঠের সন্ন্যাসীর মত—কিন্তু মঠের সন্ন্যাসীও ইনি নন,—যেন কোনো অরণ্যচারী ঋষি, কোনো বাণপ্রস্থাবলম্বিত রাজা,—সুবোধ নিজের অজ্ঞাতসারেই ওখানে এসে প্রণাম করলো। সন্ন্যাসী ধ্যানস্থ ছিলেন, কথা কইলেন না।

ওদিকে পূজারীঠাকুর দীর্ঘদিন পরে মনিবকে দেখে একেবারে মহা শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। হাতের প্রদীপ নামিয়ে রেখে ছুটে এলেন কুশলবার্ত্তা নিতে। তাঁর সাহায্যকারী চাকরটা তাড়াতাড়ি একখানা জলচৌকী এনে পেতে দিচ্ছে, পুরোহিত ঠাকুর বললেন—উঁহুঁ—আসন দে বাবুকে, কম্বলের আসনখানা নিয়ে আয়।

—থাক, ঠাকুরমশাই, আমি এখানে বসছি—সুবোধ বসলো আস্তে।

—বেশ ভাল আছেন তো? বাড়ীর সব?

—সবই ভাল।

—নিত্যি ফুলবেলপাতা চড়াচ্ছি আমি ঠাকুরের পায়ে। ভাল না থাকলে কি ঠাকুরকে রেহাই দেব? প্রতিদিন আপনার কল্যাণের জন্য স্তব পাঠ করি—একশ' আট বেলপাতায় হোম করি।

—ঘি আজকাল পাওয়া যায় তো ঠাকুর? একশ' আটখানা বেলপাতা পোড়ান কি করে?—সুবোধ একটু ব্যঙ্গের স্বরে বললো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার রাজত্বে অভাব কিসের ?

পুরোহিত নির্ব্বিকারচিত্তে ব্যঙ্গটা এড়িয়ে গেলেন এবং হাসিমুখে জবাব দিলেন। সত্যি অভাব নেই সুবোধের রাজত্বে, এটা সুবোধেরও জানা। দুধ-ঘি এখনো পাওয়া যাচ্ছে এদেশে, যদিও দর খুব চড়া ; তবে এটাও সুবোধ জানে যে তার তহবিল থেকে যে টাকা এখানে আসে পূজার জন্য তার সিকিভাগও খরচ হয় না। পুরোহিত ঠাকুর নিত্য একশ' আট বেলপাতা দিয়ে হোম করেন তার মঙ্গলের জন্য, এতবড় মিথ্যা কথাটা সুবোধের মত তীক্ষ্ণধী জমিদারের পক্ষে বিশ্বাস করা একান্ত কঠিন, তবু সে আর কিছু বললো না।

সন্ন্যাসী নিমীলিত নয়ন,—তাঁর সৌম্য মূর্ত্তি বারান্দার কোণের দিকে আসীন। সুবোধ ইসারায় পুরোহিতকে প্রশ্ন করলো—উনি কে ?

—উনি মাঝে মাঝে আসেন, রাতটা থাকেন, ভোরেই চলে যান।

—কি খান ?

—ঠাকুরের প্রসাদ। ওঁর দু'একজন শিষ্যও মাঝে মাঝে আসেন। আজও হয়ত আসবেন। তাঁরা যদি আসেন তো নিজেরাই রান্না করে খান।

—চাল-ডাল-তরকারী ?

—ওঁরা আনেন সঙ্গে, বড় জোর জ্বালানি কাঠ আর বাসন নেন কখনো কখনো।

—মন্দির থেকে ওঁদের খাবার দেবার ব্যবস্থা হয় না কেন ?

—এ রকম কোনো হুকুম তো নেই খোকাবাবু—ব্যবস্থাও কিছু নেই।

—ওঃ—সুবোধ নিজের দুর্ব্বলতার দিকটা ভেবে শুধু 'ও' বলে চুপ করলো। কিন্তু ও জানে, ওর ঠাকুরদার আমলে এই মন্দিরে সদাব্রত

দেওয়া হোত, বিস্তর সাধু-সজ্জন এসে অন্ন-পান-ভোজন গ্রহণ করতেন—তিনদিন পর্য্যন্ত থাকতে পারতেন তাঁরা, এমন কি তারও বেশি। এই মন্দিরেরই সম্পত্তি ঐ দেবোত্তর ডাঙাটা, যেখানে সেঁজুতি গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এতকাল ওটায় কোনো আয় ছিল না, কিন্তু এবার তো আয় হবে। সুবোধ ঠিক করলো কিছু ব্যয়ও করা উচিৎ ঠাকুরের জন্য, অন্ততঃ পাদপীঠটা বাঁধিয়ে দিতে হবে এবং একআধজন সাধু সজ্জন এলে যাতে খেতে থাকতে পায় তার ব্যবস্থাও রাখতে হবে। এবং এরও প্রয়োজন আছে এখন সুবোধের পক্ষে। সুবোধ যে একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সেটাও প্রচার করা উচিৎ। মন্দিরের পাথরে অনেক লিপি উৎকীর্ণ আছে, ওগুলোর পাঠোদ্ধার করিয়ে প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে দিলে কেমন হয়? খবরের কাগজেও ছাপা যেতে পারে। মন্দিরটা প্রায় হাজার বছরের! হয়তো ঐ শিলালিপি থেকে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের একটা বিস্মৃত অধ্যায় আবিষ্কৃত হয়ে যাবে—হয়তো প্রমাণিত হয়ে যাবে যে সুবোধ উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের বংশধর—কিংবা বুদ্ধদেবের মানসপুত্রদের কোনো একজনের গৌরব-পতাকাবাহী।

বুদ্ধদেবের কথা মনে হোল এই জন্য যে মন্দিরের মূর্ত্তি এবং মন্দিরের গঠন,পদ্ধতিতে বৌদ্ধযুগের ছাপ আছে—গুপ্ত বা পাল বংশের ইতিহাস হয়তো উদ্ধৃত হতে পারে ওর থেকে। ইতিহাস সম্বন্ধে সুবোধের ভাল জ্ঞান নেই। মনে পড়লো, লকু একবার তাকে বলেছিল, এই মন্দির ভারতের ইতিহাসে মূল্যবান সম্পদ। ভারত যদি কোনোদিন স্বাধীন হয়, তখন এই মন্দিরের শিলালিপি থেকে ভারতের ইতিহাস উদ্ধার করবার চেষ্টা সে করবে। লকু এখন কোথায় আছে, কে জানে? জানলেও সুবোধ তাকে নিশ্চয় ডাকতো না আজ। আজ লকু ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী সুবোধের। —কিন্তু যাক সে কথা।

সুবোধ ঠিক করলো, কয়েকজন নামকরা পণ্ডিতকে সে আমন্ত্রণ করবে। ভারত আজ স্বাধীন হয়েছে, এখন তো রাষ্ট্র ভারতবাসীর হাতে। কে জানে, এই মন্দিরকে অবলম্বন করে সুবোধের বরাতে আরো কি সম্মান এসে জুটবে! প্রাচীন দিনের এই গৌরব, এটাকে কোনো আধুনিকই ছাড়তে চায় না—পূর্ব্বপুরুষকে নিয়ে গর্ব্ব করা মানুষের যেন চিরন্তন অভ্যাস। অথচ মানুষের আদিমতম পুরুষ হয়তো ছিল বানর কিম্বা বানরের মতই অর্দ্ধমানুষ। ডারউইনের থিয়োরী নাকচ হয়ে গেছে নাকি, শুনেছে সুবোধ, কিন্তু মানুষের আদি পুরুষ বানরের থেকে বেশি সভ্য নিশ্চয় ছিল না। আবার সেই মানুষই এই বিরাট মন্দির গড়েছে, এই সুন্দর শিল্প সৃষ্টি করেছে, এই পবিত্র সঙ্গীতময় মন্ত্র রচনা করেছে—

"আধারভূতা জগতস্তমেকা, মহীস্বরূপেণ বতঃ স্থিতাসি,.. "

পুরোহিতঠাকুরের কণ্ঠনিস্থত স্তোত্রটা শুনছিল সুবোধ। মনটা হঠাৎ ভাবালু হয়ে উঠেছে ওর। স্থানমাহাত্ম্য নাকি? সুবোধের মনে এসব ভাবের স্বপ্ন কেন দেখা দেয়? আশ্চর্য্য তো! না, আশ্চর্য্য নয়,—ঐযে মন্দিরের ঈশান কোণায় পাথরের নারীমূর্ত্তি, যার শ্লথ নীবিবন্ধ সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে আরো মায়াময় হয়ে উঠেছে, ঐদিকে চেয়ে ভাবছিল সুবোধ। সুবোধ পশু নয়, মানুষ, কিন্তু মানুষ তো পশুই! পশুত্ব থেকে কতখানা উঁচুতে সে উঠেছে এই হাজার হাজার বছরের সভ্যতার পথে? কতটা অনুশীলিত করেছে তার স্নেহ-প্রেম-দয়া-মায়ার বৃত্তিকে? নিপীড়িত মানবতার জন্য কতটা অশ্রু বিসর্জ্জন করতে শিখেছে সে? কিছু শিখেছে বৈকি? নইলে এই পরিবারের সেবাব্রত, সদাব্রত এত দীর্ঘদিন ধরে চলতো না। বন্ধ হওয়ার পরেও সুবোধের রক্তে আজ আবার গুমরিয়ে তুলতো না তার পুনঃ প্রবর্ত্তনের অভীপ্সা।

ঐ যে মানুষটি বসে আছেন চোখবুজে, কে জানে, কি উনি পাচ্ছেন ওভাবে বসে থেকে। কি আনন্দ, কোন আশা,—কি ওর পরিণাম? কিন্তু আধ ঘণ্টার ওপর হয়ে গেল, উনি স্থির নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। উনি কি একান্তই অপব্যয় করছেন সময়টাকে কিম্বা ওর থেকে সদ্ব্যয় আর কিছু হতে পারে না সময়ের!

দূর ছাই—সুবোধ নিজেকে ধমক দিল একটা। সুবোধ কি সন্ন্যাস নিতে যাচ্ছে নাকি যে এসব ভাবছে? অনেক অন্যায় করেছে সুবোধ, হয়তো আরো অনেক করবে, করতে হবে তাকে। প্রায়শ্চিত্ত করার সময় তার নয় এখন। অন্যায়ের পর অন্যায় সে এখন করে চলবে, দেখা যাক কতদূত সে উঠতে পারে—মন্ত্রীত্ব পর্য্যন্ত পৌছবার তাব ইচ্ছা! কিন্তু মানুষের জীবন কি পূর্ণ হয় এতে! একফোঁটা আলোর যে দরকার, একটা সেঁজুতি বাতির—একবিন্দু ধূপের গন্ধের, ফুলের একটি পাপড়ার। এই স্বপ্নকে সত্য করতেই মানুষ সভ্যতার পথে এগিয়ে এল এতদূব। এতটা সাংস্কৃতিক গৌরব অর্জন করলো, সন্তানের রক্তে সঞ্চারিত করে দিল তার ঐতিহ্য—এই মন্দিরের প্রতিশিলাখণ্ডে সেই ঐতিহ্য রক্ষা করে গেছেন মানুষেরই সন্তানদল—মানুষ তাই অবিনশ্বর, মানুষের ইতিহাস তাই মৃত্যুঞ্জয়।

সুবোধ এরকম করে অনেকদিন ভাবে নি। হয়তো সময় পায় নি। অর্থার্জনের নিদারুণ স্পৃহা, ক্ষমতা-মত্ততার সীমাহীন স্পর্দ্ধা ওকে উত্তুঙ্গ করে রেখেছে ওর নিজের মনের নাগালের বাইরে—শুধু সেঁজুতির চোখ দুটো মনে পড়লেই ও নেমে আসে কোন পাতালতলে, কিম্বা উঠে যায় কোন ইন্দ্রলোকে, ও জানে না—সেইখানে ও নিজেকে যেন ঠিক মত চিনতে পারে—পশু সুবোধ মানুষ হয়ে ওঠে কয়েকটা মুহূর্ত্তের জন্য।

এই পশু মহামানব হয়ে যেতে পারতো সেঁজুতিকে পেলে। সেঁজুতির থেকে হাজারগুণ রূপসী ও আনতে পারে, লক্ষগুণে গুণবতী ভার্য্যা লাভ করা ওর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয় আজ, কিন্তু আশ্চর্য্য, ঐ দুটো চোখের নিবিড় কালো দৃষ্টি মনে হলে, সুবোধের মনে হয়, ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করার মত এমন সাগর-তীর্থ আর কোথাও নেই। এ কি মোহ! এ কি প্রেম! এ কি প্রেমাতীত কিছু!

সুবোধ নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল সন্ন্যাসীর ধ্যান ভাঙার অপেক্ষায়। কে ঐ সন্ন্যাসী—কেন এখানে আসেন, ওকে জানতে হবে। কোন গুপ্তচর উনি নন, কারণ এতটা বয়সে গুপ্তচরের কাজ করা পোশাবে না। উনি যে বয়স্ক, তার প্রমাণ শুধু পাকা চুলদাড়ীতে নয়, সর্ব্বাঙ্গে। লোলচর্ম্ম ললাটের বলিরেখা, ভ্রূর শ্বেতাভ কেশদাম, সবই জানিয়ে দিচ্ছে উনি সপ্ততি অতিক্রান্ত হয়েছেন। দীর্ঘ আয়ত চোখ বন্ধ থাকলেও মনে হচ্ছে, যেন কি দেখছেন উনি চোখ বুজেই। খুব বাজে সাধু নন ইনি—সুবোধের যেন এই রকম মনে হতে লাগল। পুরোহিত ঠাকুর আরতি শেষ করে প্রসাদ আনলেন সুবোধের জন্য। সুবোধ ইঙ্গিতে বললো—রাখুন।

মন্দির-প্রবেশ নিয়ে দিনকতক খুব গোলমাল গেল মান্দ্রাজের ওদিকে! এদিকে বাংলাদেশে অতটা কিছু অবশ্য হয় নি,—কিন্তু মানুষ ক্রমে বুঝতে শিখছে, আপনার অধিকার আদায় করবার জন্য দাবী জানাচ্ছে, তাকে আর বেশী দিন দাবিয়ে রাখা যাবে না—হঠাৎ সুবোধের মনে নূতন চিন্তা খেলে গেল। এই প্রাচীন মন্দিরের দ্বার সর্ব্বসাধারণের জন্য মুক্ত করে দিয়ে সে একটা কাজের মত কাজ করতে পারে। এই বিখ্যাত দেবায়তন এ দেশের সকলের সুপরিচিত এবং তীর্থস্থান। এখানে সর্ব্বজাতির একীকরণ করে সুবোধ মস্ত একটা কাজ করবে জাতীয় হিতার্থে, জগৎ হিতার্থে।

পণ্ডিত আনার চিন্তাকে আড়াল করে দাঁড়ালো এই নতুন চিন্তাটা। এই তো দরকার—বর্ত্তমান যুগের উপযোগী কাজ। কি হবে ইতিহাসের মৃত পাথর ঘেঁটে? যা গেছে তা যাক—নূতন আসুক নবযুগ নিয়ে। প্রচণ্ড উৎসাহে সুবোধ দাঁড়িয়ে উঠলো একেবারে,—এই ঠিক!

—জয় হোক, মানুষের জয় হোক, মানবতার জয় হোক, মানব ধর্ম্মের জয় হোক—সন্ন্যাসী চোখে মেলে উচ্চধ্বনি করলেন।

উঠে এল সুবোধ ওঁর কাছে, সবিনয় নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলো,—প্রভুর কোথা থেকে আগমন?

—পরিব্রাজক আমি বাবা, নানা দেশে ঘুরি—এলাহাবাদ থেকে আসছি আজ।

—ওখানে কি কুম্ভ মেলা ছিল?

—না—এমনি মানুষের মেলাতেই ঘুরি আমি। মানুষের যেখানে অধিষ্ঠানভূমি সেখানেই আমার তীর্থ—আমি কোনো নির্ব্বিকার অজানা ঈশ্বরের উপাসক নই।

—কিন্তু আপনি অনেকক্ষণ ধরে ধ্যান করছিলেন, সে তবে কার ধ্যান?—সুবোধ বললো।

—সমাহিত চিত্তে ভাবছিলাম, কিসে মানুষের মঙ্গল হয়—পীড়িত মানবত্ব সুস্থ হয়।

সুবোধ বিস্মিত হোল যথেষ্ট। এ কি রকম সন্ন্যাসী? শুধুলো,

—আপনি কি রামকৃষ্ণ বা ঐরকম কোনো মঠের সঙ্গে যুক্ত আছেন?

—না—আমার মঠ আলাদা; আমার মঠের ধর্ম্ম মানুষকে মানবত্ববোধে জাগ্রত করা। বন্যার্ত্তদের সাহায্য, দুর্ভিক্ষপীড়িতদের অন্নদান, ব্যাধিগ্রস্থদের সেবা নিশ্চয়ই খুব ভাল কাজ, কিন্তু মানুষকে পশুত্ব থেকে মুক্ত করার

চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে করা উচিৎ। কয়েকজন মানুষ বন্যায় বা দুর্ভিক্ষে মরলে পৃথিবীর খুব বেশি ক্ষতি হবে না—নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধিয়ে মানুষ এর থেকে কম মরে না,—এ ভাবে মানুষ মরবে এবং জন্মাবে; ওর জন্য দুঃখের কিছু নাই।

—দুঃখটা তাহলে আপনার কিসের জন্য?—সুবোধ এবার ব্যঙ্গ করলো হয়তো।

—মানুষ আজও পশুত্ব থেকে মুক্ত হোল না। সেই বর্ব্বরতা, সেই লোভ-কাম-ক্রোধ, ঈর্ষা-বিদ্বেষ, সেই স্বার্থপরতা আর স্বাভিমান মানুষ আজও ছাড়তে পারলো না। দেবতা হবার উপাদান তার মধ্যে রয়েছে, সে রইল পশু হয়েই—মানুষ হোল না সে।

ব্যঙ্গটাকে এড়িয়ে সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর যেন করুণ হযে বাজতে লাগলো। সুবোধও এই রকম কথা ভাবছিল যেন কিছুক্ষণ আগে, কিন্তু এটা ঠিক সুবোধের অভিমত নয়। মানুষ চিরকাল যা করে এসেছে, আজও তাই করছে। কাম-ক্রোধ-লোভ ছাড়া মানুষ ক'টা জন্মায় পৃথিবীতে? এক আধজন মহামানব হযতো মধ্যে মধ্যে আসেন ঐ রকম বড় বড় কথা বলে মানুষকে মহান করতে; কিন্তু কাজ তাতে কতটুকু হয়েছে? মানুষের রাজত্বে এ রকম হবেই। কিন্তু সুবোধ মনে এ সব ভাবলেও মুখে তার কিছুই প্রকাশ করলো না, অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে বললো,

—আপনার মিশন সত্যি সুন্দর; তবে আমরা ছা-পোষা গেরোস্থ, ও সব শুনবার বা করবার মত সুবিধা-সুযোগ-সময় কিছুই নাই আমাদের; এখানে ক'দিন থাকা হবে প্রভুর?—ব্যঙ্গটা স্পষ্ট হয়ে উঠল ওর কণ্ঠে।

—বলেন তো এখুনি চলে যেতে পারি—সন্ন্যাসীর কণ্ঠ যথেষ্ট তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠলো।

—না-না, আমি কেন সে রকম বলবো ? এটা দেব মন্দির ; আপনি যত দিন ইচ্ছা থাকতে পারেন—সুবোধ যেন সামলাচ্ছে।

—যে দেব মন্দিরে দেবতা নাই, সেখানে আমি কমই থাকি ! আমার চোখে মানুষই দেবতা ! এই মন্দিরের অধিকারীকে মানুষ বলে আমি মনে করি না—চলে যাবো ভোরেই।

অসম্ভব দু:সাহস তো লোকটার ! সুবোধ আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে রইল। নিশ্চয় সুবোধকে ও চেনেনা, নইলে তার মুখের ওপর একরকম কথা বলবার সাহস আজকার স্বাধীন ভারতে কারো নেই বোধ হয়। সুবোধ আজ শুধু এখানকার জমিদার নয়, এ তল্লাটের মহাজাতিসঙ্ঘের সেক্রেটারী ;—নামে, যশে, অর্থে এ দেশে সে আজ প্রায় অদ্বিতীয়। বড়দা দিল্লীতে, সুবোধই এখন এ তরফের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। জেলে না গিয়েও দেশের মধ্যে এতখানি সম্মানাধিকার বোধ হয় আর কেউ লাভ করেনি। চাকরী সে চায় না, নইলে অনায়াসে বৃহৎ-পদ পেতে পারতো ; বললো গম্ভীর স্বরে,

—এই মন্দিরের মালিককে চেনেন নাকি আপনি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—তিনি স্বয়ম্প্রভ ব্যক্তি। প্রতি সকাল-সন্ধ্যায় উদয়-অস্ত হয় তাঁর।

সন্ন্যাসীর জবাবটাও ব্যঙ্গ মিশ্রিত। সুবোধ চটেছে বেশ, কিন্তু কোন রকম কেলেঙ্কারী করবার তার ইচ্ছা নেই, তাই বললো শুধু—উদয়ই হয়েছে, অস্ত যেতে এখনো অনেক দেরী।

—খুব বেশি নয়, দস্তির বাড় দশদিন মাত্র—সন্ন্যাসী গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন।

—অভিশাপ দিচ্ছেন নাকি ? সুবোধ উঠতে উঠতে বললো। হাসি পাচ্ছে ওর এবার।

—অভিশাপ নয়, আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি। অনায়াসলভ্য বস্তু হাতছাড়া হলে মানুষ তার মূল্য বোঝে—সেই মূল্য বোঝবার দিন এসে গেল আপনাদের।

—তার মানে? সুবোধ যেন ধমক দিয়ে উঠলো এবার।

—মানেটা খুবই সোজা, আপনাদের মুরুব্বিদের আচার-আচরণ-গুলোতেই পাবেন। চোখ রাঙাবেন না, ওসবে ভয় করবার জন্য আমি এখানে আসিনি। আপনার মত অনেক মেকী দেশসেবককে জানা আছে আমার—দেখাও আছে। দেশের দুরবস্থাকে চরমে তুলেছেন আপনারা কালোবাজারের কৌশলে, আবার চোখ রাঙানী। লজ্জা করে না? অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, রোগে ওষুধ নেই, ঘর তৈরীর উপাদান নেই—আছে কি আপনাদের স্বাধীন খণ্ডিত ভারতে? সবই তো কালোবাজারে চালান করেছেন, এখন আবার ঐ সর্ব্বহারা গৃহ-হারাদের সর্ব্বনাশের আয়োজন চলছে!

কে লোকটা? কোন বিপ্লবী নাকি? সুবোধের সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে। ওর সঙ্গে নাকি শিষ্যরাও এসে এখানে দেখা করেন। সন্ধান রাখতে হবে। সুবোধ অকস্মাৎ কেমন যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। কে জানে, কে কোথায় ওর শিষ্য-সামন্ত লুকিয়ে আছে কিনা। এই নির্জ্জন মন্দিরে জনচার-পাঁচ মাত্র লোক—তার মধ্যে পুরোহিতঠাকুর তো বৃদ্ধ, তাঁর স্ত্রী, কন্যা এবং শিশুপুত্রকে ধরাই চলে না। বাকী থাকে চাকরটা আর সুবোধের দারোয়ান। সুবোধের শত্রুর অভাব নেই; চতুর্দ্দিকে যে রকম গণ-অন্দোলন আরম্ভ হয়েছে, সরে পড়াই ভাল। কিন্তু কিছু একটা জবাব না দিয়ে গেলে সাধু ভাববে, সুবোধ ভয় পেয়ে পালাচ্ছে। তাই মান-রাখার মত করে বলল,—

—দুবছর মাত্র ভারত স্বাধীন হয়েছে; একটা জাতির জীবনে

এটা কিছুই নয়। ফাটকাবাজি, কালোবাজারও বন্ধ হবে, আপনি সন্ন্যাসী মানুষ, আপনার এসব চিন্তা কেন?—সুবোধ বেরুবার জন্ত পা বাড়ালো।

—চিন্তাটা আপনারাই করুন এবং দুপয়সা সঞ্চয় করে নেন, কিন্তু মনে রাখবেন—এ সঞ্চয় ঘরের ভেতর সাপ পোষার সামিল।

সন্ন্যাসী যেন একটু দম নিয়ে আবার আরম্ভ করলেন—মানুষ যেদিন বুভুক্ষায় অন্ন পাবে না, সেদিন আপনাদের সোনার পাঁচিল ভেঙে ইটগুলো খসিয়ে নিয়ে যেতে তাদের এতোটুকু দ্বিধা হবে না—!

—আপনি কি সেই বুভুক্ষুদের কেউ? সুবোধ উঠোনে নেমে প্রশ্ন করলো।

—হ্যাঁ, আমি তাদের জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধি. কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা কয়ে অনর্থক সময়ের অপব্যয় করতে চাই নে—যান, বাড়ী যান।

যেন হুকুম করলেন তিনি সুবোধকে। সুবোধের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলছে রাগে, কিন্তু উপায় কি? নিতান্ত অসহায় অবস্থায় আছে সে এখানে এখন। যেতে যেতে পুরোহিতঠাকুরকে ইসারায় ডাক দিল। পুরোহিত ঠাকুর বেশ একটু নির্ব্বোধ, বুঝতেই পারলেন না সুবোধের ইঙ্গিত। কিন্তু বাইরে বেরুবার পথে তাঁর কন্যার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সুবোধের। বেশ বড় মেয়ে, বয়স প্রায় কুড়ি, এখনো বিয়ে হয়নি—মানে, বিয়ে দিতে পারেন নি পুরোহিতঠাকুর। শ্যামলাঙ্গী চমৎকার মেয়েটি। সুবোধকে দেখে সঙ্কুচিত হয়ে সরে যাচ্ছিল সে, কিন্তু সুবোধ ওকে ডাক দিল—দুর্গা, শোনো!

শশব্যস্ত হয়ে আঁচলটা সামলাতে সামলাতে দুর্গা কাছে এসে দাঁড়ালো।

—ঐ যে সন্ন্যাসীঠাকুর, উনি বুঝি আসেন মাঝে মঝে?

—হুঁ—দুর্গা লজ্জা-ভয়-জড়িত কণ্ঠে জবাব দিল।

—প্রায়ই আসেন ?

—না, দু-মাস, তিনমাস, চারমাস অন্তর আসেন।

—আর কে আসেন ?

—ওঁর শিষ্যরা মাঝে মাঝে আসেন।

—কি সব কথা হয় ? ঠাকুর দেবতার কথা, নাকি গুলি-বন্দুকের কথা ?

—না, মানুষকে কি করে মানুষ করা যায়, মানব ধর্ম্ম কি করে আবার জাগানো যায় পৃথিবীতে, এই সব কথা। সব আমি ঠিকমত বুঝতে পারি না—তবে ওঁরা অন্যায় কিছু করেন না বা বলেন না।

—তুমি আরো একটু ভাল করে শুনবে। পরশু আমি এসে জেনে যাবো, খুব সাবধান—লোকটাকে আমার মোটে ভাল মনে হোল না। তুমি কিছুটা গুপ্তচরের কাজ করবে লক্ষ্মীটি, কেমন ?

দুর্গা কিছুই বললো না ; সুবোধ আরো একটু সরে এসে বলল,

—লোকটা হয় বিপ্লবী, না হয় গুপ্তচর···না হয়···

—হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা-হাঃ—উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন সন্ন্যাসী। —ওর কোনটাই নই হে সুবোধ, বিপ্লবী ছিলাম ; গুপ্তচরের কাজ করতে চাই না ; আর বাকি যেটা, সেটাও করার বয়স নাই। নির্ভয়ে বাড়ী যাও, ভাল করে ব্ল্যাকমারকেট কর, বিয়ে করে স্ত্রী-পুত্র অর্জ্জন কর—ভয় কি ? কলির শেষ—এখন তোমাদেরই দিনকাল।

পাশ দিয়ে উনি চলে গেলেন সেই আঁতুড়ীপাড়ার জঙ্গলটার দিকে। সান্ধ্য অন্ধকারে ওঁর গৈরিকবাস অল্পদূর যেতেই মিলিয়ে গেল, যেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন উনি। সুবোধ আস্তে বাড়ীর পথ ধরলো। পথে ভয়ের কোন কারণ নেই, তবু সুবোধের গা' ছম্‌ছম্‌ করতে লাগলো। যে-রকম বিশৃঙ্খল অবস্থা দেশের, মানুষ যে-রকম উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে, আইনকে

নিজের হাতে নিয়ে যাচ্ছেতেই কদাচার চালিয়ে চলেছে—সুবোধের রীতিমত ভয় করতে লাগলো। বিশেষ করে সন্ন্যাসীর ঐ উচ্চ আতঙ্কজনক হাসি মনে পড়তেই তার গায়ের রক্ত জল হয়ে আসতে লাগলো যেন। দোনলা বন্দুক হাতে শেপাই সঙ্গে, নিজেও সে ভর যোয়ান মানুষ, তবু পাপীর মনের ভয় যায় না। সুবোধ ভাবতে লাগল, নিষ্ঠুর হাতে কেন সরকার এই উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করছেন না? সে যদি একটা দিনের জন্যও শাসন কর্ত্তৃত্ব হাতে পায় তো দেখে নেবে। পেতে পারে সুবোধ; বর্ত্তমান দিনে এটা আর এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয় তার পক্ষে।

বাড়ীর চিলেকোঠা দেখা যাচ্ছে—আর ভয়ের কোনো কারণ নেই। চেঁচিয়ে উঠলে গ্রাম থেকে লোক এসে পড়বে। কিন্তু এতটা ভয় না পাওয়াই উচিত ছিল সুবোধের। ছিঃ, এতখানা ভীরু হলে কি জমিদারী শাসন করা চলে, নাকি ব্ল্যাকমারকেট করা যায়? ধৈর্য্য আর সাহসই লক্ষ্মীকে বেঁধে রাখতে পারে অচলা করে। জীবনকে ভোগ-করার কাজে ঐ দুটো গুণ একান্ত দরকার। ধৈর্য্য যথেষ্ট আছে সুবোধের। সাহসটা আর একটু বাড়ানো উচিৎ।

সুবোধ এসে ঘরের উচু বারান্দায় উঠলো। পেট্রোমাক্স জ্বলছে—হাজার বাতির আলো। ইলেকট্রিক ডায়নামো আজও বসানো হয় নি—সেঁজুতি গ্রানটার জন্য ডায়নামো বসাবার ইচ্ছা রয়েছে সুবোধের, যদি হয় তো তার বাড়ী অবধি লাইন আনা কঠিন হবে না। বিস্তর পোকা উড়ে বেড়াচ্ছে আলোর চারদিকে—মরছে অসংখ্য। সুবোধের মনে হোল, সেও যেন অমনি একটা লক্ষকোটি বাতির আলো; বহু পতঙ্গ আসবে আর মরবে তাকে ঘিরে। কিন্তু একটা রঙিন প্রজাপতিকে আকর্ষণ করবার ইচ্ছা তার—কে জানে, সে কামনা কখনো সফল হবে কি না?

সুবোধ ঘরে ঢুকলো। ধুতি পাঞ্জাবী ছাড়লো, হীরা বসানো বোতামগুলো তুলে রাখতে বললো চাকরকে, তারপর কৌচে বসে সিগারেট ধরালো একটা। চোখ বুজে ভাবতে লাগলো, ঠিক এই সময় কারো কঙ্কন-শিঞ্জিনী বাজে, কেউ এসে বসে কাছে। কোনো অপার্থিব কণ্ঠ ছোট করে একটু প্রশ্ন করে—চা দেব ?

প্রশ্নটা সত্যিই করলো একজন, কিন্তু অপার্থিক কেউ নয়। বাড়ীর পুরানো চাকর নীলমণি। সুবোধ চোখ না খুলেই ঘাড় নাড়লো একটু, চা দিতেই বললো। বাড়ীটার 'সব আছে অথচ যেন কেউ নাই' ভাব। বিয়ে করে যে-কোন দিন একটা গৃহলক্ষ্মী, একজন উর্ব্বশী বা মেনকা আনা চলতে পারে কিন্তু সুবোধের কাছে সেটা বিড়ম্বনা। ও যেন ভাবতেই পারেনা, এই প্রাচীন প্রাসাদে বিজলী আলোর মত রূপের বিদ্যুৎ ছড়িয়ে গৃহলক্ষ্মী আসবে। এখানে আসবে একটা মৃৎপ্রদীপ—ছোট্ট, সুন্দর কারুখচিত, গৈরিকবর্ণাভ একটি মৃন্ময় দীপ, যার শিখাটুকু কাঁপতে থাকবে নবোঢ়া বধূর মত। শিক্ষিত সুবোধ অমানুষ হতে পারে, বন্য হতে পারে, বর্ব্বর হতে পারে, হাজার নারীর যৌবন দিয়ে তার লালসার আগুনকে প্রোজ্জ্বল রাখতে পারে, কিন্তু তার গৃহকোণের মৃৎপ্রদীপকে সে অশুচি করবে না।

আশ্চর্য্য এই লোকটার মন! অতবড় শয়তান সে, যে-কোনো প্রজার ঘর জ্বালিয়ে তাকে পথে বসিয়ে দেওয়া ওর কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার; মানুষকে মারবার জন্য ওর দুহাতের দশটি আঙ্গুল ছোটবড় হলেও সমান শক্তি রাখে—তবু ওর হৃদয়ের কোন্ কোণায় এই দুর্ব্বলতা আছে লুকিয়ে, ও জানে। এই দুর্ব্বলতাটাকে ও পোষণ করে—লালন করে সযত্নে !

সুবোধ বসে বসে চা খেল সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশিয়ে। এই সময় নানান কাজের চিন্তা ওর মস্তিষ্কে ভিড় জমায়—আর সেগুলোর সমাধান হয়ে যায়। আজ কিন্তু অন্য কোনো চিন্তা এলো না, শুধু সেই সন্ন্যাসীর চিন্তা,—লোকটা কে? বহুদিন পূর্ব্বের দেখা যেন কোনো লোক বলে মনে হোল। নাম ধরে ডেকেছিল সুবোধকে সে! কিন্তু নামটা তো পুরোহিতঠাকুরের কাছেও জেনে থাকতে পারে! হ্যাঁ তাই। ওকে সুবোধ কখনো দেখেনি আগে। লোকটা কোনো দেবতার উপাসনা করে না—মানবত্ব না কী এক অশ্বডিম্ব প্রচার করে বেড়ায়। হাঃ, হাঃ, হাঃ,—হাসি পেল সুবোধের—যাক গে। ওর দ্বারা সুবোধের কি ক্ষতি হতে পারে?

মোড়লমশায়ের আসবার কথা আছে। রাত্রে গোপন পরামর্শ এই লোকটার সঙ্গেই হয় সুবোধের। এখনো এলোনা কেন? এত দেরী তো হয় না! সুবোধ কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিত হোল। নদী পার হয়ে তাকে আসতে হবে—কোনো বিপদ-আপদ ঘটলো না তো?

ডাকের চিঠিগুলো পড়ে আছে ছোট টিপয়টার উপর। সুবোধের খেয়ালই ছিল না এতক্ষণ। হঠাৎ সেই দিকে নজর পড়তে চাকরকে ডেকে আলোটা উস্কে দিতে বললো—চিঠি দু'তিনখানা—পড়ছে। দিল্লী থেকে বড়দা লিখেছেন চিঠি—এটাই আজকার বিশেষ পত্র—বাকীগুলো সাধারণ। বড়দার চিঠিখানা বার তিন-চার পড়লো সুবোধ। রুদ্রাধীশের পুত্রের হস্তাক্ষর—স্বাহার স্বামীর লেখা পত্র। বিশ্বাস করতে পারছে না সুবোধ। সত্যি কি মানুষের এতখানা পরিবর্ত্তন হয়?—সত্যিই হয়? হয়—নইলে যাঁরা সারাজীবন কারাবরণ করে মুক্তি-সংগ্রাম করে এলেন, আজ তাঁরা পদাধীকারের মোহে আচ্ছন্ন কেন? মানুষের মন চির পরিবর্ত্তনশীল। বড়দা তো তুচ্ছ, কত ঋষি-মুণি-তপস্বীর হয়, তো

অন্য কি কথা! খুশীতে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সুবোধের—ভবিষ্যৎ স্বপ্নে সে একমুহূর্তে আত্মহারা হয়ে পড়লো। কিন্তু চিঠিখানা সত্যি বড়দা'র লেখা তো? হাঁ, কারণ সুবোধের চিঠির জবাবেই এ চিঠি লেখা। মণ্ডলমশাই এসে ঢুকলেন ঘরে—সুবোধ সাদরে ওঁকে বসালো।

আসমুদ্র-হিমাচল আজ স্বাধীন। অশোকচক্রলাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ পতাকা মহাভারতের আকাশে উড্ডীন, মানুষের দুঃখের দিন শেষ হবার ইঙ্গিত এবং মহামানবের আবির্ভাবের সংকেত ওতে দীপ্যমান—কিন্তু···এই বড় রকমের 'কিন্তু'টা ভাবিয়ে তুলেছে ইন্দ্রজিৎকে।

ভারতের একান্ত পীঠস্থানে ধর্ম্মচক্র রচনা করবার ভার তার উপর: এই ধর্ম্ম মানবধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম মানুষকে মানবেতর জীব থেকে স্বতন্ত্র করে—সুন্দর করে, সুন্দরের অর্চ্চনায় নিযুক্ত করে। ইন্দ্রজিৎ বহুস্থানেই তাদের সঙ্ঘ স্থাপন করে চলেছে; দেশেবিদেশে ঘুরছে, সময় তার একান্তই নাই—কিন্তু মাঝে মাঝে মন তার নিরাশ হয়ে পড়ে বড্ড। কে জানে কি এর পরিণাম! কে জানে কোনোদিন মানুষ আবার মানবধর্ম্মে জাগবে কি না! কে জানে, মানুষ পশুত্ব থেকে সত্যই উন্নীত হয়েছে কি না?

উৎকলের কোনো এক গিরিগুহায় গত সন্ধ্যায় এসেছে সে। ওখানে যিনি সঙ্ঘমাতা আছেন, তিনি অতি প্রত্যূষে অবগাহন স্নান সেরে ফিরে এলেন। ইন্দ্রজিৎকে নিশ্চুপ বসে থাকতে দেখে বললেন সস্নেহে,—মন খারাপ করো না ইন্দ্রজিৎ, এদেশের মানুষ মৃত্যুঞ্জয়। মরতে মরতে এরা বাঁচে—শ্মশানে বসে অমরত্বের সাধনা করে—বিষ পান করে

অমৃত দান করে এরা—ভয় কি? মৃত্যুর মধ্যে তিনি অমৃত দান করে গেলেন।

—কিন্তু দেবি,— মানুষ এখনো এতখানা বর্ব্বর যে আততায়ীর হাত এতটুকু কাঁপলো না তাকে হত্যা করতে? মতের বা পথের অমিলের জন্য মানুষ এমনিভাবে প্রতিহিংসাপরায়ণ হতে পারে, জানতাম না। হাজার বছর পূর্ব্বে মানুষ যতখানা বর্ব্বর ছিল, তারও পূর্ব্বে যখন মানুষ ক্রুশবিদ্ধ করেছিল যিশুকে, আজকালকার মানুষ নৃশংসতায় তার থেকে কম বলে তো আমার মনে হয় না!

—মানুষের মধ্যে যে পশুত্ব, তার বিনাশ নেই ইন্দ্রজিৎ।

—সেও তো তাহলে মৃত্যুঞ্জয়?

—হোক—তার পশুত্বকে পোষ মানিয়ে নিতে হবে আমাদের মনুষ্যত্ব দিয়ে।

—এই পৃথিবীতে মানুষ খুবই কম মা—যাদের মানুষ বলে মনে করতাম এই ছয়মাস আগে, আজ তারা আমার চোখে অতি সাধারণ চোর-ডাকাত-খুনীর থেকেও ঘৃণ্য, আবার যাদের মোটেই মানুষ বলে মনে করি নি—তারা দেখি, মনুষ্যত্বের কিছু অন্ততঃ রাখে—মানুষকে বোঝা সত্যি দুরূহ।

—সে তো বটেই। ঈশ্বরের আবাসভূমিই তোল মানবদেহ, মানুষের মন, মানব-হৃদয়। এমন কি,-মানুষকেই ঈশ্বর বলতে ঋষি দ্বিধা করেননি।

ইন্দ্রজিৎ চুপ করে রইল। সজ্জমাতা বস্ত্র পরিবর্ত্তন করে ডাকলেন ওকে কিছু খাবার জন্য। গত কাল ভাল খাওয়া হয় নি। ইন্দ্রজিৎ স্নান করবে, তাই বললো,—স্নানটা করেই আসি,—তারপর খাওয়া যাবে।

—বেশী দেরী করো না। তোমার অনেক সঙ্ঘভ্রাতা বেলা আটটার মধ্যে এসে পড়বে।—ইন্দ্রজিৎ মাথা নেড়ে চলে গেল নদীর দিকে।

উৎকলে বৈদেশিক অত্যাচার কমই হয়েছে, তাই আজও এত প্রাচীন কীর্ত্তি চিহ্ন; এখনো পথে পথে মন্দির—সঙ্ঘারাম, শিল্পায়তন। গিরিতে, গুহাতে আজও কত প্রাচীন কীর্ত্তিকথা আকীর্ণ। কে জানে, কত বছর পূর্ব্বে এই অপরূপ শিল্প-সুষমা মানুষ রচনা করেছিল,—কত দীর্ঘদিনের সাধনায়, কত বিপুল অর্থ ব্যয়ে, কত সুনিপুণ প্রতিভাধরের সমবায়ে এই বিরাট রচনা সম্ভব!

ভারতের সবই বিরাট, মহাভারত এক বিরাট গ্রন্থ, বেদ হয়তো তার থেকেও বিরাট—উপনিষদ অগণ্য, ষড়দর্শনের তত্ত্ব আজও মানুষের সাধারণ বুদ্ধিতে প্রবেশ করলো না—কিন্তু এসব গেল পাণ্ডিত্যের দিক। ঐশ্বর্য্যের দিকেও ভারতের কীর্ত্তি কম ছিল না—তার পরিচয় এখানে ঘাটে, মাঠে, বাটে। হয়তো সারা ভারত জুড়েই ছিল এইরকম অসংখ্য কীর্ত্তি-কাহিনী। আজ তারই কয়েকটা ভগ্নাবশেষ নিয়ে বিদেশী ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন, বলেন, 'ভারতের সভ্যতা হাজার দু-তিন বছরের প্রাচীন।' কেউ কেউ আবার তারও নীচে নেমে আসেন। আসুন,—মিথ্যা জলের দাগের মত মিলিয়ে যাবে একদিন।

কিন্তু সত্য উদ্‌ঘাটন করবে কে? ইন্দ্রজিৎ চলতে চলতে যেন থেমে পড়লো! কে আজ প্রাচীন ভারতকে উদ্‌ঘাটিত করে দেখাবার জন্য মাথা ঘামাচ্ছে! কেউ না। ভারতের জাতীয়তার বেদী আজ বৈদেশিক সংস্কৃতিতে কলঙ্কিত—মুখে বড় বড় কথা আর কাজে বিদেশীর অনুকরণ ছাড়া আর তো কিছুই দেখা গেল না এই জাতীয়তার স্বরূপ! কোথায় ভারতকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আসনে বসাবার জন্য প্রচেষ্টা আর কোথায়

ক্রমাগত ভাষা-গত কলহ, প্রদেশগত বিভেদ আর ধর্ম্মগত বৈষম্য নিয়ে আত্মবিনাশ!

ইন্দ্রজিৎ নিশ্বাস ছাড়লো একটা! না, এমন কোনো আশার আলো সে দেখতে পাচ্ছে না, যাতে আশা করা যেতে পারে ভবিষ্যতের জন্য। যাঁরা একাজ করবেন বলে আশা করা গিয়েছিল, তাঁরা শুধু আত্মবঞ্চনাই করছেন না, মানুষকেও বঞ্চনা করছেন। পরাধীন ভারতে যাঁরা ছিলেন কেশরীস্বরূপ, স্বাধীন ভারতে তাঁরা যেন কূর্ম্ম হয়ে উঠেছেন; পদমর্য্যাদার চাপে চিৎ হয়ে পড়েছেন, ক্ষমতার মত্ততায় অন্ধ হয়ে গেছেন; গৌরব হারাবার ভয়ে গর্ব্বিত হয়ে উঠেছেন। অথচ গৌরব যখন ওঁদের কিছুই ছিল না, তখনই ছিলেন ওঁরা গৌরবান্বিত। সেই সত্য গৌরবকে আচ্ছন্ন করে আজ যে মিথ্যা মর্য্যাদার কর্দ্দম-প্রলেপ ওঁরা মাখছেন, ভরেতের মহামৃত্যুঞ্জয় মহাকাল কি তা দেখছেন না?

কিন্তু এ দিনেরও অবসান হবে। মানুষ একদিন বুঝবেই, পৃথিবীতে সে খুব বেশিদিনের জন্য আসে নি—সেই গোণাগাঁথা দিনকয়েকটাকে সার্থক করতে না পারলে পৃথিবীতে আসাই তার বৃথা। এই জ্ঞান কবে মানুষের লাভ হবে? এ জ্ঞান তার আছে—তবু সে অজ্ঞান হয়ে থাকতে চায়। পরম পণ্ডিত, অতি বিচক্ষণ ব্যক্তিও ভুল করেন। ভবিষ্যৎ বংশধর সে ভুল ধরবেই, এটা যেন তিনি বুঝেও না-বোঝার ভাণ করেন;—বর্ত্তমান যুগনিয়ামকগণ তাই করছেন।—ইন্দ্রজিৎ আবার নিশ্বাস ছাড়লো।

কিছু দূরে নদী, স্রোতোস্বিনী। বহু প্রাচীন কালে হয়তো এখানে বাঁধানো ঘাট ছিল, তার চিহ্ন আজো বর্ত্তমান রয়েছে পাথরের সোপান-শ্রেণীতে। অত্যন্ত নির্জন স্থান—হয়তো শত বৎসর বা সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এখানে সহস্র বরনারীর নূপুর-শিঞ্জন ধ্বনিত হোত, লীলায়িত নৃত্য

ভঙ্গিতে তাঁরা স্নান করতে নামতেন এই কাচস্বচ্ছ জলতলে—চূর্ণ জল-কণায় সিক্ত হয়ে উঠতো ওপারের বনভূমি, কুটজকুসুমের গন্ধ মিশ্রিত সেই জল বাষ্প হয়ে হয়তো ওপারের গিরিগুহাবাসী ব্রহ্মচারীকে যোগভ্রষ্ট করে তুলতো—ভাবতে কত ভালো লাগে! হয়তো হোম-ধূম-গন্ধামোদিত এই শান্ত তপোভূমিতে একদিন সামধ্বনি জাগতো প্রভাতের কনকাভ কিরণের সঙ্গে :—

"তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহী..."

অতীতের এই বিস্মৃত স্মৃতির মধ্যে ডুবে থাকা ইন্দ্রজিতের নিজস্ব আনন্দ-আস্বাদন; এটা শুধু ওর নেশা নয়, এটা যেন ওর খাদ্য, ওর মনের পরিপোষক আহার্য্য! ভাবতে ভাবতে জলে নামলো ইন্দ্রজিত! নদীর ওপারে বনভূমি, সূর্য্যকিরণে বৃক্ষচ্ছায়া সুমনোরম দেখাচ্ছে এপার থেকে—এপার থেকে তাকালে ওখানে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এই নদী খরস্রোতা শুধু নয়, অত্যন্ত গভীর এবং হয়তো হিংস্র জলজন্তু সমাকীর্ণ। ইন্দ্রজিত ভাল করে দেখে নিল, কোনো জলজন্তু ঘাটের আসে পাশে আছে কি না। জীবনের মমতার জন্য নয়, জীবনকে রক্ষা করার জন্য। এখন কিছু দিন ওকে বাঁচতে হবে, দেখতে হবে, ভারতের বর্ত্তমান স্বাধীন জীবন কি ভাবে গঠিত হয়ে উঠে। স্বধর্ম্মে, নাকি সৎধর্ম্মে, নাকি বিজাতীয় ধর্ম্মে। যতদূর দেখা যাচ্ছে, ভারত আর স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না—না পারুক, যে ধর্ম সে গ্রহণ করবে, তা যদি সৎধর্ম্ম হয়, তাতে যদি মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয়, তাহলে দুঃখের কোনো কারণ থাকে না—কিন্তু তাতো হচ্ছে না। ভারত নিজেকে হারিয়েছে, অথচ অপরকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণও করতে পারছে না। এই ইতঃ নষ্ট স্ততো ভ্রষ্ট জীবন আর কতকাল চলবে? ভারতীয় মহিমার সমাধি হোল, কিন্তু নব ভারত জাগছে না! জাগবার আশা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে আসছে।

জলে গোটা কয়েক ডুব দিয়ে ইন্দ্রজিৎ উঠে পড়লো—বেশ লাগছে। অবগাহন স্নানের একটা সুন্দর আরাম আছে; আর কিছুতে এটা পাওয়া যায় না। কলকাতায় কাবেরীদের বাড়ীতে ওর বাবা ধারাযন্ত্র তৈরী করিয়েছেন মেয়ের জন্য। ইন্দ্রজিৎ একদিন স্নান করেছিল—মনে আছে। আরাম খুবই কিন্তু প্রাণমণ এমন তৃপ্ত হয় না। ও যেন অতিরিক্ত বিলাস এবং বিলাস ব্যাপারটাই কৃত্রিম! অকৃত্রিম স্রোত-জলে আকণ্ঠ নিমগ্ন হয়ে যে স্নান, তার সঙ্গে কি কৃত্রিম ধারাযন্ত্রের তুলনা হতে পারে?

কিন্তু কাবেরীর কথা হঠাৎ মনে এল ইন্দ্রজিতের আজ, যেন কে মনে করিয়ে দিল। মনের এই বিলাস তার অধিকারের বহির্ভূত। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সে দান করেছে তার সঙ্ঘের কাজে। তার পর বেরিয়ে পড়েছে সারা ভারতের অগণ্য পথে তাদের সঙ্ঘের বার্ত্তা প্রচার করতে। কাবেরীর কথা মনে করবার অধিকার কৈ তার! কিন্তু মন বস্তুটার উপর কারো নিয়ন্ত্রণশক্তি নেই যোগিজন ছাড়া। ইন্দ্রজিৎ আর যাই হোক যোগী নয়। কাবেরীর কথা মনে এলো তো এমন তীব্রভাবে এল যে, আর সবকিছুকে আচ্ছন্ন করেই শুধু তারই কথা জাগতে লাগলো মনে। কেমন আছে কাবেরী? ভালই থাকবে! খারাপ থাকবার তো কথা নয় তার। ধনী বাপের আদরের দুলালী সে, গাড়ীতে, বাড়ীতে, আদরে, অলঙ্কারে আরামে থাকবার কথা তার। হয়তো পতিনির্ব্বাচন করে নিয়েছে কাউকে, এবং পত্নীর গৌরবে স্ব-সমাজে পরমানন্দে সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছে।

মনের ভেতরটা কেমন আড়ষ্ট হয়ে আসছে ইন্দ্রজিতের—ঈর্ষা নয়, ক্ষোভ! কাবেরীকে ভালবেসেছিল ইন্দ্রজিৎ এবং কাবেরীও তাকে ভাল-বেসেছিল কিন্তু সে প্রেম এ মর্ত্ত্যের নয়, অমর্ত্ত্য। ওকে জীবনে লাভ

করা সম্ভব নয় তার পক্ষে—এটা জানিয়ে দিলেই ভাল হোত সেই রাত্রে, যে-দিন শেষ দেখা হয় তার সঙ্গে। আজও যদি কাবেরী তার জন্য অপেক্ষা করে থাকে তাহলে নিশ্চয় সে এই পৃথিবীর মানবী নয়—ইন্দ্রজিৎ ফেরার পথ ধরলো।

হয়তো অপেক্ষাই করবে কাবেরী, কারণ ওর মার সতীত্বনিষ্ঠার সবটারই সে উত্তরাধিকারিণী। তাহলে তো ইন্দ্রজিৎ খুবই অন্যায় করেছে। একটী অনূঢ়া বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যা তার জন্য অপেক্ষা করে আছে, আর সে দেশে দেশে ঘুরে মানব-ধর্ম্ম-প্রচার করে ফিরছে নিশ্চিন্ত মনে, এটা স্বভাব-বিরোধি—স্ব-ভাবের ব্যতিক্রম।

ওর লোভাতুর মন যেন মুহূর্ত্তে ওকে অবনমিত করে ফেললো. কলকাতায় একবার ফিরতে হবে—খবর নিতে হবে কাবেরীর। দূর থেকে দেখবে সে, যদি কাবেরী ভাল থাকে, ভালই, যদি তা না থাকে তা হলে যাতে সে ভাল থাকতে পারে, তার ব্যবস্থা করতেই হবে—ভাবতে ভাবতে ফিরে এল ইন্দ্রজিৎ।

আশ্চর্য্য এই যে এতখানা পথ সে ঐ একটা কথাই ভাবতে ভাবতে ফিরলো! যে ইন্দ্রজিৎ মিনিটের মধ্যে কত অজস্র কথা ভেবে যায়—তার মনে এই পনের মিনিটকাল আর কিছু কথা, কোনো ভাবনা উঠলো না। তপস্বিনী সঙ্ঘমাতা ওর মুখ দেখে প্রশ্ন করলেন—

—বড্ড আনমনা দেখাচ্ছে বাবা ইন্দ্রজিৎ?

—হ্যাঁ—মা, একবার কলকাতা যেতে হবে। আজই যাব সন্ধ্যার ট্রেণে।

—যাবে। তোমার কর্ত্তব্যের কিছুটা সেখানে রয়েছে এখনো।

—কেন এ কথা বলছেন মা?—ইন্দ্রজিৎ বিস্মিতকৌতূহলে প্রশ্ন করলো।

—কারণ, আমি জানি. মোহিতবাবু আজও কন্যার বিবাহ দিতে পারেন নি। তুমি গিয়ে তার একটা ব্যবস্থা করে এসো—।

—আমি কি ব্যবস্থা করবো মা? আমি তো তাকে বিয়ে করে সন্ন্যাসিনী করতে পারি না।

—না—দরকার হয়, তোমাকেও সংসারী হতে হবে। একটা মূল্যবান জীবন নষ্ট তো হতে দিতে পারি না আমরা। আমাদের ধর্ম্মের ব্যতিক্রম সেটা।

ইন্দ্রজিত নীরব রইল। সঙ্ঘভ্রাতারা সব এসে গেছেন। তাদের সঙ্গে আলোচনা হবে, ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নির্ণিত হবে। কিন্তু ইন্দ্রজিতের মনের তারে থেকে থেকে বাজতে লাগলো সন্ধ্যার ট্রেণের না শোনা বাঁশী, ঝম্‌ঝম্ শব্দ—মানস চক্ষে জাগতে লাগলো, কলকাতার জনবহুল পথ—মোহিতবাবুর বাড়ী আর দুটি মোহময় চোখ—নীল সমুদ্রের মত অগাধ। সন্ধ্যার আগেই সে রওনা হয়ে গেল ষ্টেশনে।

"মৃত্যুর মধ্যে অমৃতত্ব লাভ করুক ওরা, জীবনকে রক্ষা করবার জন্য যারা জীবন দিল—মৃত্যুকে জয় করবার সাধনায় যারা মৃত্যুঞ্জয় হয়েছে,—মহিমাকে বর্জন করে যারা হোল মহিমাময়।"—আশ্রমের মেয়েদের একত্র করে উৎপলা কথা বলছিল।

মহাযুদ্ধে আর মন্বন্তরে যারা মরেছে, মৃত্যুর তাণ্ডবে যারা মরলো এই কিছুদিন পূর্ব্বে, তাদেরকে লক্ষ্য করেই ওর প্রার্থনা ঝঙ্কৃত হচ্ছিল। কতকগুলি বাস্তুহারা নারী এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ওদের কেউ হারিয়েছে পিতা, কেউবা পতি, কেউবা পুত্র! আশ্রয়হীনা হয়ে ওরা অরণ্যে যেতে পারে নি—জনাকীর্ণ কলকাতায় এসেছে কিন্তু কলকাতা

হয়তো অরণ্যের থেকেও নির্জন। 'জন' শব্দের অর্থ যদি মানুষ হয়, তাহলে এই বিশাল পুরীতে কটা সত্যি মানুষ আছে, আঙ্গুলে হয়তো গোনা যায়।

সেবা সঙ্ঘ, সমিতি, আশ্রম অসংখ্য আছে এখানে। কাগজে নাম ছাপাবার জন্য দাতার সংখ্যাও কম নেই, চ্যারিটিশো অর্গানাইজ করে পয়সা উপার্জন প্রচুর হচ্ছে, সরকার থেকেও নানা ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে শোনা যায়, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, দুঃখের কিছু মাত্র অবসান ঘটলো না। হয়তো ঘটবে—হয়তো এই দুঃখ ভাবী সম্পদের সূচনা করছে, কিন্তু আজ ঐ বাউণ্ডুলে যাযাবরদের জন্য চোখের জল ফেলে কয়জন? অসংখ্য সর্ব্বহারা ঘর ছেড়ে এসেছে—এরা অভিযাত্রিক নয়, নিতান্ত প্রাণের দায়ে এখানে ভীড় করছে আজ। বক্তৃতায় পেট ভরে না এদের—খবরের কাগজের প্রোপাগাণ্ডাতে আর আস্থা নেই—দুহাতের সবল বাহু দিয়ে এরা আজ আশ্রয়-সন্ধানী। উৎপলার ক্ষমতা একান্ত সীমাবদ্ধ তবু সে সাধ্য মত অনেকগুলি সর্ব্বহারাকে আশ্রয দিয়েছে, হয়তো সাধ্যের অতিরিক্ত করেছে সে। কৃষ্ণাকে বলল,

—লকুদাকে একবার আসবার জন্য ফোন করে দে কৃষ্ণা! দেখি যদি কিছু হয়।

—লকুদা নেই কলকাতায়।—কৃষ্ণা উত্তর দিল।

—কোথায় তিনি?

—মাদ্রাজ গেছেন, ওখান থেকে বোম্বাই যাবেন—সেখানে নাকি তাঁর কি বই ছায়াচিত্রের জন্য নেবার কথা হচ্ছে।—কিছু টাকা হয়তো পেতে পারেন।

—ও, আচ্ছা,—বড়দাকে একখানা চিঠি লিখতে হবে—ঠিকানা জানিস?

—হ্যাঁ—বড়দা হয়তো কিছু ব্যবস্থা করতে পারবেন।

কৃষ্ণার কথা শুনে উৎপলা যেন কিছু অশ্বস্ত হোল। তাকে ডেকে গোপনে কয়েকটা উপদেশ দিল; বলল,

—তুই চিঠিখানা লিখে রাখ, আমি ওবেলা এসে সই করে ডাকে দেব।

—আচ্ছা,—কৃষ্ণা জবাব দিয়ে উপস্থিত মত ব্যবস্থা করতে গেল সকলের।

উৎপলা তখনকার মত বাড়ী ফিরবে। হঠাৎ একখানা স্লিপ নিয়ে এল তার কাছে বেয়ারা—উৎপলা পড়ে দেখলো—ইন্দ্রজিৎ।

—এখানেই ডাক—উৎপলা বললো বেয়ারাকে।

মিনিট খানেক পরে ইন্দ্রজিৎ এসে অভিবাদন করলো তাকে। ট্রেণ থেকে নেমেই আসছে। উৎপলা চেয়েই বলল—উৎকল থেকে নাকি?

—হ্যাঁ। জবাব দিল ইন্দ্রজিৎ।

নীচের বসবার ঘরেই কথা হচ্ছিল। ইন্দ্রজিত রাত জাগার জন্য ক্লান্ত, তাছাড়া ওর মনের অবস্থাও ভাল নেই। নানা চিন্তায় মনটা বিষাক্ত হয়ে আছে যেন। উৎপলা ওর হোলডলটা একজন চাকরকে রাখতে বলে ওকে স্নান করতে বললো,

—স্নান করে চা খেয়ে একটু ঘুমান—তারপর কথা হবে।

—কথা কইবার মত কিছু নাই আর উৎপলাদি! ট্রেণে জন চার পাঁচ ভদ্রলোকের সঙ্গে এত কথা কয়েছি যে কথা প্রায় ফুরিয়ে গেছে—একটু হাসলো ইন্দ্রজিৎ।

—এত কি কথা কইলেন? হাসিমুখেই শুধুলো উৎপলা।

—কথা অনেক। বিস্মৃত যুগের ইতিহাস থেকে বর্ত্তমান যুগের বিপ্লব পর্য্যন্ত সবই। এই রকম কথায় কোনো সিদ্ধান্তে অবশ্য পৌছানো

যায় না, কিন্তু মানুষের মনের চিন্তাটা কোন খাতে বইছে, তা বেশ বোঝা যায়।

—কোন খাতে বইছে, মনে হোল?—উৎপলার মুখের হাসিটুকু অমলিন।

—মরুভূমির দিকে; ভারতের শ্যামল বনভূমি, বা স্রোতোচ্ছল নদীর দিকে নয়—নগরীর সজ্জিত কানন বা পল্লীর ছায়াস্নিগ্ধ বটচ্ছায়ার দিকে নয়. আজ যে চিন্তা মানুষকে পেয়ে বসেছে, তার গতি মরুভূমির দিকে, মরীচিকার পানে। অপরীক্ষিত এই 'ইজম'কে মানুষ কেন যে এমন করে আলিঙ্গন করতে চায়, জানি না।

—কেন চায়, সেই আলোচনাই করবো ওবেলা আপনার সঙ্গে।

উৎপলা ওর স্নানাহারের ব্যবস্থায় তৎপর হয়ে উঠলো। কৃষ্ণাকে ডেকে বললো—ইন্দ্রজিতবাবুকে চা খাইয়ে বাইরের ঘরে শোবার ব্যবস্থা যেন করে দেওয়া হয়—খাবার ব্যবস্থা ভালভাবে করা হয়। একে সন্ন্যাসী মানুষ, লোকালয়ে আসেন কম; এসে যখন পড়েছেন, যত্ন আত্তির ত্রুটি হলে আবার বনে চলে যেতে পারেন।

কথাগুলো ঈষৎ বিদ্রূপের ভঙ্গীতেই বলছিল উৎপলা। ইন্দ্রজিৎ ঠিক কারণটা বুঝে উঠতে পারছিল না—যতটুকু চেনে সে উৎপলাকে, তাতে জানা আছে যে অকারণ বিদ্রূপ করবার মত মেয়ে নয় উৎপলা। কোথায় কি এমন কারণ ঘটলো, যাতে উৎপলার কণ্ঠে বিদ্রূপ!

—আমি এখানে এসে কি কোনো অসঙ্গত আচরণ করেছি উৎপলাদি?

—খুব সঙ্গত আচরণ করেছেন; আপনাকে আমি খুঁজছিলাম। আর জানেন তো, মেয়েরা অতিমাত্রায় স্বার্থপর! কয়েকটা কাজ আপনাকে দিয়ে করিয়ে নিতে চাই—না বলে পালাবেন না যেন।

—আমাকে দিয়ে কি কাজ হতে পারে ?

—সবই হতে পারে—অন্ততঃ আমি যা চাই তা হবে।

ইন্দ্রজিৎ আর কোনো কথা বললো না। উঠে স্নান করতে গেল। সে যাওয়ার পর উৎপলা বললো কৃষ্ণাকে,

—ও সেই আদি যুগের বিপ্লবী, চিনিস তো কৃষ্ণা ওকে ?

—হ্যাঁ, চিনি বৈকি ! কৃষ্ণা হাসল একটু।

—ওঁরা মানবত্ববোধ প্রচার করে বেড়ান—মানুষ যখন পশু থেকেও বর্ব্বর জীবনে নামল, তখন ওঁদের এই প্রচেষ্টা দেখে হাসি পায় আমার। আবার মনে হয়, হয়তো বিধাতার কোন মঙ্গল ইচ্ছা আছে এর মধ্যে।

—হয়তো আছে—কৃষ্ণা মৃদু স্বরে বললো।

স্নান সেরে এল ইন্দ্রজিত ; কৃষ্ণা তাকে চা-জলখাবার দিল, তারপর পাশের ঘর দেখিয়ে দিল শোবার জন্য। কৃষ্ণা বিশেষ কোনো কথা কইল না ওর সঙ্গে। কারণ খুব বেশি পরিচয় ওর সঙ্গে নেই কৃষ্ণার। তা-ছাড়া কি কথাইবা কইবে ওর সঙ্গে সে ! ইন্দ্রজিৎ শোবার জন্য ঘরে ঢুকে বললো,—খুব বেশি ঘুমিয়ে না পড়ি।

—ঘুমান, বেলা বারোটা নাগাদ ডাক দেবো খাবার জন্য !

—ধন্যবাদ—ইন্দ্রজিত দরজাটা ভেজিয়ে শুয়ে পড়লো। ঘুমে ওর সর্ব্বাঙ্গ এলিয়ে পড়ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে বিছানায় শুয়ে ঘুম আসছে না। অনেকক্ষণ নানান চিন্তা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে—ঘুম ভাঙল কৃষ্ণার ডাকে। বেলা সাড়ে বারো।

—চলুন, খাবেন—কৃষ্ণা বললো ওকে দরজার বাইরে থেকে।

—খাবো—খাবার এখনো পাওয়া যাচ্ছে তাহলে !—ইন্দ্রজিতের কথাটায় ব্যথার ম্লানিমা, কিন্তু কৃষ্ণা সেদিকটা এড়িয়ে গিয়ে বললো,

—আমাদের রেশনে এক-আধজন অতিথির যায়গা হয়।

—হয় নাকি ? তাহলে তো স্বাধীন ভারতের জয় ঘোষণা করতে হয় ! মানুষ বৃটিশ আমলে চেয়েছিল রুটি, আজ পেয়েছে উদরাগ্নির জ্বালা, চেয়েছিল পরণের বস্ত্র, পেয়েছে নগ্নতার লজ্জা, চেয়েছিল আবাস, পেয়েছে আর্ত্তনাদ বাস্তুহারাদের কণ্ঠে, স্ত্রীপুত্রের সাজানো সংসারের বদলে পেয়েছে শ্মশানের শবানুগমনের শোভাযাত্রা !

—উঠে পড়ুন, ওসব খাওয়া-দাওয়া সেরে ভাববেন—কৃষ্ণা থামাবার জন্য বললো।

—ভাববার কিছু নেই। যত কিছু ভাবনার সব শেষ হয়ে গেছে। আজ শাসন যন্ত্রের ক্ষমতা লাভই যাঁদের কাছে বড় তাঁদের হাতেই সব কিছু ভাববার ভার—চলুন, খাওয়া যাক !

—তাঁরা তো ভাবছেনই—কৃষ্ণা যেতে যেতে বললো !

—ভাবছেন, আর উড়ছেন আর বক্তৃতা দিচ্ছেন, বিবৃতি দিচ্ছেন, বাণী দিচ্ছেন। বৃটিশের বিরুদ্ধে গণ সংগ্রামকে জয়যুক্ত করবার জন্য জনসাধারণকে যে মহৎ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল—সেই প্রতিশ্রুতি চমৎকার ভাবে রক্ষিত হচ্ছে !

—রাষ্ট্র এখনো শিশু—কৃষ্ণা মৃদু হেসে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বললো।

—শিশু দেখেই বোঝা যায় মানুষটা কেমন হবে। বনেদী বংশের ছেলে শৈশবেই তার মহিমার পরিচয় দেয়—প্রমাণ বহু আছে !

কৃষ্ণা আর কোনো কথা না বলে ওকে নিয়ে খাবার ঘরে এলো। প্রায় সকলেরই খাওয়া হয়ে গেছে—বাকী আছে কৃষ্ণা আর দুটি মেয়ে এবং ইন্দ্রজিৎ। ওরা একসঙ্গে খেতে বসবে। কৃষ্ণা শুধুলো ওকে,

—আপনাকে কি আসন-পিঁড়ি করে আলাদা বসাবো ?

—ওসব গোঁড়ামী নেই আমার—আর আমি সত্যি সন্ন্যাসী নই। অর্থাৎ গুরুমন্ত্রের সঙ্গে কৌপীন-চিমটা-কমণ্ডলু নিয়ে ধ্যানরত সন্ন্যাসী নই আমি—আপনাদের যেমন সুবিধা হয়, দিন!

টেবিলেই খেতে বসতে হোল ইন্দ্রজিতকে। এখানে এই ব্যবস্থাটা উৎপলা করেছে। এর কারণ অন্য কিছু নয়—স্থানাভাব এবং খাবার সুবিধা। অবশ্য অনেক ভেবে চিন্তেই উৎপলা এই ব্যবস্থা করেছে এবং তার জন্য অনেক কথাও সহ্য করেছে অনেকের, কিন্তু যা সে নিজে ভাল বলে মনে করে তা করতে দ্বিধা করে না। খেতে খেতে কিছু আলোচনার সুবিধা হয় এতে! কৃষ্ণা বললো এতোক্ষণে—দু'বছর হোল দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু স্বাধীনতার যে সুখ, যে আনন্দ তার কিছুই আমরা পেলাম না, তাই মনে হয়—

—আরো অনেক বেশী দুঃখই পাচ্ছি—কদর্য্য অন্নের মুষ্টি তুলে ইন্দ্রজিত বললো।

—'চাল খাওয়া বিলাসিতা' আমাদের জনৈক নেতা নাকি সেদিন বলেছেন।—কৃষ্ণা হেসে বলল কথাটা।

—তাতো বলবেনই। চাল আমরা ওঁদের আমলেই খাচ্ছি কি না! এত বেশি বিলাসে অভ্যস্থ হলে আমরা কুড়ে হয়ে যাব—অকর্ম্মণ্য হয়ে যাব এবং আগামী দশকের মধ্যে মারা যাব—তাই এই সুখাদ্য……হাঃ হাঃ হাঃ! ভাতের কাঁকরগুলো বাছতে বাছতে ইন্দ্রজিত বললো আস্তে আস্তে।

—কি করা যাবে বলুন—জাতিটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এই রকম খাদ্য নাকি দেওয়া দরকার। সরষের তেলে কি যেন বিষ রয়েছে, বলে দেওয়া হোল সেদিন—তেল নাইবা খেলাম। ঘি তো নাই, বনস্পতিও অচল—অতএব এখন আমাদের সেই প্রাচীন যুগে ফিরে গিয়ে বনজঙ্গল থেকে লতাগুল্ম এনে সেদ্ধ করে খেতে হবে—শিকার করে আনতে হবে বন

থেকে, কয়লার অভাবে পুড়িয়ে খেতে হবে। রান্না করার মত যথেষ্ট ইন্ধন নেই—কিন্তু এগুলো সবই সেই প্রাচীন সংস্কৃতিকে উদ্ধার করবার জন্য—পুনর্মূষিক করবার জন্য!

—আমরা ব্যাঘ্র হয়েছিলাম কবে? খেতে বসা একটি মেয়ে প্রশ্ন করলো।

—ব্যাঘ্র হইনি—বিড়াল হয়েছিলাম—ইংরাজ আমলে এখান-সেখান থেকে চুরি চামারি করে দুধটা মাছটা খেতাম আমরা—হাসতে লাগলো সবাই।

—হাসি বাদ দিন—ইন্দ্রজিৎ যেন ধমকে উঠলো।

—কান্নাও আসে না আমার—কৃষ্ণা বললো হাসতে হাসতেই।

—হাসি আর কান্নাকে ছাড়িয়ে যে বস্তুটা তাকে কি বলে? ইন্দ্রজিৎ শুধুলো!

—তাকে বলে ঠুঁটো জগন্নাথ! কিছুই করছেন না, শুধুই দেখছেন।

—ঠিক তাই। গণ-ভগবান আজ ঠুঁটো জগন্নাথ—ইন্দ্রজিত বলে চললো—কোনো নেতাকে বা কোনো প্রতিষ্ঠানকে ভোট দেবার সময় আমরা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত শক্তিটুকু তাঁকে দিয়ে আসি—আমাদের কাছ থেকে পাওয়া তিল তিল শক্তি নিয়ে তিনি হন অসীম ক্ষমতাশালী আর আমরা হয়ে যাই নিঃস্ব। এখন, সেই শক্তি যাকে আমরা দিয়ে এলাম, তার কাছে আমরা হই কৃপার পাত্র—তাঁর করুণার ভিখারী। তিনি যদি সেই শক্তির অপব্যবহার করেন তো কি আমরা করতে পারি?

—সত্যাগ্রহ, অনশন—কৃষ্ণা হাসলো আবার।

—অত সোজা নয়—ইন্দ্রজিৎ বললো—শক্তিটা যখন দেওয়া হয়ে যায় তখন অত সহজে তাকে আর কেড়ে নেওয়া যায় না—গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে এইটাই আমার চোখে বড় ত্রুটি বলে মনে হয়।

—আমার চোখে অন্য একটা ত্রুটি ধরা পড়ে—কৃষ্ণা বললো।

—কি সেটা ?

গণতন্ত্রে যিনি সর্ব্বেসর্ব্বা হন, তিনি গোড়া থেকেই বুঝে রাখেন যে, তাঁর পদের পরমায়ু মাত্র কয়েকটা বছর, এর মধ্যে যা-কিছু তিনি করে নিতে পারবেন নিজের জন্য এবং স্ত্রীপুত্রের জন্য। মানুষ স্বভাবতঃই এত বেশি স্বার্থপর যে, নিজেকে বাদ দিয়ে অপরের কল্যাণ চিন্তা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব—তাই পদলাভের পরেই তিনি অতিরিক্ত স্বার্থপর হয়ে পড়েন ; এবং কিছুদিন পরেই তাঁর পদাধিকার চলে যাবে ভেবে, পদাশ্রিত জনগণের উপর দরদটা তাঁর খুবই কম থাকে—যদি তিনি জানতেন যে এই পদ তাঁর পুত্রপৌত্রাদিক্রমে থাকবে, তাহলে সেটা রক্ষার জন্য যত্ন তিনি করতেন।

—আপনার কথাটা আগের যুগের রাজতন্ত্রের কাছ ঘেঁসে যাচ্ছে।

—কতকটা ; কিন্তু রাজতন্ত্রেও মন্ত্রিমণ্ডলী গণভোটে নির্ব্বাচিত হতেন, শোনা যায়।

—ওসব ইতিহাসের কথা থাক। আগামী পৃথিবীতে গণতন্ত্রই চলবে। ওর ত্রুটি কোথায়, আমাদের দেখতে হবে ধীরে ধীরে।

ইন্দ্রজিত কিছুই খেতে পারলো না। কৃষ্ণা দুঃখ করে বলল—কেন যে মরতে কলকাতায় এলেন !

—মরতে আসিনি, আপনাদের মৃত্যু দেখতে এলাম—বলে ইন্দ্রজিৎ হাত ধুলো এসে।

নির্ম্মল আকাশ—!

বিহারীনাথের বনভূমিতে শীতের শেষ উৎসব জেগেছে—নববসন্তের উৎসব। এসময় এ দেশের অধিবাসীদের আনন্দ হয় অসীম—মনে যেন

নেশা লাগে। অবিরাম মাদল, শিঙ্গা আর মদনভেড় বাজতে থাকে—হাঁড়ি হাঁড়ি হাড়িয়া চলতে থাকে—ওদিকে মহুয়াবনের পাকা মহুলের গন্ধ যেন আরো মাতাল করে রাখে এদের। ধানকাটা শেষ হয়েছে—জনার, ভুট্টা খামারে উঠেছে, অড়হর কলাইও মাড়া হচ্ছে—ঘরে খাবারের কিছুমাত্র অভাব নেই। এই তো উৎসবের সময়। বিয়ের ব্যাপার গুলোও এই সময়েই হয় বেশি—কারণ এখন হাতে কাজ অনেকটা কম—বসন্ত ঋতু এসে পড়লো, বিয়ের এমন লগ্ন আর নাই।

মাতলা মাঝির মেয়ের বিয়ে পরশু। আজ থেকে উৎসব লেগেছে ছোট গ্রামটীতে। সারা গ্রামটারই বিয়ে যেন—এমনি এদের একতাবোধ। কেউ কাউকে ছেড়ে উৎসব করে না। যুবতী মেয়েদের তো কথাই নাই, আধবুড়ী মেয়েরাও উৎসবে যোগ দিয়েছে মহা উৎসাহে। দং সিরিং চলছে মাদলের তালে তালে।

সন্ন্যাসী শুনতে পেলেন ; বাজনা শুনেই বোঝা যায় বিয়ের গান ; এর বাজনা আলাদা রকম। গত কিছুদিন সন্ন্যাসী সারাভারত প্রদক্ষিণ করছিলেন—বিভিন্ন স্থানে মঠ প্রতিষ্ঠা করছিলেন। এই মাত্র চার পাঁচ দিন ফিরেছেন। এসেই খবর নিয়ে জানলেন,—এখানকার আরণ্যক জীবনেও বিপ্লবের বিষ ছড়িয়ে গেছে, শান্ত সমাহিত আদিবাসীরা অধিকার লাভের জন্য ব্যস্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। অবশ্য এদের সাধারণ সামাজিক আচরণ, বিয়ে, উৎসব ঠিকই চলছে কিন্তু কি যেন এরা পেল না—কি যেন ওদের দেওয়া হচ্ছে না—এই ভাব সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। যুগের প্রভাবকে অতিক্রম করার সাধ্য কারো নাই—ওরাও আপন অধিকার চাইবে—তাতে বলবার কি আছে ?

কিন্তু খবরটা ভাল করে জানতে হবে। সন্ন্যাসী স্নানাদি সেরে ঐ গ্রামের অভিমুখে রওনা হলেন। রাণী এখন আর এখানে থাকে না,

সন্ন্যাসী তার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। সে এখন স্বাহার বাড়ীতে থাকে। স্বাহা তাকে বোনের মত দেখে—খোকাকে ওর হাতে ছেড়ে দিয়েছে।

নিশ্চিন্তমনে সন্ন্যাসী এসে আশ্রম-গুহায় উঠেছেন এবার। বাকী জীবনটুকু দেশের কল্যাণচিন্তায় ব্যয়িত করে অনন্তের পথে চলে যাবেন, এই আশা। সঙ্গের সাথীরা সবাই তো গেলেন। যে দু'একজন এখনো আছেন, তাঁরা আজ উচ্চ রাজকর্ম্মচারী কিম্বা মহাধনী। উনি মহা ধনী হতে চান নি—উচ্চ রাজকর্ম্মচারী হবার লোভ ওঁর নেই—যেটুকু প্রথম যৌবনে করেছিলেন দেশ-মাতৃকার জন্য আজ তার ফল যে দেখতে পাচ্ছেন, এই ওঁর মহা ভাগ্য।

কিন্তু ফল কি সত্যি দেখতে পাচ্ছেন? চিন্তা করতে করতে চলছিলেন সন্ন্যাসী। যা আশা করেছিলেন, তার শতাংশও তো দেখা যাচ্ছে না! ইংরাজ ভারত ছেড়ে গেল অহিংসার অমোঘ অস্ত্রবলে কিম্বা কে জানে ঠিক কিসের জন্য ইংরাজ ভারত ছাড়লো বিনা যুদ্ধে, বিনা দ্বন্দ্বে, বিনা রক্তপাতে!—আজ দুবছর পরে ভেবে দেখবার সময় এসেছে—কিন্তু ভাবছে কে? ইংরাজ ভারত ছাড়লো নাকি ছেড়েও ছাড়লো না—আরো বেশি করে বন্দী করলো ভারতকে? কেটে ভাগ করে তো দিলই—শান্তির পথটাকে করলো অবরুদ্ধ। প্রতিদিকে আজ গণ্ডগোল। যারা কোনোদিন শান্তি ছেড়ে অশান্ত হয় নি, তারাও আজ যুদ্ধোন্মুখ। তিব্বতে অশান্তি, সিকিমে গোলযোগ, আসামে উৎপাৎ—হিমালয়ের গিরিরাজ্যগুলিতে পর্য্যন্ত বহ্নিজ্বালা জেগেছে। চিরমৌন হিমাচল পর্য্যন্ত অশান্ত।

হিমাচল বলতে কত কথা মনে আসে। হিমাচল শুধু ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থভূমি নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির, হয়তো বা পৃথিবীর আদিম সংস্কৃতির আদিমতম বিদ্যায়তন—শ্রেষ্ঠতম বিশ্ববিদ্যালয়। আজও তার শিখরে

শিখরে, কন্দরে কন্দরে, গুহাতে গুহাতে কত বাণী, কত বার্ত্তা, কত অলিখিত ইতিকথা সুপ্ত, গোপন—স্বাধীন ভারত শান্ত সমাহিত হয়ে তার পাঠোদ্ধার করবে—বিশ্ববাসীকে শোনাবে সেই সুপ্রাচীন গুরুগণের শান্তি মন্ত্র, ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাদরায়ণের দর্শনেতিহাস, কণাদ পতঞ্জলীর যোগসূত্র—কিন্তু পশ্চিমের ভোগপরায়ণ সভ্যতা কি তা হতে দেবে!

মানুষের আত্মাকে চেনার দিন নেই আর। আজ গিরিগুহায় বসে আত্মচিন্তা বা ঈশ্বর চিন্তা করাকে সময়ের অপব্যবহার বলে মনে করা হয়—তার থেকে ক্লাবে, ক্যাসানোভায় গিয়ে দুপেগ হুইস্কি বা দু' কাপ কফি খেয়ে ইতরামি করাকে ওরা বলে 'লাইফকে এনজয়' করা—সন্ন্যাসী নিশ্বাস ছাড়লেন।

গভীর বন—বাঘভালুকের ভয় যথেষ্ট, বিশেষ করে বাঘরা বৎসরের এই সময়টাতেই বের হয় বেশি। কিন্তু সন্ন্যাসী অকুতোভয়। মৃত্যুকে যেন তিনি জয় করেছেন বহুকাল—মৃত্যু ওর সম্মুখে চোখ রাঙিয়ে দাঁড়ালে উনি হয়তো হেসেই বলবেন—

"মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান"

কিন্তু মরতে তিনি চান না, আরো কিছুদিন স্বাধীন ভারতের স্বাধীনতার আনন্দ দেখে যেতে চান। বয়স হয়েছে—কিন্তু উনি এখনো যথেষ্ট কর্ম্মক্ষম আছেন। উনি দেখতে চান, স্বাধীন ভারত আবার পৃথিবীর সমস্ত জাতির গুরুর আসনে বসে কি না—আশা কিছুমাত্র নেই, কারণ বহু শতাব্দির পরাধিনতার পাপে বা শাপে ভারতের সন্ততি আজ পঙ্গু।—এই কি রাজর্ষি জনকের দেশ? এই কি শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শ রামরাজ্য? কিন্তু থাক. এ আলোচনার লাভ নাই আজ আর।

পাহাড় থেকে নেমে উনি আরো গভীর বনভূমিতে প্রবেশ করলেন।

অরণ্যজননী যেন ডাক দিয়ে বলছেন—'আয় আয়, আমার অন্তরের আরো গভীর স্নেহতলে চলে আয়। এখানে কোনো 'ইজম' নেই—কোনো 'বাদ' নেই, কোনো প্রতিবাদ নেই। মার্কসিজ্‌ম্‌, সোস্যালিজ্‌ম্‌ বা কমিউনিজ্‌ম্‌ কিম্বা অনাগত যুগের আরো অন্য কোন 'ইজ্‌ম্‌' তোকে তিলমাত্র চিন্তিত করবে না—চলে আয় এই অন্তরের গভীরে।'

বুদ্ধিজীবী মানুষ বুদ্ধির চালনা করতে করতে অরণ্য জননীকে হত্যা করেছে—যেটুকু আজো আছে, তাতেই বোঝা যায়, মা কি ছিলেন। মা কি হয়েছেন, তাও বোঝা যায়, যখন দেখা যায় ধলভূমের বিশাল অরণ্য কেটে বিরাট লৌহকারখানার ধোঁয়া আকাশকে কলঙ্কিত করছে, বন্দিনী সুবর্ণরেখার সোনার অঙ্গ কয়লার গুঁড়ো মেখে মলিন।—মা কি হবেন? কিন্তু ভাবতে আর ইচ্ছে করে না। মা কি হবেন—তা বেশ বোঝা যাচ্ছে ঐ আকাশপথে উড়ন্ত এরোপ্লেনের কর্কশ আওয়াজে। নিশ্চয় কোনো দেশসেবক যাচ্ছেন। স্বাধীন হবার পর থেকে ওঁরা আর রেলে ষ্টিমারে যান না—ওতে নাকি ভারতীয় আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হতে পারে! ভারতীয় আভিজাত্য আরো অনেক কিছুতেই নাকি ক্ষুণ্ণ হয়! হয়না শুধু ভারতের অধিবাসীদের অর্দ্ধাহারে, অর্দ্ধনগ্নতায়—হয় না রোগে ওষুধের অভাবে, পথ্যের কদর্য্যতায়, বাস্তুহারার আর্ত্তনাদে—ব্যাভিচারের বীভৎসতায়, জীবনকে রক্ষা করার জন্য জীবনাধিক প্রিয়কে বিক্রয় করাতেও—কে জানে আরো কত কিছুতে ক্ষুণ্ণ হয় না ভারতীয় আভিজাত্য। কিন্তু বেতন কম হলে নিশ্চয় ক্ষুণ্ণ হয় আভিজাত্য, নিশ্চয় দুর্ণাম রটে বিদেশে যদি বৈদেশিক দূতদের খাটপালঙ্ক আসবাব আরামের ত্রুটি হয়ে পড়ে! ধন্য আভিজাত্য।

কিন্তু এসব কথা ভেবে মন খারাপ করার কিছু দরকার নেই। যতই ভাবা যায় ততই নিরাশার অন্ধকার ঘনীভূত হবে। ভেবে যারা

প্রতিকার করতে সমর্থ, ভাবনাটা তাঁদেরই জন্য রেখে দিলে কেমন হয়? কিন্তু তাঁরা ভাবলে তো আর ভাবনা ছিল না। ভোট দিয়ে যাঁর উপর নিজের ক্ষমতাটুকু অর্পণ করে আসা হোল, তিনিই এখন সর্ব্বেসর্ব্বা।—সন্ন্যাসী নিশ্বাস ফেললেন।

অরণ্য ক্ষীয়মাণ হয়ে এসেছে এদিকটায়। জঙ্গল কেটে ধানীজমি তৈরী হয়েছে—কিন্তু তার জন্য নয়, অরণ্য কেটে আসবাব বানানো হযেছে—হয়েছে মানুষের প্রযোজনীয় বস্তু প্রস্তুত; ভালই হয়েছে। অরণ্য-জননী চিরকালই মানুষকে স্নেহের চোখে দেখেন—ইন্ধন থেকে আরম্ভ করে আবাস পর্য্যন্ত তিনিই দিযে এসেছেন মানুষকে; এমন কি বর্ত্তমান দিনেও কলকারখানা চালাবার জন্য এই অরণ্য-জননীই বহু লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে মৃদঙ্গার প্রস্তুত করে রেখেছেন আপনার গর্ভ মধ্যে; মানুষ আজ তাকে খনন করে আপনার কাজে নিযুক্ত করেছে।

মানুষের সভ্যতা এগিয়ে এলো এ্যাটোমিক এনার্জি পর্য্যন্ত; আরো কতখানা এগোবে—কে জানে! মৃত্যুকে জয় করবার সাধনা করেছিলেন আয্যঋষি, মৃত্যুকে এগিযে আনবার সাধনা করছে বর্ত্তমান সভ্যতা—মৃত্যু আজ ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রায় তুচ্ছ হয়ে উঠেছে, এখন জাতিগত মৃত্যুকেই মৃত্যু বলা হয়। এই জাতি অর্থাৎ 'নেশ্যন' রক্ষার জন্য আজ চলেছে প্রতিযোগিতা জাতিতে জাতিতে। কবে দ্বন্দ্বের মধ্যে মহাযুদ্ধ আবার পৃথিবীর স্তব্ধ আকাশকে কামানধ্বনিতে ব্যাকুল করে তুলবে তারই শঙ্কায় জাতিগত মানুষ আজ আকুল। এই জাতীয়তাবোধ অর্দ্ধশতাব্দির মাত্র কিন্তু এর ব্যাপকতা এতো ভয়ঙ্কর যে এই সামান্য কয়েকটা বৎসরের মধ্যেই পৃথিবীতে বিশ্বব্যাপী দুটো মহাযুদ্ধ ঘটে গেল—তৃতীয়টাও ঘটবার সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে। তারই দাপটে জাতিসঙ্ঘ আজ উৎকট চিন্তায় কালযাপন করছেন।

যুদ্ধের অর্থই মৃত্যু, তা শত্রুরই হোক বা মিত্রেরই হোক—এই মৃত্যুকে ডেকে আনবার ব্যবস্থায়ই করছে এই নবজাতীয়তাবোধ। গত মহাযুদ্ধের পর যখন কয়েকটা জাতিকে উৎসন্ন করার মত ব্যবস্থা হোল শাস্তিমূলক বিচারের দ্বারা—তখন কেউ কি ভেবে দেখেছিল যে, এই প্রতিশোধ গ্রহণ মানবত্বের বিরোধী! কিন্তু সন্ন্যাসী ভাবতে ভাবতে থামলেন—ক্লান্তিতে নয়, বিরক্ত হয়ে। তাছাড়া ওঁর গম্য স্থানেও প্রায় এসে পৌঁছেছেন তিনি। পাকা রাস্তা পেলেন এতক্ষণে। এই রাস্তা ধরে মোটরবাস যাতায়াত করে—জামতাড়া বা মধুপুর যাওয়া যায় এই পথে।

একখানা বাস আসছিল, তিনি উঠবেন ভেবে ড্রাইভার গাড়ীটা প্রায় থামিয়ে ফেলেছে, হাত ইশারা করে বললেন তিনি—তাঁর দরকার নেই। গাড়ী চলে গেল ধূলো উড়িয়ে। সন্ন্যাসী বাসযাওয়ার উল্টোপথে হাঁটতে লাগলেন। আরো মাইলখানেক যেতে হবে। কিন্তু ছোট একটা নদী আছে পথে, ওখানে পা-দুটো একটু ধোবেন—বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন যেন; আর এরকম পাহাড়ীপথ বেশীদূর হাঁটা যায় না—জরা যেন এসে পড়েছে দেহে।

গ্রামে ঢুকবার আগে একটা প্রকাণ্ড মহুয়া গাছের তলায় কয়েক জন তরুণী সাঁওতাল মেয়ে দেখতে পেলেন। মহুয়াফুল কুড়চ্ছে হয়তো; কিন্তু না, ঐ বিয়ের ব্যাপারেই তারা এসেছে—হয়তো ছোট এই নদীটায় জল-সইতে এসেছে। সন্ন্যাসীকে ওরা চেনে—কাজেই কিছু মনে করবেনা ভেবে তিনি এগিয়ে চলতে লাগলেন।

—কুথা যাবি ঠাকুরবাবা?—

…হিদিকে কুথা আইছিলি রে ঠাকুর!

—সুকালবিলা হিদিকে কুথাকে?

পর পর তিনটি মেয়ে প্রশ্ন করলো ওঁকে। উনি হেসে বললেন সকলকেই,

—তোদেরই গাঁয়ে যাব—মাতালের ঘর,—

—ঝুমনীর বিয়ে দেখতে? আয়, আয়?

সাদর আহ্বান জানালো একজন, সম্পর্কে সে ঝুমনীর খুড়তুতো বোন। সন্ন্যাসী দেখতে লাগলেন, ওরা নদীর জলে নেমে কিছু যেন স্ত্রী-আচারের মত করলো—তার পর কলসী ভর্ত্তি জল নিয়ে জোড়ায় জোড়ায় চলতে লাগলো। সন্ন্যাসীও চললেন। যেতে যেতে শুধুলেন একজনকে,

—এটা কি পরব তোদের?

—জলসওয়া—জবাব দিল মেয়েটি।

এদেশে হিন্দুদের মধ্যেও এইরকম প্রথা আছে কিন্তু এদের বিয়ের ব্যাপারটা অনেকটাই ক্ষাত্রযুগের মত! স্বয়ংবর এবং কন্যাকে জোর করে বরের বাড়ী নিয়ে যাওয়ার মত যুদ্ধাভিনয় আজো চলতি আছে এদের মধ্যে। কবে কোন সুপ্রাচীন যুগ থেকে এরা এই রকম ভাবে দাম্পত্য মিলনকে গ্রন্থীবদ্ধ করে আসছে, কে জানে!

সন্ন্যাসী মাতলা মাঝির ঘরের দরজায় এলেন। অনেক লোক। উনি কতকগুলো প্রশ্ন করে জানবার সুযোগ পেলেন—

—তোদের পড়াশুনোর সব ব্যবস্থা করতে সরকার থেকে লোক এসেছিল নাকি?

—হুঁ গো—আইছিল! আবার আরেক রকম লোক আইছিল, তারা বলে, তোরাই জমির মালিক, চাষবাস সব তোদের, ভাগ দিবি কাকে?

—তারপর?

—তা'পর সব অনেক কথা! রাবণ মাঝি সব বলতে পারবেক; আমরা তো অত জানিনা।

সন্ন্যাসী বুঝলেন, সব তথ্য পেতে হলে তাঁকে রাবণ মাঝির কাছে যেতে হবে। বিকেলে যাওয়া স্থির করলেন উনি!

ইণ্ডিয়া! নামটা কে দিয়েছে, ঐতিহাসিক গবেষণা করবেন, কিন্তু নামটা এ দেশবাসীর নয়, এ সত্য সাধারণের অনুভূতিগম্য। স্বাধীন ভারতের নাম কি হবে, নতুন রাষ্ট্রতন্ত্রে তার আলোচনা চলছে। 'মহাভারত' নামটায় আর আমাদের রুচি নাই—অনেকে বলছেন, ইণ্ডিয়া শব্দটা 'হিন্দু' শব্দ থেকে উৎপন্ন, অতএব ঐ নামই থাক! থাক! যুগে যুগে ভারতীয় কৃষ্টিতে কত বিপ্লব-বন্যা এসেছে—ভারতের সনাতনত্ব কোথাও ব্যাহত হয় নি। এই মৃত্যুঞ্জয় সভ্যতা পৃথিবীর আদিম দিনের ইতিহাস থেকে আজ পর্য্যন্ত অব্যয় এবং অমর।

কিন্তু গোল বাধিয়ে গেছে ইংরাজ; এই দেশটাকে একেবারে পশ্চিমী ভাবে ভাবুক করে গেছে এবং যখন সে ভারত ছেড়ে গেল তখন এমন কয়েকজনের হাতে রাষ্ট্রভার অর্পণ করে গেল, যারা ইংরাজীতে চলে বলে, হাসে কাঁদে, খায়, শোয়, স্বপ্ন দেখে। গোটাগুটি আমরা ইংরাজ হয়ে বসতে পারলে হয়তো সে একরকম ভালই হোত কিন্তু তাতো হচ্ছে না—দো-আঁসলার মতন একটা অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে এতে।

ইন্দ্রজিত বসে বসে ভাবছিল এই রকম সব কথা। কৃষ্ণা ওর জন্য চা তৈরী করছে। উৎপলা এখনো বাড়ী থেকে এসে পৌছায় নি।

—কি অত ভাবছেন?—কৃষ্ণা প্রশ্ন করলো চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে। বিশেষ কিছু না—নানা ভাবনায় মিলে একটা কিছু ভাবছি।

—কোথায় বেরুবেন বল্‌লেন যে ?

—হ্যাঁ—একবার মোহিতবাবুর কাছে যেতে হবে।

—সে তো অনেকদূর—বিকেলের দিকে ওপথে ট্রামে বাসে ভীষণ ভীড়।

—হোক্—ভীড়কে ভয় করে বসে থাকা চলে না।

—তা তো বটেই! আচ্ছা, আপনাদের মিশনটা কি শুধু ভারতেই চলে, না ভারতের বাইরেও চালান ?

—ভারতের বাইরেও, তবে কাজ খুব বেশী হচ্ছে না। লোক নাই, টাকা তো নাই-ই—

—টাকা দেশের লোক দেয় না ?

—দেশের লোক টাকা দেবে এসব কাজে! ইন্দ্রজিৎ যেন বিদ্রূপ করে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণেই সংশোধন করে বললো—দেশের লোকই দিচ্ছে টাকা, তবে তারা গরীব লোক। বড় বড় লোকরা বড় বড় কাজে টাকা দিচ্ছেন, যেখানে টাকা দিলে খবরের কাগজে মোটা মোটা অক্ষরে নাম বের হবে। কিন্তু টাকার অভাবে আমাদের কাজ আটকাচ্ছে না—

—তবে ?

—সহানুভূতির অভাব। যে সাংস্কৃতিক গরীমায় আমরা আবার ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই—দেশের অধিকাংশ লোকই তাকে সঠিক বিশ্বাস করে না—বলে, 'তাই কি হয় মশাই ?' এই বৈজ্ঞানিক যুগে আবার কি আপনারা তপোবন গড়ে তুলবেন নাকি।'—তপোবন আমরা গড়তে চাই না, কিন্তু তপোবন যে অবৈজ্ঞানিক কিছু ছিল না, এটা বোঝান মুস্কিল।

—আপনারা বিদেশ থেকে আরম্ভ করুন—যেখানে ভারতীয়রা সংখ্যায় বহু—যেমন আফ্রিকা, বা মালয়ষ্টেট...আমি যোগ দিতে রাজি!

—ধন্যবাদ, আপনাকে পেলে আমরা সত্যি খুসী হই, কিন্তু পলা দেবী কি ছাড়বেন?

—হ্যাঁ—কারণ পলাদির মনের গণ্ডীটা খুবই প্রশস্ত।—কৃষ্ণা মৃদু হাসলো।

—বেশ! আজ স্বাধীনতার সঙ্গে যে মহা সুযোগ আমাদের কাছে এসেছে তাকে কাজে লাগাতে না পারলে এত দুঃখের স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়বে। আজ ভারতীয় সংস্কৃতির উদার ভূমিকার উপর বহুধা বিভক্ত পৃথিবীর মানব সমাজকে মিলিত করার মহামন্ত্র শোনাবার দিন।

—অন্ততঃ বিদেশে যে-সব ভারতীয় আছেন, তাদেরকে মিলিত করতে পারি আমরা আমাদের নিজস্ব ধর্ম্ম আর সংস্কৃতির বিশাল পট-মণ্ডপে!—কৃষ্ণা কললো।

—অত ছোট করে ভাববেন না—বড় করে ভাবুন—তার সিকিখানা অন্ততঃ হবে।

—আচ্ছা,—তবে পৃথিবীর সব মানুষের কথা ভাবতে আমার ভয় করে কৃষ্ণা হেসে বলল—ভয় করে, কারণ বর্ত্তমানের মহা মহা সমস্যা-সঙ্কুল পৃথিবী সমাধানের দিকে এগুচ্ছে না—এগুচ্ছে সঙ্কটের দিকেই। কথাটা বলছি তৃতীয় মহা যুদ্ধের আশঙ্কার কথা ভেবে। মানুষকে মানুষের সত্য দৃষ্টিতে দেখবার কথা মানুষ আজ যেন ভুলেছে—পীড়িত মানবত্মার আর্ত্ত-নাদকে উপেক্ষা করে আজ মানুষ ভোগ-সুখলাভের উৎকণ্ঠাকে উৎকট করে তুলেছে—ফলে এখানে সেখানে পার্থিব ভোগ সুখ যৎকিঞ্চিত লাভ হলেও তার অন্তরের অনির্ব্বাণ মনুষ্যত্ববোধের অগ্নিমান্দ্য ঘটেছে—খাণ্ডব-দাহনে এই অগ্নিমান্দ্য দূর করা উচিৎ।

—খাণ্ডবদাহন বলতে আপনি কি বোঝেন?—ইন্দ্রজিৎ প্রশ্ন করলো।

—এই সর্ব্বগ্রাসী ভোগপরায়ণতাকে ধ্বংস করা। যার বহু আছে

সে আরো বহুতর চায়, শুধু চায়—দেয় না, দিতে চায় না—ত্যাগধর্ম্ম যেন নিবে গেছে পৃথিবী থেকে। অথচ ত্যাগের মহিমোজ্জ্বল প্রকোষ্ঠেই জ্বলে মানবতার সত্য দীপ!

—ব্যাপারটা সোজা হবে না—ইন্দ্রজিত বললো। কাজে নেমে দেখেছি, বহু বিঘ্ন! ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ত্যাগের মাটিতেই, শুধু এই জন্যই একে কোনো একটা বিশেষ জাতির সম্পদ বলা চলে না—বরং আর্য্য, অনার্য্য, শক, হূণ, গুর্জর, মুসলিম, খৃষ্টান প্রভৃতি জাতির চিন্তা, ধর্ম্ম, সংস্কৃতি এই ভারতে যে সমন্বয়মুখী রূপ গ্রহণ করেছে—তাকে বিশ্ব-সংস্কৃতি বলা উচিত। বহুত্বের মধ্যে একত্বকে প্রতিষ্ঠিত করাই ভারতের চিরযুগের নীতি—কিন্তু ভগবানের অভিশাপ কি আশীর্ব্বাদ জানিনা—এই ভারতেই এত ভেদ, এত বিভেদ যে ভাবলে লজ্জিত হতে হয়। কখন কি ভাবে যে ভারতের এই সর্ব্বগ্রাসী প্রতিভা নষ্ট হ'ল, ঠিক বোঝা যায় না···ইন্দ্রজিত চা শেষ করলো।

বেলা বেশী নাই, ওকে আবার অনেক দূর যেতে হবে এবং ফিরেও আসতে হবে। অবশ্য আজকাল আর আগের মত রাস্তা ঘাটে বিশেষ ভয় নাই—যদি না একসিডেন্ট হয়। ইন্দ্রজিত উঠে জামা গায়ে দিল, সন্ন্যাসীর গেরুয়া নয়—সাধারণ ভদ্রলোকের ব্যবহার্য্য লংক্লথের পাঞ্জাবী। বেরুবে, উৎপলা গাড়ী থেকে নেমে ঢুকলো ঘরে।

—চা খাওয়া হয়ে গেছে আপনার?

—হ্যাঁ, খেলাম। যাব একবার মোহিতবাবুর বাড়ী!

—সেখানে কেন? কাবেরীর খোঁজে?—উৎপলা কথাটা বলেই হাসলো একটু।

—হ্যাঁ, আত্মপ্রতারণা যখন করি নি, তখন আপনাকেও প্রতারিত কর্ত্তে চাই নে!

—সাধু ছেলে! উৎপলা আবার হাসলো—কিন্তু ফিরবেন কখন? আজ থাক, কাল সকালে যাবেন। শীতের রাত, ওদিকে বড্ড ঠাণ্ডা, আপনার পাঞ্জাবীতে সে শীত মানাবে না—র‍্যাপার নেই?

—খদ্দরের চাদরখানা রয়েছে, ওতেই হয়ে যাবে! যাই, দেখাটা করে আসি।

—কিছু আলোচনা ছিল আমার আপনার সঙ্গে।

—তাহলে থাক আজ যাব না। ইন্দ্রজিত র‍্যাপারখানা গায়ে দিয়ে বসলো।

নিজেকে সম্বৃত করে উৎপলাও বসলো আসনে। কি নিয়ে কথা আরম্ভ করবে, এই চিন্তায় মিনিট খানেক কাটলো, তারপর উৎপলা আস্তে বললো,

—মানুষ নিজের অতীতকে ভুলতে পারে না, দেশের অতীতকে ভোলাও সম্ভব নয়। এর কারণ কি এই যে তার অতীত জীবনই তার ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলে?

—ঠিক গড়ে তোলে না, পথ নির্দ্দেশ করে; তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, কে সে, কেন এসেছে, তার কর্ত্তব্য কি। অতীত স্মৃতি এই জন্যই মূল্যবান! অবশ্য শুধু অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকারও অনেক দোষ আছে। অতীতকে স্মরণ করে ভবিষ্যৎ পথে এগুতে হবে।

—বেশ, কিন্তু যাদের অতীত ইতিহাস বর্ত্তমান যুগের একেবারে উপযোগী নয়?

—তারাও ইতিহাসকে ছাড়তে পারে না—অতীতকে একেবারে বাদ দিলে তারা আর সে জাতি বা সেজাতির কেউ রইল না।

—নাইবা রইল। তারা নতুন জগতে নব জাতীয়তার সৃষ্টি করবে! বলল উৎপলা।

ইন্দ্রজিৎ ওর মুখের পানে চাইল প্রায় আধমিনিট খানেক। কোথায় যেন ব্যথা লাগছে তার ঐ প্রশ্নটার জবাব দিতে। কিন্তু জবাব দিতে হবে; বলল,

—যাদের ইতিহাস নেই বা যারা নিতান্তই অর্ব্বাচিন, তাদের পক্ষে সেটা হয়ত অবাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু যাদের ইতিহাস বিরাট, মহান, যাদের প্রাচীনত্ব পৃথিবীর ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে, যাদের অতীত গরিমা মানুষের জীবনকে আজও মহামহিমোজ্জ্বল পথরেখা দেখায়, তাদের পক্ষে ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করে নবজাতীয়তার সৃষ্টি করতে যাওয়া আত্মহত্যার সামিল। মানুষ নিজেকে পরিচিত করে তার বংশধারার গৌরবে, নিজ জাতীয়তাকে পরিচিত করে তার অতীত ইতিহাসের মহিমায়,—শুধু একটা মানুষ বা একদল মানুষ যত ক্ষণ কিছু মহান সৃষ্টি না করতে পারছে, ততক্ষণ তার এমন কিছু মূল্য নাই, যাতে সে পশুজগৎ থেকে উন্নত বলে পরিচিত হতে পারে।

—তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু অতীতকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও নব জাতীয়তার সৃষ্টি সম্ভব।

—হয়তো সম্ভব। এই মানুষের ইতিহাসেই নিশ্চয় এমন একদিন ছিল যেদিন তার কোনো ইতিহাস ছিল না,—কিন্তু সেদিনও মানুষ ঠাকুমা ঠাকুরদার মুখে তার বংশধারার কথা, বীরত্বকাহিনী, জীবনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস শুনেছে। ধনুতে ছিলা রোপন করেছিলেন যিনি আদিমতম যুগে, তাঁর পৌত্র হয়ত তাঁরই সেই ধনুটিকে অবলম্বন করে আরো শক্তিশালী মহাধনু প্রস্তুত করেছিলেন। কোকিলের কণ্ঠধ্বনি অনুকরণ করতে গিয়ে হয়তো মানুষ তার স্বকণ্ঠের মাধুর্য্যের আস্বাদ জেনেছিল, পুত্র পৌত্রাদির মধ্যে সেই ইতিহাসই সৃষ্টি করেছে বিরাট সঙ্গীতশাস্ত্র। ইতিহাসকে অবলম্বন করেই মানুষ এগিয়ে এসেছে আধুনিক

যুগে, আবার হাজার বছর পরে যারা আসবে, তারা এই ইতিহাসকে ধরেই আরো এগিয়ে যাবে।

—নূতনের একটা মোহ আছে ; মানুষ তাকে অতি সহজে বরণ করে নিতে চায়।

—কিন্তু অপরীক্ষিত নূতনের মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা কম নয়। পুরাতনকে অবলম্বন করে নূতনের আবিষ্কার তাই অনেকাংশে নিরাপদ। একটা জাতির জীবন নিয়ে তো ছিনিমিনি খেলা চলেনা যে, শুধু থিয়োরীর উপর নির্ভর করে আপনি পরীক্ষা সুরু করবেন ! এগিয়ে চলা আর্য্য ঋষির বাণী। 'চরৈবেতি', অর্থাৎ এগিয়ে চলো, কিন্তু মানুষ যুগেযুগে এই চলার ছন্দকে আবিষ্কার করেছে নূতনভাবে। সামাজিক আর রাজনৈতিক অচলায়তনের অভ্যন্তরে চলিষ্ণু জীবন পদে পদে ব্যাহত হয়, তাই দরকার হয়, পূর্ব্বকল্পের ইতিহাসের বিচার আর তার ভিত্তিতে বর্ত্তমান কল্পের মূল্য নির্দ্ধারণ—ইতিহাস এই মূল্য নির্দ্ধারণ করে।

উৎপলা চুপ করে ভাবতে লাগলো। ইন্দ্রজিত এতগুলো ভারী কথা বলে যেন কিছুটা বিমনা হয়ে রয়েছে। উৎপলা হেসে বলল,

—আপনাকে বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে যেন। যে কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন তাতে ক্লান্তির তো ঠাঁই নেই !

—না, ঠাঁই নেই ; তবু মানুষের মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আজ আমরা এমন একটা সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে এসে পৌচেছি, এই যুগ-মানুষের দল, যে মুহূর্ত্তটা অতিক্রম করা সুদুষ্কর। আজ ভারতে পরশাসনের কলঙ্ক-মলিন অধ্যায়ের অবসান ঘটেছে এবং ভারতের অভ্যন্তরের সামন্ত-তান্ত্রিক রাজ্য গুলিতেও মুক্তির সুগশঙ্খধ্বনি শোনা যাচ্ছে, হয়তো সর্ব্বমানবের কল্যাণময় যুগ সমাগত। কয়েকবৎসর আগের হিংসা, হত্যা, লুণ্ঠনে রক্তাক্ত মানুষকে আবার প্রবলের প্রভুত্ব স্পৃহা আর লোভীর লোভ থেকে

মুক্ত করা সম্ভব হবে,—সত্য, প্রেম, মৈত্রীর দ্বারা মানবসমাজ হয়তো আবার বিশ্বসৌভ্রাত্রিত্বে প্রতিষ্ঠিত হবে—কিন্তু এই আশা করতে গিয়ে যখন দেখি···

—আশাটাকেই জাগিয়ে রাখুন—উৎপলা বাধা দিল—নইলে সবই অন্ধকার।

—পৃথিবী আজ আবার তৃতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমি প্রস্তুত করছে—ইন্দ্রজিৎ পলার বাধা না মেনেই বলে চললো —রণক্লান্ত বিপর্য্যস্ত ইউরোপ আর এশিয়ায় ধনকুবের আমেরিকা যখন একদিকে মার্শাল পরিকল্পনা আর অন্য দিকে অস্ত্র-সাহায্যের দ্বারা সেই রণলিপ্সাকেই জাগিয়ে রাখছে, তখন পৃথিবীর দুর্গত মানুষের জন্য প্রাণ কেঁদে ওঠে। মানুষ আজ অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে, আবাসের অভাবে পশুবৎ জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীভৎসতার ফলে; ঠিক এই সময়েই কোটি কোটি টাকার অস্ত্রসাহায্য করা মানুষের মনুষ্যত্বকে বিদ্রুপ করা ছাড়া কী আর! ইন্দ্রজিৎ একটু থেমে বলল,—নিঃসন্দেহ যে পৃথিবীর দুর্দ্দিন ঘনিয়ে আসছে, তাই টাকার অহঙ্কারে স্ফীত আমেরিকা অস্ত্রের ঘুষ দিয়ে সারা দুনিয়ার উপর প্রভুত্ব কায়েম করতে চাইছে। কোথায় গান্ধীজীর মানবতা, কোথায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীনতা, কোথায় সাম-মৈত্রী-সাধনার যুগবাণী! আন্তর্জ্জাতিক সংঘাতের অনিবার্য্য দ্বন্দ্বে আমরা আজ অশ্রুসাগরের দিকেই অগ্রসর হয়ে চলেছি।

শেষের দিকে ইন্দ্রজিতের কণ্ঠস্বর এতখানি মলিন হয়ে এল যেন কাঁদছে সে, কৃষ্ণা চুপটি করে বসে ছিল—কোনো কথা বলেনি এত ক্ষণ; এবার বলল,

—উপরে যিনি নিয়ন্তা আছেন, তাঁর উপর বিশ্বাস রাখলে এতখানা নিরাশ হবার কারণ ঘটে না—বহু বিপ্লবের মধ্যে বেঁচে থাকবে যে

জীবন, সেই হবে আমাদের জীবন—মহামৃত্যুর মধ্যে যে হবে জয়ী, সেই হবে মৃত্যুঞ্জয়ী। ভয় কি? পৃথিবীর দুর্দ্দিন ঘনিয়ে আসছে সুদিনের সংকেত নিয়ে—মানুষের বর্ব্বরতার চরম বিকাশ ঘটেছে গত যুদ্ধে; হয়তো চরমতম ঘটবে আগামী যুদ্ধে—তারপর শান্তি···

—সে শান্তি হবে শ্মশানের—ইন্দ্রজিত বললো প্রতিবাদের ভঙ্গীতে!

—হোক! সেই শ্মশানে বসে শবসাধনা করবো আমরা, মৃত্যুঞ্জয় আসবেন!

—থাক এ আলোচনা আজ—তুই একটু উচ্ছ্বাসপ্রবণ হয়ে উঠেছিস কৃষ্ণা, পলা বললো—বয়সের ধর্ম্ম; কঠিন বাস্তবকে অগ্রাহ্য করার মত মানসিক বল লাভ খুব সোজা নয়।

—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কঠিন বাস্তবটা হচ্ছে উনি কাবেরীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন, তুমি ওঁকে থামিয়ে দিলে এবং উনি থামলেন। অতএব বোঝা গেল, ওঁর সেরকম মনোবল আছে—কথাটাকে তরল করে পরিহাসে পরিণত করলো কৃষ্ণা।

—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "ঠাট্টা করে উড়াই সখী নিজের কথাটাই" তোকে এইজন্যই ভালো লাগে কৃষ্ণা, তুই এটা পারিস।

—সত্যি, এটা একটা মহৎগুণ!—ইন্দ্রজিৎও সমর্থন করলো।

শীতান্তের নব কিশলয় দেখা দিয়েছে বনে-বাগানে। সুষমাময়ী বাসন্তিকার শুভ আবির্ভাব। মানুষের মনকে নেশায় পেয়েছে যেন। একদল সাঁওতাল মাদল-বাঁশী হাতে নূপুর পরে এসে ঢুকলো অমরপুরে।

সেঁজুতি সকালের কাজ সেরে স্নান করতে যাবার উদ্যোগ করছে,

ওরা এসে গান ধরে দিল নাচতে নাচতে,

বিহান বিলা উঠেছিল রে
সুরয ঠাকুর···
আমার বঁধু চলে গেল রে
কত কত দূর···
ময়ূর পাখা ছিল কেশে রাখা,
যেতে যেতে গেয়ে গেল রে
না-শোনা সুর···

সুমিষ্ট সুন্দর গলা,—দলমিলে গাইছে মাদলের বাজনার সঙ্গে। বাসন্তী-প্রভাতে এই বিরহের গানের সুরে যেন বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠলো সেঁজুতির—থেমে গেল সে হাতের কাপড়গুলো নিয়ে। "যেতে যেতে গেযে গেলরে—না-শোনা সুর", লাইনটা কযেকবারই ঘুরিযে ঘুরিযে গাইল ওরা! মুঠোখানেক চাল বের করে তাদের দিয়ে সেঁজুতি ঘাটের পথ ধরলো। ফিরে এসে রান্না করতে হবে। বুড়ো বাপকে একটু সকালে খেতে না দিলে তাঁর শরীর খারাপ হয···কিন্তু সেঁজুতির মনের গহনতলে কি যেন আলোড়িত হচ্ছে। কতদিন ও ভাবেনি কিছু, প্রায় কযেকমাস, হযতো বছর পার হয়ে গেল। খবরের কাগজও পড়তে পায় না। স্বাহা বৌদির বাড়ীই যাওয়া হয়ে উঠে নি বোধ হয় চার পাঁচ মাস। আশ্চর্য্য তো!

সেঁজুতি করছিল কি এই কয়েকমাস ধরে? নিজকেই সে প্রশ্ন করলো—বিশেষ কিছুই তো করে নি—বৃহদারণ্যক উপনিষদটা শেষ করেছে—যোগবাশিষ্ট আরম্ভ করেছে—কিন্তু সে কাজ তো করে দুপুরে আর রাত্রিবেলা। রাত্রে বেশি পড়া হয় না, তেলের বড্ড অভাব। কণ্ট্রোলে যেটুকু কেরসীন তেল পাওয়া যায তাতে পড়া শুনা করা অসম্ভব। কবে যে এ দুর্গতি ঘুচবে?

কিন্তু সেঁজুতির হাসি পেল। নিজের উপর রাগও হচ্ছে। দেশের এই ঘোর দুর্দ্দিন—অন্ন-বস্ত্র-আবাস হীন মানুষ, আর সেঁজুতি কি না উপনিষদ আর যোগবাশিষ্ট নিয়ে রয়েছে! কোন খবর পর্য্যন্ত রাখেনা, এত বড় দেশটার কি হচ্ছে-যাচ্ছে। কিন্তু খবর কি করে রাখবে? খবরের কাগজ খুললে রাগ হয়। কোন কাগজ দল-নিরপেক্ষ আছে বলে তো মনে হয় না। যদিবা আছে তো সেটা নিশ্চয় সেঁজুতির কাছে পৌঁছাবার উপায় নাই। স্বাহাবৌদির বাড়ীতে যে কাগজগুলো আসে সবই কংগ্রেসের ঢাক—কিন্তু অপর দলের কথাও তো শোনা উচিৎ, নইলে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করা অসম্ভব। দেশের বর্ত্তমান অবস্থাটা সত্যি জানা নেই সেঁজুতির। সুবোধদাদার বাড়ী গেলে ডজন খানেক কাগজ মিলতে পারে। যাবে নাকি সেঁজুতি—গিয়ে খবরাখবর একটু জেনে আসবে? না, থাক।

বর্ত্তমানে সরকার থেকে কিছু বৃত্তি মঞ্জুর করা হয়েছে ওর বাবাকে; সেইটাই ওদের সংসার চালাবার উপায়। বৃত্তি খুব কম হলেও কোনো রকমে চলে যায়—কিন্তু বয়স্থা কন্যার বিবাহের জন্য বৃদ্ধ বাপের চিন্তার অন্ত নেই। বৃত্তিটুকু করিয়ে দিয়েছেন বড়দা। ভাগ্যি সুবোধের সাহায্য নিতে হয় নি।—হলে সেটা বড় অস্বস্তিকর হোত সেঁজুতির পক্ষে।

—সেঁজুতি!—কে যেন ডাকলো! মুখ তুলে তাকালো সেঁজুতি। ওপাড়ার পারুল, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরেছে হয়তো। গা'ময় গহনা, বিয়ের জল পেয়ে চেহারাটা চমৎকার খুলেছে। কালো রঙ শ্যামল হয়ে উঠেছে। পুরন্ত বুক, মুখ, হাতের আঙুলগুলোতে রঙ দেওয়া, কিউটেক্স বা ঐ রকম কিছু হবে।

—কবে এলিরে পারুল? ভাল আছিস?

—হ্যাঁ ভাই, কাল সন্ধ্যার ট্রেণে এলাম। তুই কেমন আছিস ?

—চলছে কোনো রকম! তোর বর কেমন হয়েছে, বেশ ভাল বাসাবাসি হোল তো ?

—তা হোল—পারুল হাসলো একটু—এসেছে আমার সঙ্গেই ; দেখতে শুনতে ভালই, রোজগারও মন্দ করে না, তবে একটা দোষ আছে জানিস, বড্ড রাগী !

—তুই একটু বেশী অনুরাগী হোস, তাহলেই তার রাগটা কমে যাবে।

পারুল নিতান্তই গ্রাম্য মেয়ে। ওর বিদ্যে বড় জোর 'কথামালা' পর্য্যন্ত। 'রাগ' শব্দের পেছনে 'অনু' যোগ করলে কি অর্থ হয়, অতসব তার জানা নেই।

বললো—তা যেন হোল,—বড়দার সঙ্গেও একবার দেখা করতে চায়।

—বড়দা তো এখানে নেই, তিনি দিল্লীতে রয়েছেন! কি জন্য দেখা করবেন ?

—তা ভাই জানি না! দিল্লী গিয়েই ত দেখা করবে, শুধু একটা পরিচয় পত্তর দরকার। তুই ভাই বড় বৌদিকে বলে এটা করিয়ে দে !

—তুই নিজেই তো বড়বৌদিকে বলতে পারিস।

—আমার লজ্জা করে ; তা ছাড়া, আমার বাবার সঙ্গে তেমন মিল তো নেই ওঁদের।

—ওদের কারো সঙ্গেই গরমিল নেই। কিন্তু তোর বাবা তো সুবোধদার সঙ্গে খুবই মেলামেশা করেন। তিনিই পরিচয়পত্র দিতে পারেন।

—সুবোধদাকে ও জানাতে চায় না—কিযেন একটু লুকোছাপা কাজ আছে ওর।—চলতে চলতেই কথা হচ্ছিল। সেঁজুতি একটুখানি ভেবে

নিল, পরে বলল,

— আমি আজ দুপুরে যাব বড়বৌদির কাছে। তোর বরকে নিয়ে তখন যাস, দেখবো, কোনোকিছু করতে পারি কি না।

—আমি যাব না, আমার ছোট ভাইকে সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দেব।

গ্রাম-সুলভ লজ্জা পারুলের। সেঁজুতি হাসলো একটু। পারুল অবার বলল,

—শোন সেঁজুতি, কাল যখন ষ্টেশনে নামলাম, দেখি একখানা টিনের পাতে আলকাতরা দিয়ে লেখা রয়েছে, "সেঁজুতির গ্রামে যাইবার পথ," ইংরাজিতেও নাকি ঐ লেখা রয়েছে, ও পড়ে বললো। 'সেজুতি গ্রাম' কোথায় হোল রে এখানে?

সেঁজুতিও আশ্চর্য্য হয়ে গেল কথাটা শুনে। তার নামে গ্রাম পত্তন করলো কে আবার? নিশ্চয় সুবোধ বাবুর কাণ্ড! রাগে সেঁজুতির কপোল লাল হয়ে উঠলো,—কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য; হেসে বললো,

—পূর্ব্ব বঙ্গের ওঁরা সব এসেছেন; হয়তো 'সেজুতি' কথাটা তাঁদের ভাল লাগে, তাই ঐ বস্তিটার নাম দিযেছেন……আমি ঠিক জানি না!

কথাটা থামিয়ে দিয়ে জলে নামলো সেঁজুতি! মনের মধ্যে কিন্তু চিন্তাটা রয়েছে—উদ্দেশ্য কি সুবোধের? গান্ধী, জহরলাল, সুভাষ, রবীন্দ্র, অরবিন্দ, শরৎ, প্রফুল্ল, ইত্যাদি মহাপুরুষগণকে বাদ দিয়ে নিতান্ত নগণ্য সেঁজুতির নামে গ্রাম পত্তন করা—রহস্যটা কোথায় এর? কিন্তু সেঁজুতি এতখানা নির্ব্বোধ নয় যে এ রহস্য বোঝে না। সুবোধের লুব্ধ দৃষ্টি যে দীর্ঘ দিন থেকে তার পানে শাণিত হচ্ছে তা ওর জানা—ধনের অহঙ্কারে লোকটা ধূর্ত্ততার চরমে উঠলো, দেখা যাচ্ছে; কিন্তু সেঁজুতি এখানে নিতান্ত অসহায়। শব্দটা বাংলা ভাষার, এবং যে কেউ ওটা যে কোনো রকমে ব্যবহার করতে পারে—কারো কিছু বলবার নাই।

—শাশুড়ীটা ভাল পেয়েছি, বুঝলি সেঁজুতি, যা আমাদের দেশের মেয়েরা পায় না।

—খুব সুখের কথা ভাই—সেঁজুতি আনমনে জবাব দিল।

—অবিশ্যি আমিও শাশুড়ির খুব যত্ন করি—যতদূর বোঝা গেল, বউ-কাঁটকী নন। ছেলের বউ, অতএব ঘরের লক্ষ্মী, ইত্যাদি বলেনও—কিন্তু একটু শুচিবাই আছে। শাশুড়ী ভাল হবে কি না, এই ছিল আমার সব থেকে ভয়।

—কেন?—সেঁজুতি সকৌতুকে প্রশ্ন করলো।

—ঐটাই যে হয় না ভাই এই বাংলাদেশে। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হয় আবার ভাবও হয়, কিন্তু শাশুড়ীর সঙ্গে বনিবনা না হলে আর রক্ষে নেই!

—আর ননদ?

—নেই! ওরা দুভাই! আমিই বড়।

—যাক—জ্বালা চুকেছে!—সেঁজুতি হেসে বললো।

—একটা থাকলে মন্দ হোত না রে সেঁজুতি! ননদ যদি ভাল হয়, বড় আনন্দের হয়। ওদেরও দুঃখ যে একটা বোন নেই। শাশুড়ী বলেন, একটা মেয়ে না থাকার দুঃখু আমাকে পেয়ে নাকি ভুলেছেন।

—তোর বর কি কাজ করেন রে পারুল?

—তা জানি না, অতসব মাথায় আসে না আমার। চাকরী করে না। ওদের সহরে বাড়ী,—দুভাই সকালে বেরয়, রাত্রে ফেরে। বিকেলে জলখাবার পর্য্যন্ত খেতে আসে না। আবার কোনো কোনো দিন ও বাড়ী থেকে বেরই হয় না—বলে 'আজ কোনো কাজ নয়—ছন্দোবন্ধ গন্ধ-গীত সব ছেড়ে দিয়ে'...কি যে সব বলে মাইরী, একদম বুঝতে পারি না। তুই হলে ঠিক বুঝতিস

—আমি হলে বড় সুবিধে হোত না—চেঁচিয়ে বলে উঠতাম,

নহে নহে সুখনীড়, প্রিয়া বাহুডোর—
দুস্তর দুঃখের পথে যাত্রা করো সুরু ;
পীড়িত মানুষ কাঁদে পথের ধূলায়
মাতা-ভগিনীর অশ্রু-পঙ্কিল সে পথে
রচিওনা ফুলশয্যা—

—ঐ দেখ, তুই কেমন সুন্দর বলতে পারলি ! আমি ভাই একেবারে চুপ মেরে যাই। এতো খারাপ লাগে !

নিজের উচ্ছ্বাসটাকে অবদমিত করে নিল সেঁজুতি পর মুহূর্ত্তেই, বলল,—তাতে কিছু ক্ষতি হবে না। তোর বরের কবিপ্রাণ সরলা গ্রাম্য বালার আঁচলে বাধা থাকবে !—হাসলো সেঁজুতি কথাটা বলে।

—তুই কি করে এমন সব কথা এত তাড়াতাড়ি বলিস সেঁজুতি— ! আশ্চর্য্য ! আমার বর তোকে পেলে সত্যি খুব খুসী হবে। আলাপ করিয়ে দেব আজই।

—কিন্তু মেযেরা কোন সময়ই চায় না যে তার বর অন্য কোনো মেয়েকে দেখে খুসী হোক—জানিস্ নে বোকা মেয়ে—আমাকে দেখে খুসি হলে তোর কি লাভ ?

—বারে ! তুই আমার ছোট বেলার সই। তোর সঙ্গে ওর ভাবতো হওয়াই চাই।

নিতান্ত গ্রাম্য আছে এই পারুল। অত সব ঘোর-প্যাঁচের মধ্যে গেলই না ও। সেঁজুতি বুঝলো ব্যাপারখানা। কিন্তু আর ওবিষয়ে কিছু না বলে শুধু বললো,

—আনিস তাকে আমাদের বাড়ীতে—দেখবো কতখানা কাব্য করতে পারে।

—পারে! দেখলে তুই খুসী হবি। ঐ যা একটু রাগী, বদমেজাজী; কিন্তু সে বেশীক্ষণ থাকে না—চট্ করে রাগে, চট্ করে রাগ পড়ে যায়।

সেঁজুতি গা' মাজছিল শুধু গামছা দিয়ে। পারুল মস্ত একখানা সাবান বের করে বললো—নে, মাখ,—ভালো সাবান, মিষ্টি গন্ধটা!

—থাক—আমার তো আর বর আসছে না—তুই মেখে গায়ে গন্ধ কর!

—নে না ভাই, গরীবের ধন একটু নিলি তো কি হোল?

সাবান মাখা ওর রীতি নয়, কিন্তু এখন অস্বীকার করলে পারুল খুবই ক্ষুণ্ণ হবে; সেজুতি নিরুপায় হয়েই নিল সাবানটা হাত পেতে। বিদেশী সাবান। সাবান বেচেই কত কোটি টাকা নিয়ে যায় বিদেশী, সূচ পর্য্যন্ত বেচে টাকা নিয়ে যায়, নিয়ে যায় ধান চাল গম, তুলা, তিসি মরিচ, আর দিয়ে যায় তার বদলে এই চটকদার গন্ধ, মেকী অঙ্গরাগ, বেহায়াপনার অস্ত্র-শস্ত্র, যাকে বলে প্রসাধন-সামগ্রী। সাবানটা গায়ে ঘষতে ঘষতে সেঁজুতি ভাবতে লাগলো—উজ্জয়িনী প্রাসাদ-অলিন্দে লোধ্-রেণু মাখা তন্বী তরুণী, মেখলাতে দুলিয়ে দিয়েছে নব নীপের মালা,—কবরীতে কুন্দমালা বেষ্টিত। অগুরু-কুঙ্কুম-কস্তুরী-মৃগনাভি-চন্দন-সৌরভে নগরীর আকাশ ভারাক্রান্ত। কি সুন্দর সেই অতীত যুগের স্মৃতি! আর কি ফিরে আসবে না সেদিন? আসবে—ভারতের স্বাধীন স্বত্বায় তার বীজ হয়তো এই আঠারো মাসের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছে—হয়তো এই কয়েক মাসের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতিকে সকল রকমে উদ্ধার করবার জন্য প্রচুর গবেষক নিযুক্ত হয়েছেন। হয়তো, ইংরাজ আমলে মৃত ভাষা বলে কথিত সংস্কৃতকে রাষ্ট্র ভাষার মর্য্যাদা দান করছেন আজ ভারতের রাষ্ট্রনায়ক-গণ—যে ভাষার বাণী,

"যত্র বিশ্বো ভবত্যেক নীড়ং"

সমস্ত পৃথিবী যেখানে মিলিত হবে, মানুষ যেখানে প্রাণে প্রাণে এক, সাম্য যেখানে অর্থগত, সমাজগত, জাতিগত গণ্ডী ছাড়িয়ে মনুষ্যত্বগত মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত! সত্য যেখানে জবালা-তনয়কে ব্রাহ্মণত্বের মর্য্যাদা দিতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব করে না—মিথ্যা যেখানে যুধিষ্ঠিরকেও নরকে নিয়ে যায়।

—কি ভাবছিস সেঁজুতি?—পারুল প্রশ্ন করলো!

—ও, সাবান যখন ছিল না, তখন আমাদের ঠাকুমারা কি মাখতেন?

—কে জানে কি মাখতো তারা। সাবান না মেখে থাকা যায় না ভাই সেজুতি!

—আমি তো বেশ থাকি, অবশ্য আমার বর আসেনি বলেই বেশ থাকি।—হাসল সেঁজুতি! দেরী হয়ে যাচ্ছে, রান্না করতে হবে গিয়ে; তাড়াতাড়ি স্নান সেরে উঠলো—বাবার জন্য রান্নাটা শিগ্রী করতে হবে রে, চল্লুম—সেঁজুতি চলে এল। ইতিমধ্যে আরো কয়েকটি মেয়ে ঘাটে এসে গেছে—পারুল তাদেরই সঙ্গে কথা কইতে লাগলো।

নিজের ঘরে ফিরে সেঁজুতি রান্না চড়ালো। কাজ খুবই কম ওর, একাই সব কাজ করে; ছোট ভাইটা ফিরলো এতক্ষণে পাঠশালা থেকে। ওকে খেতে দিয়ে সেঁজতি বললো—আজ বিকালে ঝিঙ্গে-কাঁকুড় গাছ লাগাব।

—বেশ, দিদি,—গাঁদা আর হরগৌরী ফুলও লাগাতে হবে কিন্তুক।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। জানিস, তোর সন্ধ্যা-মালতীর গাছটা গজিয়েছে।

—তাই নাকি?—বলেই খাবার ফেলে দেখতে ছুটলো। দু'লাফে গিয়ে দাঁড়ালো উঠোনের এক কোণায়, যেখানে ওর সন্ধ্যা-মালতীর

গাছটা গত বছর ছিল। সত্যিই গজিয়েছে ওটা। প্রকাণ্ড মান গাছটার কাছে ঐ ছোট চারাটি—লাল টুকটুকে ওর রং এখন ; তমাল ফিরে এসে বলল,—গাছটা খুব সুন্দর দেখাচ্ছে দিদি, কিন্তুক লাল রং হয়েছে ; ঠিক যেমন সেই তক্ষকের বাচ্চা। ও রকম কেন হোল ?

—তক্ষকের বাচ্চাইতো! অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ও যাবে ব্রহ্মশাপ হয়ে ; রাজা পরীক্ষিৎ রক্ষে পাবে না ; হাজার মন্ত্র-তন্ত্র, যাগ-যজ্ঞ সব বৃথা যাবে !

—তার মানে ?—তমাল অতিবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো।

—মানেটা বুঝবি আর একটু বড় হলে। মহাভারতের গল্প এটা— ; পড়িস নি ?

—হ্যাঁ—সেই যে তক্ষক সাপ এসে রাজা পরীক্ষিতকে কামড়ালো, আর সে মরল !

—পরীক্ষিৎ ছিল অত্যাচারী, অকারণে সে অরণ্যচারী ঋষির অপমান করেছিল।

—কিন্তুক তারপর ওর ছেলে যে সাপগুলোনকে পুড়িয়ে মারলো, তখন কি ?

—পুড়িয়ে মারতে পারলো না। ওদের রক্ষা করতে ঋষি আস্তিক আবির্ভূত হলেন। সাপের বংশ মৃত্যুঞ্জয় হয়ে আজো বেঁচে রয়েছে।

—হ্যাঁ দিদি, খুব ভাল বেঁচে আছে। উঃ! ঐ নদীধারটায় যে নতুন গাঁ হচ্ছে ওখানে অন্ততঃ চল্লিশ পঞ্চাশটা "খরিশ" মারা পড়লো।

—অতগুলো !

—হ্যাঁ—ওখানে শরমানা আর ঐ পাহাড়টায় যে বিস্তর সাপ আর কাঁকড়াবিছে।

—ওখানে কি গাঁ হচ্ছে রে তমাল ?

—ওঃ, মস্ত বড় গাঁ তৈরী হচ্ছে। সহর হবে। আমাদের সুবোধদা' করাচ্ছেন। বিস্তর সব লোক এসেছে দিদি—ঘর হচ্ছে একতালা, দোতালা টিনের, টালীর।

—কি নাম দিয়েছে গাঁয়ের ?

—তা জানি না!—জলযোগ শেষ করে ফেললো তমাল। এবার একটুখানি খেলা করবে। মা-হারা ভাইটিকে মাতৃস্নেহ দিয়ে মানুষ করছে সেঁজুতি। দাদা এখনও ফেরেন নি—যদিও জেল থেকে তিনি খালাস পেয়েছেন। কিন্তু ইংরাজের কারাগার তাঁকে দুরারোগ্য ব্যাধি দান করেছে। ভালো হবার আশা করে না সেঁজুতি—তবে বুড়ো বাবাকে সে খবর জানায় না। বলে—'সামান্য অসুখ বাবা, ভালো হলেই দাদা ফিরে আসবেন।' কিন্তু আশার অবশেষ কিছুমাত্র নাই। এই বারো বছরের ভাইটিই তাই সেঁজুতির এখন একমাত্র অবলম্বন। সংসারটা ওর অসম্ভব রকমে দুঃখী। বহু সময় মনে হয়, ঈশ্বর বলে হয়তো কেউ কোথাও নেই। নইলে তার সমস্ত দিকটা এমন করে অন্ধকার হয়ে যেত না। মা নাই, বাবা বৃদ্ধ, দাদা শুধু কারাবাসী নয়, মরণোন্মুখ—ছোট ভাইটা নিতান্তই ছোট।

দুঃখ সইবার শক্তি ওর অসাধারণ, তাই হাসি ওর মুখে সব সময়েই লেগে থাকে। নইলে বুক ফেটে মারা যাবার কথা তার। কিন্তু এই সহ্য শক্তি তো ঈশ্বরই যোগাচ্ছেন। মন্বন্তর, মহামারী পার করে দুঃস্থ এই সংসারকে তিনিই তো চালিয়ে আনলেন। বাবার বৃত্তিটা না হলে না খেয়ে ওরা নিশ্চয় মারা যেতো। দাদার যে রকম অসুখ, বাড়ীতে থাকলে বিনা চিকিৎসায় তাঁকে মরতে হোত। ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী বলে হাঁসপাতালে দাদা যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছেন—ফ্রি বেড্ এবং ভাল ওষুদপত্র পান। জানি না কি উদ্দেশ্য ঈশ্বরের; সেঁজুতি এই অতি দীনতাকে

আশ্রয় করেও এগিয়ে চলেছে জীবনের পথে।—ভাত চড়িয়ে সেলাই করতে করতে ভাবছিল সেঁজুতি—সেলাইটা সৌখীন একটু। এক টুকরো সাদা কাপড় পেয়েছিল, পুরোনো কাপড়ের পাড়ের সুতো বের করে সেই সাদা কাপড়টুকুতে ও কবি সত্যেন্দ্রনাথের একটা কবিতা সেলাইয়ে তুলছে :—

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরই মাথায় নাচি!
আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।
আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়,
'সিংহল' নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয়।

কবিতা খুব বড় না হলেও নেহাৎ ছোট নয়। কয়েকদিন থেকেই সেঁজুতি এই সৌখীন কাজটা করছে। মনের গোপন কোণে একটা স্তিমিত আশা জেগে আছে—দাদা যদি ফেরে তো এই শেলাইটা তাকে উপহার দেবে সেঁজুতি। শেষের কয়টা লাইন আর বাকি :—

দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদেরই এই কুটীরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি;
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া—
বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিযা নিমাই ধরেছে কায়া;
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে-বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়!

... ...

মিলনের মহা মন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি ধীরে,
মুক্ত হইব দেবঋণে মোরা মুক্ত বেণীর তীরে।

কবিতাটি বাঙালীর সুপ্রাচীন দিন থেকে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত ধারাবাহিকতার ইতিহাস। অতীশ দীপঙ্কর থেকে বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম জগতে, জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতে, ধীরত্বে, বীরত্বে, মানবতায় বাঙালীর সমস্ত পরিচয় এমন করে আর কোনো কবিতায় পায় নি সেঁজুতি। বড় চমৎকার লাগে ওর এটা আবৃত্তি করতে। উঠোনে চেয়ে দেখলো—তমাল খেলা করতে যায় নি—কোদালী দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। ডাক দিয়ে বলল,
—ওটা কি করছিস ভাই তমাল ?

—শাক্ বুনতে হবে দিদি—মাটিটা থামাল করে দিচ্ছি!

'গ্রো মোর ফুড্' আন্দোলনের বীজ ঢুকলো নাকি ওর মধ্যেও ? কিন্তু সকাল থেকে পড়ে এল, এখন একটু খেলা করা উচিৎ। বলল,

—রাখ এখন! রোদে ওসব করতে হবে না। যা, খেলা করে আয় একটু।

—এই তো খেলা দিদি, বেশ লাগছে আমার।

সেঁজুতি আর কিছু বললো না। শাক বুনবার প্রয়োজনটা অতটুকু ছেলেও বোঝে।

চাপা নিঃশ্বাস পড়লো একটা ওর। বাবার যা শরীরের অবস্থা, তাতে যে-কোনোদিন দেহ রক্ষা করতে পারেন। তখন বৃত্তিটা বন্ধ হয়ে যাবে এবং—আর ভাবতে পারে না সেঁজুতি! ভাতের মাড় গালতে হবে। মাড়টা ফেলনা যায়—গরু তো নাই, বেচে দিয়েছে মন্বন্তরের সময়। মাড়টা না ফেলে ভাতেই মাখিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু বাবার পেটে সে ভাত হজম হয় না। সেঁজুতি আর তমাল তো ওটা খেতে পারে। মাড়টা যত্ন করে রেখে দিল সেঁজুতি। খেতে খুব খারাপ কিছু লাগে না।

সহ্য হয়ে গেছে অর্দ্ধাহারের দুঃখ কিন্তু বস্ত্রহীনতার লজ্জা এত বেশী প্রকট যে, কোনো রকমে একবার পুকুরে নেয়ে আসে সেঁজুতি ; সারাদিন আর বেরুতে পারে না। এখন স্বাহার বাড়ী যাবার উপায়ও নেই তার। পারুলকে বলেছে যে আজ দুপুরে সে যাবে ওখানে। কিন্তু যাবে কি করে? শতছিন্ন কাপড়ে তার যৌবনোচ্ছল অঙ্গ আবৃত করা অসম্ভব। সেঁজুতি কবিতা সেলাই রেখে শাড়ীখানা সেলাই করতে বসলো। সেলাই আর চলে না, শাড়ীর এমন অবস্থা! এতো দুঃখের মধ্যেও সেঁজুতি কেন যে বেঁচে আছে, কে জানে! দাদার রোগ না হয়ে সেঁজুতির হলে তো কোনো ক্ষতি হোত না ঈশ্বরের বিশ্বচালনার!—চোখে জলটা ছাপিয়ে উঠলো ওর।

—শাকের বীজগুলো দাও দিদি, বুনে ফেলি!—তমাল বললো।

—এখন না, বিকেলে বুনবি।—রোদ থেকে উঠে আয় এবার।

—যাই—তমাল এলো কিন্তু তৎক্ষণাৎ ছোট্ট ছিপটা হাতে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লো। পুঁটিমাছ ধরতে গেল হয়তো! যাক—ভাত খাবার কিছুই নাই—যদি দুটো পুঁটিমাছও আনতে পারে, ভেজে, নাহয় পুড়িয়ে খেতে পারবে।

অলস মন্থর গতিতেও কাজগুলো শেষ হয়ে গেল সেঁজুতির। তমাল সত্যি কয়েকটা পুঁটিমাছ এনেছে। আনন্দে ওর বড় বড় চোখদুটো আরো বড় দেখাচ্ছে।

—বারোটা পুঁটি দিদি—বাবার ছ'টা, তোমার আমার আধাআধি।

—ও কিরকম ভাগ হোল রে?—সেঁজুতি হেসে বললো।

—মানে, বাবাকে ছটা দিয়ে তোমার আমার তিনটে করে।

—ঐ ভাষায় বুঝি বলতে হয় সে কথা?

তমাল বুঝতে পারলো না, কোথায় তার ভুল হয়েছে ; চুপ করে রইল! দিদি তার পণ্ডিত মানুষ, জানে তমাল। কিন্তু সেঁজুতি আর কিছু বললো না ওকে। পুঁটিগুলো ভেজে ভাত দিল বাবাকে আর ভাইকে। বাবা প্রায় কথা বলেন না—দুঃখৈদৈন্যে উনি প্রায নীরব হয়ে গেছেন। তারপর শরীর অত্যন্ত জীর্ণ। মাঝে মাঝে শুধু বলেন, —রুদ্রাধীশ ভালই করেছে দেশ ছেড়ে চলে গিয়ে। আমিই তখন মাথায় পড়ে রয়ে গেলাম। —তাঁর থাকার যে কত প্রয়োজন ছিল, তা তিনি বোঝেন! না থাকলে এই অবিবাহিতা মেয়ে আর অপোগণ্ড শিশুর কি অবস্থা হোত, কে জানে! তিনি কিছুই করেন না, কিন্তু বৃত্তিটা তাঁর জীবনের জন্যই দেওয়া হয়। তাই উনি ভাবেন, যতক্ষণ বড় ছেলে ফিরে না আসে ততক্ষণ যেন জীবনটা তাঁর রক্ষা করেন ভগবান। গীতায় ডুবেই দিন কাটাচ্ছেন। মাঝে মাঝে কিছু লিখবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু হাত কাঁপে, তাই সেঁজুতিকে দিয়ে লেখান। অনেক লেখা জমে উঠেছে, যদি কখনো শুভদিন আসে তো ওগুলো জনসমাজের গোচরে আনবার চেষ্টা করবে ছেলেমেয়ে। লেখাগুলোতে গীতার মর্ম্মকথা, ভারতের পরীক্ষিত সমাজ-শাসনের সঙ্গে মিলিয়ে বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার ইঙ্গিত আর রাষ্ট্রব্যবস্থাকে লোক-কল্যাণে নিযুক্ত করার সংকেত আছে।—নীরবে আহার সমাধা করে উঠলেন।

খাওয়াটা কোনো রকমে সেরে সেঁজুতি বেরিয়ে পড়লো সেলাই করা শাড়ীখানা পরে। যেতেই হবে, কথা দিয়েছে পারুলকে ; তাছাড়া ওর নিজের কথাও কিছু আছে। তমালকে রেখে গেল বাবার কাছে।

পারুল আর তার বর আগেই এসেছে। স্বাহা ওদের সঙ্গে কথা বলছিল। গণাধীশ এই কয়বছরে বেশ বড় হয়ে উঠেছে, পড়ছে, "অ-এ অজগর, আ-এ আম।"

—আয়ে আম হয়, আরাম হয়, আনন্দ হয়, আর কি হয় জানিস? সেঁজুতি শুধুলো।

—না—গণু ফ্যাল ফ্যাল করে চাইছে।

সেঁজুতি বললো—আন্দামানের ফেরৎ আমার ঠাকুরদাদা কৈ,
আমি যে তার পথের পানে নিত্যি চেয়ে রই।

মুখে মুখে ছড়া রচনা করে বলা সেঁজুতির বাতিক একটা। গণাধীশকে নিয়ে ও বসে গেল ওখানেই। স্বাহা জানে ওর স্বভাব, প্রায়ই কিছু বলে না, আজ বলল,—ঠাকুরদার কথা ও কিচ্ছু বুঝবে না; দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ নয় ও, প্রহ্লাদকুলে দৈত্য!

—তার মানে?—সেঁজুতি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো।

—মানে, ওটা এই বংশের কুলাঙ্গার হবে। এমন হ্যাংলা আর রাগী হয়েছে যে…

—ছিঃ বৌদি—ওর এখন ওসব বুঝবার বয়স হয় নি। আগুনের কণাতে আগুনই থাকে।

স্বাহা ওর কথাটা অগ্রাহ্য করে পারুলের বরকে বললো—আমি তো জানি না কি সাহায্য তিনি আপনাকে করতে পারবেন। শুধু আমি এইটুকু লিখে দিতে পারি যে আপনি আমাদের পারুলের বর—যদি সম্ভব হয় তো তিনি করবেন সাহায্য।

—তাহলেই হবে—পারুলের বর যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা দেখালো। স্বাহা এক টুকরো কাগজে লিখে দিল স্বামীকে, যে, পত্রবাহক পারুলের স্বামী, কি জানি কি সাহায্য ইনি প্রার্থনা করেন, যদি সম্ভব হয় তো সেটা করা উচিৎ। কাগজটুকু নিয়েই পারুলের বর বললো,—আমি আজই রওনা হব দিল্লী। খোকাকে তো দেখেই গেলাম, বাড়ীর অন্যান্য খবর যদি কিছু বলবার থাকে—

—বলবার খবর আর বিশেষ কিছু নেই। তিনি অনেকদিন আসেন নি। যদি একবার আসেন তো ভাল হয়—স্বাহা আস্তে বলল।

—যে আজ্ঞে, তাই বলব আমি। হেঁট হয়ে প্রণাম করল সে স্বাহাকে। স্বাহা একটু সরে দাঁড়ালো—থাক, হয়েছে।

অতঃপর পারুলকে সঙ্গে না নিয়েই সে বেরিয়ে গেল। পারুল রইল বসে ওখানেই। গণাধীশকে পড়াচ্ছে সেঁজুতি—দেখতে লাগল। কতকগুলো মিষ্টি পড়ে আছে ওখানে, গণাধীশের চোখ সেই দিকে। কিন্তু মার ভয়ে চুপচাপ আছে। মিষ্টিগুলো যে পারুলের আনা তা বুঝতে দেরী হোল না সেঁজুতির। বৌদি নিল তো! কিন্তু না নিলে উপায় নাই। সকালে যেকারণে সেঁজুতি সাবান নিয়েছিল, ঠিক সেই কারণেই এই খাবারগুলো বৌদিকে নিতে হয়েছে। এও একরকমের ঘুষ—কিম্বা উপহার। কাজ আদায় করবার জন্য উপহার দেওয়া ঘুষের পর্য্যায়ে পড়ে কি না, কে জানে?

—খাবারগুলো তুই নিয়ে যা পারুল, আজ আমি ওগুলো নিতে পারবো না—স্বাহা খুব মিষ্টি মোলায়েম কণ্ঠেই বললো—আজ ওগুলো নেওয়ার অর্থ ঘুষ নেওয়া।

—ছিঃ ছিঃ কি যে বলছেন বড়বৌদি?—পারুল ত্বরিতে বাধা দিল।

—বলছি ঠিকই। সংকর্ষণের কন্যা, রুদ্রাধীশের পুত্রবধূ এবস্তু ছুঁতে পারে না। যে নৈতিক পতন আজ সারা দেশে ঘটেছে, ঘটছে, সেই পঙ্ককুণ্ড থেকে আমি মুক্ত থাকবো, আর মুক্ত রাখবো অমোর রক্ত দিয়ে গড়া সন্তানকে। তুই হয়তো বুঝবি না এত কথা, কিন্তু রাগ বা দুঃখ করবার ব্যাপার নয় এটা—আমার আত্মাকে আমি কলঙ্কিত করতে পারি না—।

স্বাহা এবার যেন আদেশ করলো—এবার যখন আসবি, খালি হাতে আসিস,—নে, তুলে নে।

পারুল অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে, হয়তো, মনে মনে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে, খাবারের প্লেটখানা তুলে নিল। স্বাহা আবার বলল,—রাগ যদি করে থাকিস, সে তোর বুদ্ধি কম বলে। ওগুলো রেখে আবার আয়, আমি তোকে ছোট বোনের থেকে কম ভালোবাসবো না।

পারুল কথা না বলে চলে গেল। সেঁজুতি এতক্ষণে এসে প্রণাম করলো স্বাহাকে।

ইন্দ্রজিতের ঘুম ভাঙলো সকালে—একটু বেশী ঘুমিয়েছে। অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ তার অভ্যাস, হয়তো পথশ্রমের জন্য, হয়তো শয্যার সুকোমলত্বের জন্য, হয়তো মনের কিছুটা শান্তির জন্য ঘুম এত বেশী হয়েছে। লজ্জিত হোল ইন্দ্রজিত। উঠে মুখ হাত ধুয়ে চা খেল কৃষ্ণার কাছে—পরে বেরুল। সকালের ট্রামে ভীড় কম; ইন্দ্রজিত শিয়ালদার মোড়ে একখানা খবরের কাগজ কিনে ট্রামের গদি-মোড়া আসনে বসে পড়তে পড়তে আসতে লাগলো। নানা সমস্যা সঙ্কুল খবর—আমেরিকা ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন—ইন্দোনেশিয়া, যাভা সুমাত্রার যুদ্ধবিরতির প্রশ্ন, জার্ম্মানী-জাপানের যুদ্ধ বন্দীদের বিচার, চীনের কমিউনিষ্ট কার্য্য, এর সঙ্গে ভারতের হাজারো রকম সমস্যা। সবকে অতিক্রম করে রয়েছে সংবাদ, চালের অভাব আরো বেশ কিছু দিন চলবে, এবং কাপড় এখনো সুলভ হবার আশা নেই; বাস্তুহারাদের ব্যবস্থা হচ্ছে বটে কিন্তু বাস্তু ঘুঘুর দলের বিরাট লোভের গহবরে তলিয়ে যাচ্ছে সব স্কীম।

কাগজটা লেখে ভাল ; ইন্দ্রজিত দেখলো, মাত্র প্রথম বর্ষ, পঁয়ত্রিশ সংখ্যা,—অর্থাৎ পঁযত্রিশ দিন পূর্ব্বে মাত্র জন্মেছে। নাম 'বজ্রধারী'। বেশ নামটা। ছোট কাগজ, প্রায় সবটাই পড়ে ফেললো ইন্দ্রজিৎ, মায় বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত। 'সায়ন্তনীর' বিজ্ঞাপনটাও দেখলো, ; মোহিত চাটুজ্যে ডাইরেকটার। কোন মোহিত চাটুজ্যে ? কাবেরীর বাবা নয় তো ?

ট্রাম থেকে নেমে হাঁটা-পথটুকু পার হতে মাত্র তিন-চার মিনিট সময় লাগে। ইন্দ্রজিৎ আস্তে হাঁটছে! বাড়ীর কাছে এসে ওর যেন কেমন লজ্জাবোধ হচ্ছে। কোন্ সূত্র ধরে যাবে ও আজ ওবাড়ীতে? না যাওয়াই ভাল। এমন কোনো কাজ ওর নেই ওখানে, যা নিয়ে ও যেতে পারে আলাপ করতে! ফিরেই যাবে নাকি ইন্দ্রজিৎ দেখা না করে ?

ইন্দ্রজিৎ সত্যি ফিরলো,—কিন্তু এতখানা এসে দেখা না করেই চলে যাবে! নিতান্ত ছেলেমানুষী হবে সেটা। কিন্তু সবটাই তো ছেলে মানুষী! কি দরকার ছিল সুদূর দাক্ষিণাত্য থেকে এতদূর আসবার তার! কাবেরীকে সে ভালবাসে, তাতে কার কি ? হয়তো কাবেরী এতদিন অন্য কারো ঘরে সম্রাজ্ঞীর আসনে বসে আছে। থাক্, সে সুখে থাক—ইন্দ্রজিৎ যাবে না আর তার কাছে। ফিরলো ইন্দ্রজিৎ।

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল ; 'সায়ন্তনী' সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্য সে এসেছে, এই বলে তো অনায়াসে লজ্জার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। আবার মোহিতবাবুর বাড়ী-মুখো হোল ইন্দ্রজিৎ। নিজেই হেসে ফেললো ; মানুষকে ভালবাসার টান কোথায় নিয়ে যায়! কতরকম ফন্দী আঁটতে হয়! কিন্তু এই কি সেই ইন্দ্রজিৎ, যে ইন্দ্রজিৎ বজ্রের চেয়ে কঠিন ছিল—আপনার হাতে বোমায় আগুন লাগিয়ে বিয়াল্লিশের বিপ্লব জাগিয়েছিল—মোহিতবাবুর বিরাট কারখানাকে উৎসন্নে দিতে গিয়েছিল—এই কি সেই ইন্দ্রজিৎ!

হাঁা, সেই। মানুষের মনোজীবনের অনন্ত রহস্যের মধ্যে এইটাই হয়তো সব থেকে বড় রহস্য যে, সে নিজেই জানে না, তার মনের কোথায় কি আছে। কিন্তু যাক্—

ইন্দ্রজিৎ কাবেরীদের বাড়ীর কাছাকাছি মোড়টায় এল। বড় দেবদারু গাছটার আড়ালে বাড়ীর দক্ষিণ অংশটা দেখা যাচ্ছে। দোতালায় দাঁড়িয়ে কে ও? কাবেরীই; স্নান করে ভিজে চুল এলিয়ে দিয়েছে আর তাকিয়ে আছে দূর দূর দিগন্তের পানে। কী ও ভাবছে? ইন্দ্রজিৎ এতখানা তফাৎ থেকে ওর সীমন্তটা দেখতে চাইল, রক্তরাগ সেখানে আছে কি না। দেখা অসম্ভব, তথাপি ওর যেন মনে হোল সিঁথিতে সিন্দুর রয়েছে।

আর যাবে না ইন্দ্রজিৎ। কিন্তু কেন? ইন্দ্রজিৎ কি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠলো নাকি? ছিঃ! নিজেকে ধিক্কৃত করে সে এগিয়ে এসে ঢুকলো ফটকে। দারোয়ান রামব্রীজ চেনে ওকে; লম্বা সেলাম ঠুকে বললো,

—বহুৎ রোজ বাদ আয়া হুজুর, আচ্ছা হ্যায় তবিয়ৎ?

—হাঁা জি! চাটার্জী সাহাব ঘরমে হ্যায়?

—জি—আভি নীচুমে আ-বায়েঙ্গে!

ইন্দ্রজিৎ আর কোনো কথা না বলে সটান এসে ঢুকলো ড্রইংরুমে। কে একজন আগে থেকেই বসে আছে, সুন্দর কান্তি এক যুবক। বাঙালী কি পাঞ্জাবী ঠিক বোঝা যায় না। বাঙালীই হবে। ইন্দ্রজিৎকে দেখে একটু নড়ে চড়ে বসে বললে—কাকে চান?

—মিঃ চাটার্জীকে। আছেন তিনি?

—হাঁা, বসুন, আসবেন এখুনি।

কথাটা বলতে বলতেই মোহিতবাবুর পদধ্বনি শোনা গেল ওপাশের সিঁড়িতে! ভারী আওয়াজ দামী ইংলিশ জুতোর—ইন্দ্রজিৎ চেনে এই আওয়াজ। সে বসলো না, অপেক্ষা করতে লাগলো; আধ মিনিট পরেই মোহিতবাবু এসে বললেন,

—ইন্দ্রজিৎ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!—বলে এগিয়ে এলো। মিঃ চাটার্জী হ্যাণ্ডসেক করতে যাচ্ছিলেন, ইন্দ্রজিৎ হেঁট হয়ে প্রণাম করলো। খুসীই হলেন মিঃ চাটার্জি। বললেন,

—কত দূর থেকে আসছো? সন্ন্যাস ছেড়ে দিয়েছ তো?

—সন্ন্যাস তো নিই নি—হাসলো ইন্দ্রজিৎ—সংযম অভ্যাস করছিলাম। কিন্তু আজকালকার দিনে সংযত থাকার মত কঠিন কাজ আর নেই!

—কিসে বুঝলে? মিঃ চাটার্জী ওকে বসিয়ে নিজেও বসলেন সোফায়। ওদিকে সেই যুবকটিও ভাল হয়ে বসলো। মিঃ চাটার্জি বেয়ারাটাকে ডেকে চা আনতে বললেন এবং কাবেরীর মাকে জানাতে বললেন যে ইন্দ্রজিৎ এসেছে। বেয়ারা চলে গেল।

ইন্দ্রজিৎ বললো—সারা পৃথিবী জুড়ে অসংযমের বান ডেকেছে,—স্কুলের ছেলে থেকে আরম্ভ করে বিরাট ব্যক্তিত্বশালী মহানায়কগণ পর্য্যন্ত অসংযমকেই আয়ত্ত করছেন ভাল করে। মানুষের আত্মাকে হত্যা করার যুগ এটা—এ যুগ আত্মহত্যার যুগ!

—তোমার কথার যুক্তি কি ইন্দ্রজিৎ? মিঃ চাটার্জি হেসে শুধুলেন!

—যুক্তি দিয়ে তো এ সব বলা যায় না; এগুলো সত্য, তাই অনুভূতিগম্য। তবু যুক্তি দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু অত কথা শোনবার কি আপনার সময় হবে?

—না, একটু বেরুবো ! তুমি এসে উঠেছ কোথায় ? জিনিষপত্র কৈ ?

—উঠেছি উৎপলা দেবীর আশ্রমে। আমি কালই চলে যাব আবার ; হয়তো আজই চলে যেতে পারি। ইন্দ্রজিৎ একটু হাসলো, পরে বললো, —এই যে সায়ন্তনী গ্রাম, এতে আপনার নাম দেখলাম। ব্যাপারটা কি, জানতে পারি ? আমার কোনো আত্মীয়ের জন্য একটুখানি জমি দরকার।

—তা বেশ তো। ওটা আমরাই করছি। নতুন ধরণের নগর পত্তন করা হবে, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয় থাকবে তাতে ; অবশ্য প্রাচ্যভাবটাই বেশি রাখবো আমরা—কতটা জমি চাই তোমার ?

—কমের দিকে যতখানি দেওয়া চলে। আমার আত্মীয়টি ধনী নন, অভিজাতও নন তবে বাস্তুহারা এবং হৃতসর্ব্বস্ব। এই দুটি মাত্র গুণে কি যায়গা পাওয়া যেতে পারে ?

—তাহলে দান করতে হয়—ওপাশের যুবকটি বললে হেসে।

—ভূমিদান খুবই গৌরবের বস্তু ছিল এদেশে কিন্তু আমি দান হিসেবে চাইছি না। কম দামেও চাইছি না, টাকার পরিমাণটা জানতে পারলে বলতে পারি, আমাদের নেওয়া সুবিধে হবে কি না। আমার বন্ধুটির হাতে একখানি পাণ্ডুলিপি আছে, ভারতের সত্য ইতিহাস। সেটি বিক্রী করে যা পাওয়া যাবে, তাই ওঁর সম্বল।

—আপনি এনেছেন বইখানা ? কাবেরী অকস্মাৎ এসে প্রণাম করলো প্রশ্নের সঙ্গে। ও নিশ্চয় অনেক আগে থেকে আড়ালে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল। ইন্দ্রজিৎ আস্তে উচ্চারণ করলো—জয়তু দেবি।

—ইতিহাস তো সত্যই,—'ভারতের সত্য ইতিহাসটা' কিরকম ?—যুবক প্রশ্ন করলো।

—যে সত্য গোপন আছে, তাকে লোকচক্ষে ধরার প্রচেষ্টা। সত্য শব্দটার অর্থ এখানে একটু ব্যাপক—সত্য চিরদিনই সত্য থাকে, কিন্তু তাকে আবিষ্কার করতে আমাদের সময় লাগে। আগুন দিয়ে রান্না করা যায় এই সত্য আবিষ্কার করতে মানুষের বহুদিন সময় লেগেছিল,—ইন্দ্রজিৎ বলল।

ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হয় নি ইন্দ্রজিতের। মোহিতবাবু বললেন—তোমাদের পরস্পর কি পরিচয় হয়েছে? না—এই ইন্দ্রজিৎ আমার ছেলের মতই ছিল এখানে, হঠাৎ খেয়ালবশে সন্ন্যাস নিতে গেল। ওর নাম অজিত সিংহ—অমর সিংজীকে জানতে তো, তাঁরই ছেলে!

পরস্পর নমস্কার আদান প্রদান করলো ওরা। কিন্তু অজিত শুনেছে ইন্দ্রজিতের নাম ফটোগ্রাফারের কাছে এবং মোহিতবাবুর কাছেও। নামটা এখানে মোহিতবাবুর মুখে শুনেই ও বুঝে নিয়েছিল, কে এসেছে দেখা করতে এবং এ বাড়ীর সঙ্গে তার সম্পর্ক কতখানি।

—কৈ, ইতিহাসটা দেখান?—কাবেরী বললো!

—সঙ্গে তো আনি নি,—যাঁর লেখা তিনি এখন প্রকাশকের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন।

—আমাদের একটা পুস্তকবিভাগ আছে, জানেন বোধ হয়। সেখানে যদি ছাপা হয়তো দেখা যাক্—ওদের অবশ্য সিলেকশন বোর্ড আছে, তবে বাবা প্রেসিডেন্ট!

—বইখানা ছাপার অযোগ্য হলে আমি নিতে বলবো না।

—যোগ্যাযোগ্যের বিচারভার এখন আমাদের কমিটির হাতে। বইটা কখন আনতে পারবেন?—কাবেরীর যেন আর সবুর সইছে না।

—দেখি, কাল সকাল নাগাদ তাঁকে পাঠিয়ে দিতে পারবো বোধ হয়।

—পাঠিয়ে না দিয়ে সঙ্গে আনলেই তো আরো ভাল হয়!—কাবেরী আমন্ত্রণ করছে যেন।

—ঠিক বলা যায় না, কাল হয়তো আমি না থাকতে পারি কলকাতায়।

অভিমানিনী কাবেরী আর কিছু না বলে অতিথিদের চা পরিবেশন করার কাজে আত্মনিয়োগ করলো। মিঃ চাটার্জী বললেন—কোথায় কোথায় ঘুরলে তোমরা? আফ্রিকা, ইষ্ট-ইণ্ডিজ, আর কোথায়?

—ঘুরলাম অনেক, বিশেষ আশার আলো কোথাও পাওয়া গেল না। ভারতেই নানা বিড়ম্বনা লেগে রয়েছে। নিজেদের দুর্ব্বল নীতি যতক্ষণ না যাবে ততক্ষণ কোনোকিছু করা সম্ভব নয়···ইন্দ্রজিৎ নিরাশকণ্ঠে জানালো।

—সে কিহে? ভারত আজ স্বাধীন···

—হলে কি হবে? শুধু কথায় কিছু হয় না। আফ্রিকায় কালা-ধলায় বিবাদের কিছু তবু মানে হয়, কিন্তু ওখানকার সরকারের "ডিভাইড এণ্ড রুল" পলিসিতে কালায়-কালারও ঝগড়া বাধে—আফ্রিকানদের সঙ্গে ইণ্ডিয়ানদের মনের মিল হতে দেন না তাঁরা! ইষ্ট-ইণ্ডিজের ব্যাপার আরো ঘোরালো। শাসকজাতি কোন সময়ই চান না যে শাসিত জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত হয়ে তাকে উৎখাত করুক।—মানুষের লোভপ্রবৃত্তি সেই আদিম যুগে যেমন ছিল তেমনিই আছে আজও।

কাবেরী চা ঢালতে ঢালতে ইন্দ্রজিতের মুখপানে তাকালো একবার, বলল,—মানুষের লোভ আর স্বার্থপরতা তার পশু স্বভাব, তার মানব-স্বভাবটা জাগান আপনারা।

—জাগাব কি করে? যে দরদী দৃষ্টি দিয়ে মানুষ মানুষকে দেখবে তার অভাব হচ্ছে। বর্ত্তমান পৃথিবীতে তারই অভাবটা সব থেকে

বেশি। এক বনের বাঘ আরেক বনে গিয়ে হয়তো স্বজাতির সঙ্গে মিলেমিশে বেশ থাকতে পারে—এক বর্ণের মানুষ, এমন কি এক প্রদেশের মানুষ অপর প্রদেশে এসেই ঝগড়া বাধাবে। মানুষের এই স্বভাবটার মূলে রয়েছে তার আত্মাভিমান। একদেশের মানুষ অপর দেশের মানুষকে শুধু মানুষ হিসেবে দেখতে পারে না—তাকে জয় করে পদানত না করা পর্য্যন্ত তার স্বস্তি নেই। আদিম যুগের দাসত্ব-প্রথা, স্বৈরশাসন থেকে আজকার ধনতন্ত্র বা গণতন্ত্র, সর্ব্বত্রই এই ব্যাপার। মানুষের প্রভুত্বস্পৃহা আকাশচুম্বী, না, তারও বেশী—হয়তো তুলনারহিত!

—আপনাদের মিশনটা কি? অজিত প্রশ্ন করলো। ও বুঝতে পারছিল না, কি বিষয়ে কথা হচ্ছে এদের। অবশ্য আন্দাজ করে নিয়েছিল কতকটা। ইন্দ্রজিৎ বলল—মিশন আর কিছু নয়, মানুষ শুধু মানুষ হোক, মানুষের দরদী দৃষ্টি দিয়ে সে দুনিয়াটাকে দেখুক—; সকল মানুষের দুঃখদৈন্যের অবসান কামনা করুক।

—গুড্ আইডিয়া! এ মিশনে সকলেই যোগদান করবে।

—মুখে—কাজে কম লোকই যোগদান করে। ধনকুবের আমেরিকা থেকে জনকুবের ভারত পর্য্যন্ত চেয়ে দেখুন, কি নিদারুণ অসামঞ্জস্য মানুষে মানুষে। ভারতের কথাই ধরা যাক—নবলব্ধ স্বাধীনতার ছায়ায় নব নব ধনিক গড়ে উঠলো অনেকগুলি,—কিন্তু মধ্যবিত্ত রসাতলে যাচ্ছে। শ্রমিক এখনো টিকে আছে নিত্য নূতন দাবীর কৌশলে কিন্তু ধনিক তাকে ফাঁকি দেবার কম কৌশল করছে না। একদিকে কাপড় জমে যাওয়ায় মিল বন্ধ করা হচ্ছে, অন্যদিকে বস্ত্রহীন মধ্যবিত্ত! বস্ত্র তাদেরই লাগে বেশি, যারা শিক্ষিত, যারা সভ্য, যারা ভদ্রজীবন যাপন করতে চায়; তারা পায় না। যাদের প্রচুর আছে, তারা অনাবশ্যক জমিয়ে নিচ্ছে।

ঘুষ, চুরি আর মুনাফাবাজীতে আচ্ছন্ন দেশ—অখাদ্য কুখাদ্যকে আর সমালোচকের চোখে দেখা চলে না, যা পাওয়া যায় তাই নিতে হবে। মানুষ হন্যে কুকুরের মত ঘুরছে অন্নের আর বস্ত্রের সন্ধানে—কে কাকে দেখে! শুধু বক্তৃতা আর পরিকল্পনা আর আশ্বাসবাণীতে মানুষ বাঁচে না—তাকে বাঁচাতে হলে যে দরদী দৃষ্টি, যে সবল শাসননীতি পরিচালন করতে হয়, যে নিরপেক্ষ ভাবের ভাবুক হতে হয়—তাতো দেখতে পাচ্ছি না কোথাও! আপনার ভাণ্ডার পূরণ, আপনার আত্মীয় তোষণ, আপনার প্রদেশপুষ্টিই চলছে। এই বাংলার অবস্থাটা দেখলেই আমার কথাটার সত্যতা বোঝা যাবে।

—হবে, হয়ে যাবে; আমাদের নেতারা সকলেই ভাবছেন এসব নিয়ে।

—ভাবুন! তাঁরা ভাবতেই থাকুন। এত কষ্টে অর্জিত স্বাধীনতার ফলে যে কয়েকজন আজ ভাববার অধিকার পেয়েছেন, তাঁরা নিঃসন্দেহ ভাবুক, ভাববিলাসী—জানি আমি।

ইন্দ্রজিৎ চা শেষ করলো। কাবেরী মৃদু হেসে বলল—বড্ডো কঠোর সমালোচনা।

—যে দুঃখের দহন আজ জ্বলছে আমার বুকে, তাতে কঠোরতম হওয়া উচিৎ, কিন্তু হয়ে কি হবে! পশুত্বকে অতিক্রম করতে অনেক দেরী আছে মানুষের!

—অতিক্রম কি করবে কোনো দিন? কাবেরী শুধুলো।

—হ্যাঁ, করবে। মানবাত্মা অগ্নিধর্মী! জল, ঝড়, বর্ষা বাদলে সেই আগুন নিবু নিবু হয়, কিন্তু আবার জ্বলে। যুগে যুগে জ্বলেছে এই মানুষের মধ্যেই।

—কতবার তো তেমন হোল, কিন্তু মানুষের স্বরূপ বদলাচ্ছে কৈ?

—স্বরূপ ওটা নয়, ওটা আরোপ করা গুণ—ইন্দ্রজিৎ বলে বসলো, মানুষের মধ্যে বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা আদিম যুগের—প্রভুত্বস্পৃহা এতো পুরোনো হয়ে গেছে তার বৃত্তিতে যে বহু দিনের মরচেধরা তরোয়ালের মত তাকে সাফ্ করা কঠিন। কিন্তু এইখানেই পশুতে আর মানুষে তফাৎ। পশুরা পৃথিবীর জ্যেষ্ঠ সন্তান, কিন্তু প্রকৃতির বশে নিজেকে পরিবর্ত্তিত করে এলো যুগের পর যুগ ধরে—শীত পড়লে তারা গায়ে লোম গজিয়ে নিল—না হয় মরলো; গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে তারা হোল তদুপযুক্ত দেহের অধিকারী—এই ভাবে তারা নিজেকেই বদলেছে, কিন্তু মানুষ তার প্রতিভাবলে নিজেকে বদলালো না, প্রকৃতির কাছ থেকে গাত্র বস্ত্র আদায় করলো বৃক্ষের বল্কলে বা পাখীর পালকে, অথবা পশুর লোমে। বৃষ্টিতে পশুরা গুহা খুঁজে মরলো, নয় জল-জন্তুর কাছাকাছি রূপ নিল কিন্তু মানুষ ঘর বাঁধলো বৃষ্টিকে জয় করবার জন্য। মানুষ প্রকৃতিকে জয় করার সাধনা করতে করতে প্রভুত্বস্পৃহাকে আয়ত্ত করেছে; নিজের আরামের জন্য, আনন্দের জন্য, অক্ষুণ্ণ প্রতাপ রাখবার জন্য যতখানি নিষ্ঠুর হওয়া দরকার, সে তা করতে কোথাও থামে নি।—কিন্তু এসব ইতিহাস, পুরাতত্ত্বের কাহিনী!

ইন্দ্রজিৎ হঠাৎ থেমে গেল। ব্যাপার কি, জানবার জন্য কাবেরী দেখলো অজিতের মুখপানে চেয়ে, সে প্ল্যানখানা খুলে কি যেন দেখছে নিবিষ্ট হয়ে। ওর মনোযোগ ঐদিকেই; অর্থাৎ ইন্দ্রজিতের কথাগুলো কিছুমাত্র মূল্য পায়নি ওর কাছে। অথচ ইন্দ্রজিত খুব অসত্য কথা কিছু বলছিল না। কাবেরী বলল,

—এই স্পৃহা তাকে তাহলে উন্নতই করেছে?

—এই উন্নতির মূলে রয়েছে কলঙ্ক! মানুষ তাকে সার্ব্বজনীন করে নি—তাকে সকলের সমভোগ্য করে নি—তাকে নিজস্ব করে নিজের

জীবনে, নিজের জাতির জীবনেই প্রয়োগ করেছে। এই আত্মপরায়ণতা মানবোচিত নয়। শীতার্ত্ত পশু তার নিজের গায়ে লোম গজিয়ে নিয়ে নিজেকে রক্ষা করে, অপরকে সে লোম দেওয়া যায় না—কিন্তু মানুষ সেই পশু-লোম থেকে যে শীত বস্ত্র তৈরী করলো, তাকে সকলের মধ্যে বণ্টন করে দিতে করলো কার্পণ্য, যদি বা দিল কিছু, তো তার মূল্য স্বরূপ হয়তো আদায় করে নিল অনেক বেশি আরামের বস্তু, হয়তো অপর জাতিকে দাসানুদাস করে রাখলো। এই পন্থাটাই যুগে যুগে নতুন আকার নিয়ে দেখা দিচ্ছে মানব সমাজে। ধনতন্ত্র বা গণতন্ত্র বা ফ্যাসি-তন্ত্র যাই বলুন—কোথাও রেহাই নেই।

—রেহাই কি করে পাওয়া যাবে? কাবেরীর কণ্ঠে ঈষৎ বিদ্রূপের ঝাঁজ!

—অধ্যাত্ম তন্ত্র—কথাটা পরিষ্কার করা উচিত।

—করুন পরিষ্কার—কাবেরী কাছিয়ে এলো একটু, চেয়ারে বসলো।

—ভারতের এই নিজস্ব বিজ্ঞান মানুষকে দান করতে হবে। হয়তো আজকার মানুষ শুনবে না, শুনতে চাইবে না—কিন্তু এমন দিন নিশ্চয় আসবে যখন সে এর জন্য লালায়িত হয়ে উঠবে। পৃথিবীর সকল মানুষের আজ এক বিশ্ববিদ্যালয়ে মিলিত হতে কোনো বাধা নেই, অথচ মিলন হচ্ছে না।

—তার মূলে রয়েছে ঐ আত্মপরায়ণতা! কাবেরী হেসে বলল,—কিন্তু অধ্যাত্ম-তন্ত্রটা কি বস্তু?

—ভূতে ভূতে ভগবানকে দেখতে বলছি না, সর্ব্বভূতে সম দর্শনটা বড় বেশী কিছু নয়। মানুষের মধ্যে যে সদবৃত্তি রয়েছে, দয়া-ক্ষমা-মৈত্রী-করুণা, তার যথাযথ প্রয়োগ, অধীত বিদ্যাকে অর্পণ—অধিকৃত ক্ষমতাকে

বিশ্বের কল্যাণের পথে নিয়োগ—আপনার ঐহিক সুখকে একটু কম করে অপরের জন্য কিছু সুযোগ করে দেওয়া—এক কথায়, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, যে ভালবাসা অকৃত্রিম।

—এ সব খুবই পুরোনো কথা—নীতি কথা আজ আর কেউ শোনে না—অজিত বলল।

বেশ বোঝা গেল, প্ল্যানের দিকে চোখ দিয়ে থাকলেও ইন্দ্রজিতের কথাগুলো সে নিবিষ্ট হয়েই শুনছে। কাবেরী ঈষৎ হাসলো ওকে কথা বলতে দেখে। তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে,—ইন্দ্রজিতের কথাগুলো অগ্রাহ্য করবার ভান করে অজিত প্ল্যানে চোখ ডুবিয়েছিল—ইন্দ্র-জিতের এই তুচ্ছ অসম্মানটুকুও সহ্য করতে পারলো না কাবেরী—তাই তার কাছাকাছি বসে কথাটা চালাতেই লাগলো এবং প্রমাণ করে দিল যে, ইন্দ্রজিত যা বলছে তা শুনবার আগ্রহ আর কারো না থাকলেও কাবেরীর আছে। মোহিতবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েকে লক্ষ্য করছিলেন। সুশিক্ষিতা আধুনিকা ক্ষুরধার-বুদ্ধিশালিনী মেয়ে তাঁর। পিতার গর্ব্ব এবং গৌরব সে অক্ষুণ্ণ রাখবে, এ বিশ্বাস তাঁর আছে—তথাপি মোহিতবাবু জানতেন না যে, মেয়ের মনের গতি এতো সূক্ষ্ম। অজিত বলল যে, 'কথাগুলো পুরোনো'। ওর জের টেনে কাবেরী বলল,

—মানুষ জানোয়ারটাও অত্যন্ত পুরোনো ;—নতুন হতে হলে তার সব কিছু বদলে হয় বন মানুষ, নয় অতিমানুষ হতে হয়। নীতিকথা আজকার মানুষ শোনে না বলে, নীতিটা মিথ্যা প্রমাণিত হয় নাই—সত্যকে সত্য বলে স্বীকার না করার মধ্যে মূঢ়তাই আছে, মহত্ব কিছুমাত্র নেই।

সমর্থনটা অতিরিক্ত ভাষা পেল কাবেরীর কণ্ঠে। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ ভাব-লেশহীন হয়েই এই সংঘাত সহ্য করছে। ও জানে না, অজিতের

ঐ ক্ষুদ্র কথাটুকুকে কেন কাবেরী এত প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণ করে দিল।—অজিত কি ওর বর, তার সঙ্গে কি ঝগড়া হয়েছে কাবেরীর?—না, অজিত কি করে বর হবে? ইন্দ্রজিৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল কাবেরীর সীমন্তের পানে—শুভ্র সুন্দর স্নানপূতঃ রেখাটি ঋজু হয়ে রয়েছে আকাশের ছায়াপথের মত কালো চুলের পটভূমিতে।

—নীতিবাক্য এগুলো নয়,—মানুষের মনের যে বৃত্তি সহজাত, তার কতকগুলো ভালো, কতকগুলো আমাদের বিবেকের পরিপন্থী—আস্তে বললেন মিঃ চাটার্জি, বিবাদটা হয়তো থামিয়ে দিতে চান উনি; তাই আবার বললেন—প্রতি মানুষের মধ্যে রয়েছে মহৎ হবার আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু বড় হবার আকাঙ্ক্ষাটা মহত্ত্বের আকাঙ্ক্ষাকে ছাড়িয়ে উঠতে চায়—আমাদের উচিৎ এই বড়ত্ব আর মহত্ত্বকে একত্রীভূত করা। অশোক এবং আকবর বড় ছিলেন এবং মহৎও ছিলেন,—শুধু বড় হয়ে বেশি দিন টেঁকা যায় না, পতন অনিবার্য্য হয় তার। মহৎ হতে পারলে সে হয় মৃত্যুঞ্জয়···

—থাক বাবা, ইস্কুলের পড়ার মত লাগছে—কাবেরী হেসে দিল হঠাৎ। এবং সকলেই হেসে উঠলো, মোহিতবাবুও। ব্যাপারটার লঘু সমাপ্তি হচ্ছে দেখে ইন্দ্রজিৎ আশ্বস্ত হয়ে বলল—কত টাকা হলে কম পক্ষে কিছু জমি হতে পারে?

—তোমার সেই ঐতিহাসিক বন্ধুটিকে আনো, দেখি কি করতে পারা যায়। বইখানা কত বড়, কি রকম দাম হতে পারে দেখি।

—বড় বই, ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা থেকে আরম্ভ করে আজকার ভাঙনের দুর্ভাগ্য পর্য্যন্ত তিনি লিখেছেন ইতিহাস; আট দশ টাকা দাম হবে।

—বেশ, দেখা যাক, তাঁকে কতটাকা দেওয়া যেতে পারে এবং তাতে কতটা জমি হওয়া সম্ভব।

—আপনি কাল তাকে সঙ্গে করে আনবেন।—কাবেরী অনুরোধ করলো আবার।

ভেতর থেকে ডাক এল ইন্দ্রজিতের—মা ডাকছেন। উনি পূজায় বসেছিলেন বলে এত দেরী হোল ডাক আসতে। ইন্দ্রজিৎ উঠে গেল, সঙ্গে গেল কাবেরী। দোতলায় উঠতে উঠতে বললো,

—বইটা কি আপনারই লেখা নাকি?

—না, তাহলে তো তখুনি বলতাম। আমার এক সন্ন্যাসী বন্ধুর।

—সন্ন্যাসী, তো বাড়ী নিয়ে কি করবেন তিনি?

—তাঁর পরিবারবর্গ আছেন, মা বোন, ছোটভাই এবং ভ্রাতৃজায়া।

—ওঃ, চলুন।

চমৎকার ঘরখানি পূজার। সমস্ত মেঝেটা সাদা মার্ব্বেল দিয়ে বাঁধানো, মার্ব্বেলের বেদী, তার উপর সিংহাসনে দেবমূর্ত্তি, আশে পাশে পূজার সরঞ্জাম। মহীশূরের কারুকার্য্য করা ধূপদান থেকে চন্দনের সুরভিত ধূপগন্ধ ঘরটাকে আমোদিত করে রেখেছে, তার সঙ্গে ফুলের গন্ধ। এমন একটা পবিত্রতা বিছিয়ে রয়েছে ঘরে যে, ঢুকবার আগে ভেবে দেখতে হয় অশুচি আছি কি না। মা দাঁড়িয়ে আছেন ইন্দ্রজিতকে অভ্যর্থনা করবার জন্য, আশীর্ব্বাদ করবার জন্য বললেই ভাল হয়। ইন্দ্রজিৎ পায়ের জুতো খুলে ঘরে ঢুকে আগে দেবমূর্তিকে পরে মাকে প্রণাম করলো। তিনি বললেন,

—এসো, সংকল্প সিদ্ধ হোক।

বাংলার সাধারণ মায়ের মুখে এরকম আশীর্ব্বাদ বেরোয় না। কিন্তু কাবেরীর মা খুব সাধারণ নন, জানে কাবেরী, তাই হেসে বলে উঠলো,

—সংকল্প ওর ছিল ভারতের স্বাধীনতা লাভ, সে তো সিদ্ধ হয়েছে মা…

—সিদ্ধ হয়েছে কি না, ঠাকুর জানেন; না যদি হয়ে থাকে তো হোক।

—হয় নি মা—ইন্দ্রজিৎ বললো—ভারতের তথাকথিত স্বাধীনতালাভ আমার সংকল্প নয়, আমার সংকল্প মানুষের স্বাধীনতা লাভ, মানুষের মুক্তি, নিপীড়িত মানবতার উদ্ধার, মনুষ্যত্বের উদ্বোধন—তার কিছুই হয় নি; আশীর্ব্বাদ ঠিকই করেছেন আপনি।

—ওরে বাবা, নিপীড়িত মানবতা, মনুষ্যত্বের উদ্বোধন—এতো বড় বড় কথা!

কাবেরী নিতান্ত ছেলেমানুষের মত হেসে উঠলো। ওর মনে যে একটা উচ্ছল আনন্দতরঙ্গ খেলা করে চলেছে, এই হাসি তার প্রকাশ। আনন্দ তো হবেই; কত দীর্ঘ দিন পরে সে তার প্রিয়তমকে পেয়েছে, এমনটা তো হবারই কথা। এখন কোনো রকমে দু'হাত এক করতে পারলে হয়। মার মনে আশা জেগে উঠলো উজ্জ্বল হয়ে। হেসে বললেন,

—কথাগুলো খুবই ভালো!

—কাজে যদি হয় ওর কিছুটাও—কাবেরী বললো আবার।

—ভালো কথা শোনাও ভাল। বসো বাবা, আমি কিছু খাবার আনি।

মা বেরিয়ে গেলেন। ইন্দ্রজিৎ একটা কম্বলের আসনে বসে পড়লো।

—ধ্যান করবেন নাকি?—কাবেরীর কণ্ঠে বিদ্রূপ।

—কোনো নিরাকারের ধ্যান তো আমি করি না—আমার ঈশ্বর দেশ আর মানুষ—তারা দুটোই সাকার!—হাসলো ইন্দ্রজিৎ!

—ভালো—তবে মানুষটা মেয়েমানুষ না হয়!—চলে গেল কাবেরী প্রায় ছুটেই।

ইন্দ্রজিৎ ওর যাওয়াটা দেখলো, ওর কথাটাকে চুলচেরা ভাগে বিশ্লেষণ করতে চাইল; না—কিছুই বোঝা গেল না। চিররহস্যময়ী কাবেরী—! নদীর মতই ওর প্রবাহ—কখনো অন্তঃশীলা—কখনো বা উচ্ছ্বাসময়ী।

মা কিছু খাবার আর জল আনলেন। ইন্দ্রজিৎ আস্তে বলল,

—চা খেয়েছি আমি নীচে একবার—আবার খাবো?

—হ্যাঁ—দুপুরেও খাবে। অনেক তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার!

—আমার সঙ্গে? বিস্মিত ইন্দ্রজিতের বিস্ময়টা কাটতে দেরী হোল না। মা খুলেই বলে ফেললেন—এমন দড়িছেঁড়া হয়ে বেড়ালে ঘুড়ি ওড়ে না বাবা, বুঝলে—কোথাও বাঁধন না থাকলে উর্দ্ধপানে ওঠা খুবই কঠিন।

—বাঁধনটা ঐ মানুষের সঙ্গে রয়েছে মা...

—ওটা অপ্রত্যক্ষ—মা বললেন—মানুষের জীবনে বন্ধনের বড়ো দরকার ইন্দ্রজিৎ; ছন্নছাড়া হয়ে কাজ করতে গেলে সবই অগোছালো হয়ে যায়। তুমি তো আর নাক টিপে হঠযোগ করতে চাও না। সমাজের দুর্ভাগা মানুষের দুঃখ দূর করাই যদি তোমার ইচ্ছা, মানুষকে মানুষ বলে চেনাবার কাজই যদি তোমার মিশন হয়, তবে মানুষের সমাজ ছেড়ে যাওয়া চলে না...।

—কথাটা খুবই খাঁটি মা, কিন্তু আমার স্বপ্নকে বাস্তব-রূপ দিতে যে সাধনা দরকার, তাতে অন্যকে জড়াতে ভয় করে—মানুষের ভোগ-ভীরু মন! কে জানে কখন তারও মনে জাগবে ভোগের আকাঙ্ক্ষা···বিলাসের মোহ—আভিজাত্যের গর্ব্ব!

—সেটা তোমার মনেও যে-কোন সময় জাগতে পারে—মা বললেন, বৈরাগ্যকে কখনো স্বাভাবিক ভেবো না বাবা,—সংসারবিমুখ যে

বিরাগী মন, তা অনুরাগী হতে, এমন কি আসক্ত হয়ে পড়তেও পারে; তাই ঋষিরা বলেছেন, সংসারকে ভয় করে বনে পালিও না—ওর থেকে নিস্তার পেতে হলে ওকে সঙ্গে নাও,—ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে ধর্ম্মাচরণ করা যায় না।

—কথাটা বুঝলাম না মা।

—মনের ধর্ম্ম 'ভোগপ্রবণতা'—আত্মার ধর্ম্ম 'উর্দ্ধগতি' কিন্তু মনকে বাদ দিয়ে তো আত্মার উন্নতি করা যায় না। মানসিক পুষ্টি হলে তবে পারবে আত্মাকে উন্নত করতে। ক্ষুধিত মন নিয়ে যার তপস্যা—তার তপোভঙ্গ হওয়া স্বাভাবিক !

ইন্দ্রজিৎ খেয়ে চললো চুপচাপ। কিছুক্ষণ পরে মা বললেন,

—হয়তো ভাবছো, আমি আমার দিক টেনে কথা বলছি—তা নয়! তোমার মা থাকলে এই কথাই বলতেন। যে কাজ তুমি করতে চাও তা বনে গিয়ে করবার নয়—

—আচ্ছা মা, আমি ভেবে দেখবো আপনার কথাগুলো। বলে ইন্দ্রজিৎ হাত ধুলো।

কিন্তু মা ওকে ছাড়লেন না; দুপুরেও খেয়ে যেতে হবে, বললেন।

অগত্যা ইন্দ্রজিত ফোন করে দিল কৃষ্ণাকে, সে এ বেলা যাবে না।

মীরাটের কয়েকজন বাঙালী ভদ্রলোক একটি পাঠাগার স্থাপন করেছেন। নতুন একখানা বই এসেছে সেই পাঠাগারে—নাম 'গণচেতনা'। বইখানা নাকি বেশ সাড়া তুলেছে দেশে—ওঁরাও বইটা পড়ে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত বোধ করলেন। লেখক নবাগত নন; বাঙলা সাহিত্যে ইতিমধ্যে তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। নাম লোকাধীশ।

এই দুঃখবাদী লেখকের রচনায় প্রাচীনত্বের প্রতি একটা জ্বালাময় মমত্ববোধ আর নূতনত্বের প্রতি একটা নির্লিপ্ত আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। নূতন আসুক, বাধা তাকে দেওয়া যায় না, কিন্তু নূতন হলেই যে ভাল এবং গ্রহণীয় হবে তা বলা যায় না—এই ওঁর মত।

এঁরা অকস্মাৎ জানতে পারলেন যে লেখক লোকাধীশ দিল্লীতে এসেছেন। উৎসাহী কয়েকজন যুবক-যুবতী ওকে এনে ওদের পাঠাগারে কিছু বলাবেন, এই উদ্দেশ্যে দিল্লী গিয়ে উপস্থিত হলেন। লোকাধীশ আছে তার দাদার বাসায়। বর্ত্তমান রাষ্ট্রতন্ত্রে দাদা একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। বিরাট প্রাসাদোপম বাড়ীতে থাকেন ঠাকুর চাকর নিয়ে। স্ত্রী-পুত্রকে আনা সম্ভব হয়নি, কারণ বাড়ীতে বৃদ্ধা মা আছেন; তিনি ভিটে ছেড়ে কোথাও আসতে চান না।

রণাধীশ আজ প্রায় দুবছর হোল দিল্লীতে রয়েছেন, ভালই আছেন। বর্ত্তমানে কথা উঠেছে যে তাঁকে উচ্চতর পদ দিয়ে ভারতের বাইরে পাঠানো হবে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় নিজের এবং পরিবার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য করবার পরামর্শের জন্য উনি ভাইকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সুদূর বোম্বাই থেকে লোকাধীশ উড়ে এসে পৌছেছে মাত্র কাল সন্ধ্যায়। এরা সব গিয়ে শুনলেন, লেখক লোকাধীশ এখনো উঠে নি শয্যা থেকে। কবি-লেখকদের ঘুম হয়তো দেরীতে ভাঙে, ওঁরা ভাবতে লাগলেন। যথেষ্ট হৃদ্যতার সঙ্গে গৃহীত হলেন ওঁরা, কিন্তু অনেকক্ষণ বসে থাকতে হোল।

প্রায় দু'ঘণ্টা পরে এলো লোকাধীশ—অভিবাদন করে বলল,

—ভোরে উঠে আমি ঘণ্টা দুই বাণীর পূজা করি; কিছু মনে করবেন না, আপনারা হয়তো ভাবছেন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম—না, ভোরেই উঠি আমি।

—নমস্কার! আপনার নতুন বইটা পড়ে আমরা যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছি। যে কদিন থাকবেন এখানে তার মধ্যে একদিন সময় করে আমাদের ওখানে যেতে হবে। কবে আপনার সময় হবে, বলুন!

—তা বেশ তো, যাব; কিন্তু দাদার সঙ্গে এখনো কথাবার্তা হয় নি আমার; দেখি তিনি কি বলেন, কবে যাবেন ভারতের বাইরে; সেই অনুযায়ী আমার এখানে থাকা বা যাওয়া ঠিক হবে। তবে আমার ইচ্ছে আছে দিল্লীর প্রাচীন গৌরবের যতটা পারি দেখব—ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনাপুর তো দেখবোই, কুরুক্ষেত্র, দ্বৈপায়নহ্রদ ইত্যাদি দেখবারও ইচ্ছে আছে আমার। মীরাটের ওদিকে গেলে কি কি দেখতে পাওয়া যাবে, বলুনতো।

—যা কিছু সবই দেখাবো আপনাকে। দুএকদিন যদি থাকেন তো সমস্তই দেখানো যেতে পারবে। তবে প্রাচীন কীর্ত্তির অবশেষ বিশেষ নেই—যা আছে তাকে শুধু স্মৃতি বা শ্রুতি বলাই সঙ্গত। অবশ্য মোগল আমলের কীর্ত্তি সব রয়েছে আজো! আর্য্য যুগের বা ক্ষাত্রযুগের নিদর্শন নামে মাত্র আছে!

—তা হোক—নাম থাকলেই যথেষ্ট। মহাভারত যে মহাভারতেরই গৌরব, এখানে এলে সেটা ভাল করে স্মরণ হয়।

—এর মূল্য কি লোকাধীশ বাবু, বলুন তো? আর কি আমরা সেই গৌরবের দিন ফিরিয়ে আনতে পারবো? এখন নূতন ভাবে নবীন গৌরব অর্জন করতে হবে আমাদের—সমগ্র সভ্য এবং বৈজ্ঞানিক জগতের সঙ্গে তাল রেখে।

—জাতির পুরাতত্ত্বের মধ্যে থাকে জাতির আত্মা—লোকাধীশ বলল—যেমন রক্তের মধ্যে থাকে পূর্ব্বপুরুষের দৈহিক গঠন, মানসিক বিকাশ—তা ছাড়া মানুষ যে আবেগ-প্রবণতার বলে আত্মোন্নয়ন করতে যত্নবান হয়, তার প্রেরণা রয়েছে আপনার জাতীয় গৌরবের মধ্যে।

সেটাকে বাদ দিয়ে নব জাতীয়তা সৃষ্টির চেষ্টায় রোমাঞ্চ আছে, রঙিন স্বপ্ন আছে, কিন্তু আরো বেশি আছে রক্তক্ষয়ের অনর্থ। কারণ সেই নবসৃষ্টি পরীক্ষা মূলক, তার গতি এবং স্থিতি সম্বন্ধে আমরা একান্ত অজ্ঞ! অবশ্য আমি প্রাচীনত্বকে আঁকড়ে ধরে থাকতে বলছি না। প্রাচীন ভূমিতে প্রগতির বীজ রোপণ করতে বলছি। কারণ আমরাই বোধ হয় পৃথিবীর সুপ্রাচীন জাতি—এত বড় ঐতিহ্য আর কোনো দেশের নাই, এমন বিচিত্র সৃষ্টি কোন জাতি করে নি পৃথিবীতে। মিশর, বাবিলন, চীন ইত্যাদি সভ্যতা খুবই প্রাচীন, কিন্তু কয়েকটা পিরামিড আর মমী ছাড়া আর কিছু আছে বলে আমার তো জানা নেই। অন্যদিকে দেখুন চির পুরাতনকে অবলম্বন করে চির-প্রগতিপন্থী ভারত কত যুগ আগে বলেছেন 'চরৈবেতি' এগিয়ে চলো—যে ঘুমিয়ে পড়লো, সেই মরলো—চরৈবেতি। সূর্যস্য পশ্য শ্রেমানং যো ন তন্দ্রয়তে চরণ—চলো, এগিয়ে চলো।

—এই সব কথা আপনি লোকের চোখের সামনে ধরতে বলছেন?

—হ্যা, শুধু কথা নয়, তাঁদের কাজও! 'গ্রো মোর ফুড' সম্বন্ধে বহুদিন পূর্ব্বে তাঁরা অবহিত ছিলেন—"অন্নং বহু কুর্ব্বিত" কথায় তার প্রমাণ। জনকরাজা সত্যিই হলকর্ষণ করতেন—ফটোগ্রাফার ডেকে ট্রাকটার ধরে ছবি তিনি তোলাতেন না কাগজে ছাপাবার জন্য। ঋষি বিশ্বামিত্র নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করে ফল ফুলের জন্ম দিলেন—আজো তার ফল আমরা ভোগ করছি! অনন্ত দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় এমন। কিন্তু বর্তমান জগৎ যে 'বিজ্ঞান বিজ্ঞান' করে চীৎকার করছে—সেই বিজ্ঞানটাকেই সর্ব্বসাধারণের করা হোল না। গবেষণা লব্ধ তথ্য থাকে গবেষণাগারেই কয়েকজন পণ্ডিতের মস্তিষ্কে আর কাগজে, সাধারণ মানুষ তার দখল পায় কতটুকু! কৃষি ব্যাপারটা কঠিন বিজ্ঞান, সেটা কৃষককে শেখাবার চেষ্টা তো দেখছি না! ট্রাকটার-ওয়ালা ফটোতে সে কী বুঝবে?

—বুঝবেন কয়েকজন, যাঁরা ভোটের সময় চোঙা লাগিয়ে বলবেন—'ইনি নিজের হাতে চাষ করেন এঁকেই ভোট দাও'—জনৈক ভদ্র বললেন কথাটা। সবাই হেসে উঠলেন। লোকাধীশ হাসি থামিয়ে বলল,

—স্বাধীন রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে, ন্যায় এবং সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা, সর্ব্ব সাধারণকে নৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা—আর অন্ন-বস্ত্র আবাসের ব্যবস্থা। ভারতের এই আঠারো মাসের স্বাধীনতায় তার সামান্য কিছু হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। গণমন সব সময়ই স্থূল কিন্তু স্থূল বস্তুর বিশেষ গুণ হচ্ছে, চাপ যখন পড়ে তখন তলার সবকিছু চূর্ণ হয়ে যায়। আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের এইটুকু এখন চিন্তা করা দরকার। বুদ্ধি তাঁদের খুবই তীক্ষ্ণ কিন্তু ভেড়ার শিংএ হীরার ধারও টেকে না!

—কাপড়ের কলে নাকি এতো বেশী কাপড় জমেছে যে মিল কিছু দিন বন্ধ রাখতে হবে, অথচ আমাদের পরণে কাপড় নেই; কলকাতায় চালে কাঁকর সম্বন্ধে অভিযোগ করায় উত্তর এল যে বীরভূম আর বাঁকুড়ার চালে পাথর থাকে—উপায় কি!—এই সব খোঁড়া কৈফিয়ৎ কেন যে ওঁরা দেন, বুঝি না; আমরা কি এতই নির্ব্বোধ!—মেয়েটির নাম রেবতী। ও অল্প কয়েকদিন হোল এখানে এসেছে কলকাতা থেকে। ওর মামা মীরাটে বড় কাজ করেন। বিরক্তিতে ওর সুন্দর মুখখানা কুঞ্চিত হয়ে উঠছিল কথাগুলো বলতে বলতে। লোকাধীশ লক্ষ্য করে হেসে বলল,

—ঐগুলোই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির লক্ষণ—সব মানুষকে ওঁরা বোকা ঠাওরাণ, মনে করেন, গোণাগুন্তি জন কয়েক মানুষকে অর্থ, পদ-গৌরব আর খ্যাতির বিনিময়ে কিনে নিয়ে তাঁরা বাকি সমস্ত মানুষের মাথায় মুগুর মেরে চলবেন। স্থূল গণমনের সহ্যশক্তি কিছু বেশি—তাই আজও

সইছে। কিন্তু থাক এসব কথা।—লোকাধীশ ঐ আলোচনা বন্ধ করলো অকস্মাৎ, বললো, আমি সাহিত্যের কারবারী, কি বিষয়ে আপনাদের সেখানে বলতে হবে—অবশ্য সাহিত্যেরই কোনো বিষয়, বলুন!

—প্রাচীন সাহিত্যে মানবত্বের বিকাশ!—রেবতী বললো।

—চমৎকার বিষয়টি! বেশ, বলব। সভ্যতার উন্মেষ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, মানবত্বের বিকাশের ধারা এবং তার পরিপূরণের দিকে ভারত নিশ্চয়ই সর্ব্বাগ্রগণ্য। মানুষের চরিত্র এমন উজ্জ্বলভাবে কোনো সাহিত্যে আর রূপ গ্রহণ করে নি! এদেশে দস্যু রত্নাকরের ঋষি বাল্মীকি হতে বাধা তো নেই, কানীন পুত্র কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকে ভগবানের আসন দিতেও কার্পণ্য করে নি এরা। সেই বাল্মীকি ব্যাসের যুগ থেকেই আরম্ভ করা যাবে, কিম্বা…

—না, আপনি বৈদিক আর ঔপনিষদিক যুগ থেকে আরম্ভ করবেন; অগ্নিদেবের আবির্ভাব, ইন্দ্রের রাষ্ট্রপালন, কৃষির উন্নয়ন, যজ্ঞের তাৎপর্য্য …হবির আর হোমের প্রয়োজনীয়তা…মানুষের জন্য মহামানুষের দরদ…

—আপনি তো বেশ পড়াশোনা করেছেন, দেখছি…লোকাধীশ বললো রেবতীকে।

—না, কৃষ্ণার সঙ্গে আমার আলাপ আছে, উৎপলাদিকেও চিনি আমি, ওখানে যাই মাঝে মধ্যে। আপনার লেখা অনেক পড়েছি আর শুনেছিও কৃষ্ণার কাছে।

—কবে এসেছেন কলকাতা থেকে আপনি? ওরা সব ভাল আছে তো?

—হ্যাঁ—চার পাঁচদিন হোল এসেছি।

—উনিই তো উৎসাহ দিয়ে এখানে আনলেন আমাদের।—অন্যান্য উপস্থিত ব্যক্তিরা বললেন। রেবতী বেশ একটু গর্ব্বিত ভাবেই বলল,

—আপনার অনেক খবর রাখি আমি, বৌদির কথা, সেঁজুতির কথা…

—ও, আপনি তো একেবারে ঘরের লোক হয়ে পড়েছেন দেখছি! বলে লোকাধীশ হাসলো।—এখানে কি আপনার বাবা থাকেন ?

—না, মামা। এই আমার মামাতো ভাই, নবেন্দু, বলে চিনিয়েদিল একটি যুবককে। যুবক আবার নমস্কার করে বলল—আমাদের ওখানেই থাকবেন আপনি!

—তা কি হয় ? সকলের বাড়ীতেই এক-আধবেলা যেতে হবে।—অন্যান্য দুতিনজন প্রতিবাদ করলেন। প্রবাসী বাঙালীদের উৎসাহ খুব বেশী এইসব ব্যাপারে, জানা আছে লোকাধীশের। হেসে বলল,

—আচ্ছা, তাই হবে, এত দূর দেশে এসে আপনারা বাঙালীয়ানা বজায় রেখেছেন, দেখে আশা হোল। বাঙালীর একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, যা আর কোনো ভারতীয় অঞ্চলের নেই। এই সংস্কৃতি আজকার নয়, হাজার বছরের, হয়তো আরও প্রাচীন। বৌদ্ধ এবং তন্ত্রযুগে বাঙালী যে নবীন সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল, ভারতের অন্যান্য অংশে তার শাখা গেছে বটে কিন্তু বাংলায় রয়েছে তার মূল। এই সংস্কৃতি মৃত্যুঞ্জয়, শব-সাধক।

—কারণ…? রেবতী প্রশ্ন করলো।

—কারণ, এতো বলিষ্ঠ সাধনা আর কোনো জাতি করতে পারে নি! জনৈক কবি সেদিন বলেছেন—

> বীরত্বে ধীরত্বে প্রেমে আত্মবিসর্জনে—
> মনুষ্যত্বে মুমুক্ষুত্বে ত্যাগমহিমায়
> বিশ্বে যদি পরিচিত থাকে কোন জাতি
> বাঙালী তাহার নাম…

হয়তো এর মধ্যে অতিশয়োক্তি আছে, কিন্তু ভেবে দেখলে কথাটার সত্যতা

বোঝা যাবে। চির প্রগতিশীল এই জাতিটা আপনাকে বহুবার ভেঙে গড়েছে, এমন কি এই সেদিন ইংরাজ এসে যখন সারা দেশকে খৃষ্টান করতে লাগলো, তখনো সে রামমোহন, কেশব, দেবেন্দ্রকে সৃষ্টি করে আত্মরক্ষা করেছে। মৃতের শ্মশানে এরা আবার নব জীবন জাগিয়ে তোলে—নরম মাটির দেশ বলেই হয়তো এদের মনের উপাদান নমনীয়, কোমল, স্থিতিস্থাপক, আবার বাঁশের ছিলার মত ধারালো! এরা ভাঙতে জানে না!

কিছু খাদ্য পানীয় এলো ওঁদের জন্য; রেবতী সকলের হাতে খাবার দিতে দিতে বলল—আমরা সভায় দাঁড় করিয়ে বক্তৃতা করাবো না আপনাকে, ঘরে বসিয়ে আলোচনা চালাব—কেমন?

—তা ভাল, কিন্তু বাঙালীর মস্ত দোষ যে নৈয়ায়িক মনোবৃত্তি সেই রঘুনাথ শিরোমণি থেকে চলে আসছে; বক্তৃতায় কিছুক্ষণ সময় অন্তত পাওয়া যায় কথাগুলো বলে শেষ করতে কিন্তু ঘরোয়া আলোচনায় প্রতি কথায় তর্ক ওঠে। বক্তব্যটা আর শেষ হয় না।

—সে অবশ্য ঠিক! আচ্ছা, একদিন বক্তৃতাও হবে ঐ মানবত্বের বিকাশ সম্বন্ধে।

লোকাধীশের দাদা এতক্ষণে এসে অভিবাদন করলেন ওঁদের, বললেন,—আপনারা অনুগ্রহ করে এখানে খেয়ে গেলে আমরা খুবই খুসী হই!

ছুটির দিন, কেউ গররাজী হলেন না। তা ছাড়া রণাধীশ এখন দেশের বৃহত্তম ব্যাপারের একজন। তাঁর আমন্ত্রণ লাভ গৌরব এবং গর্ব্বের বিষয়। ওঁরা রাজি হলেন সকলেই! লোকাধীশ আরো কিছুক্ষণ আলোচনা হয়তো চলাতো কিন্তু দাদার সঙ্গে তাকে এখনি বেরুতে হবে—তাই বিদায় চাইল কিছুক্ষণের জন্য। ওঁরাও বললেন যে তাঁরাও

গোল মার্কেটের দিকে যাবেন, পুরাতন দিল্লীতেও কি দরকার আছে। ফিরে এসে খাবেন সকলে দুপুরে।

লোকাধীশ দাদার সঙ্গে বেরুলো প্রকাণ্ড বুইক গাড়ীতে। কল্পনাতীত সৌভাগ্য! বুইক গাড়ীতে বসে লোকাধাশ; পরের গাড়ী নয়, তারই দাদার এবং তারও; মনটা স্বপ্নাতুর হয়ে আসছে—পাশে যেন সালঙ্কারা সুসজ্জিতা সেঁজুতি কিন্তু, ওঃ। দুটো রক্তচক্ষু ওর মনের মধ্যে যেন চাবুক হেনে গেল—বহু বহু দিনের দেখা দুটা চোখ…যেন সূর্য্যের মত জ্যোতির্ম্ময়, বজ্রের মত কঠোর! নিজের চোখ বুজলো লকু।

নিজের মোটরে চলেছে লোকাধীশ—মোটরখানা সত্যি ওর দাদার তো? কিম্বা কারো চেয়েচিন্তে নিয়েছেন? না—তিনি এখন যে কাজে নিযুক্ত তাতে মোটর কেনা অসম্ভব তো নয়ই বরং না-কেনাই অসম্ভব এবং অসম্মানজনক। যে পদগৌরব উনি আজ পেয়েছেন, তাতে পদব্রজে বা টোঙায় চড়ে যাতায়াত চলে না, কিন্তু সর্ব্বমানবের নমস্য বৃদ্ধ মহাত্মাজী যদি পদব্রজে পরিক্রমণে বেরুতে পারেন, তাহলে এই সামান্য ব্যক্তিরা আজ তা পারেন না কেন? দাদা কি তবে আদর্শভ্রষ্ট হয়েছেন—অথবা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন আছে? ভাবতে ভাবতেই চলছিল লোকাধীশ দাদার পাশে বসে। গাড়ী চলছে পৃথ্বিরাজ রোড দিয়ে—পৃথ্বিরাজ, স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের শেষ গৌরব-কণা!

—শোন্ লকু, কয়েকটা বিশেষ কাজের কথা রয়েছে তোর সঙ্গে, তাই ডেকে পাঠাতে হোল—দাদা বললেন—বোম্বেতে কি মাইনে নিয়ে কাজ করছিস তুই, নাকি অন্য কোনো রকম?

—আমি তো চাকরী করি না! আমার বইখানা ওঁরা ফিল্ম করতে চান,—

—ওঃ, কন্‌ট্রাক্ট হয়ে গেল ?

—হ্যাঁ—তবে আমায় আবার যেতে হবে, কারণ চিত্রনাট্যকারকে একটু সাহায্য করা দরকার—নইলে আমি যা বলতে চাই, তার সবকিছু ওলটপালট হয়ে যাবে।

—তোকে এখন দিন কতক বাড়ী গিয়ে থাকতে হবে। সুবোধকে আমি চিঠি লিখেছি—সে নিশ্চয় তৎপর হয়ে উঠেছে এর মধ্যে। তুই গিয়ে ওর সঙ্গে যোগ দে। আমাকে বোধ হয় ভারতের বাইরে যেতে হবে, অবশ্য সম্মান বা অর্থ কোনো দিক দিয়েই কিছু কম পাব না - তুই হিন্দি শিখেছিস্ ?

—হ্যাঁ—কিন্তু···বড়দার আকস্মিক প্রশ্নটায় অবাক হয়ে চাইলো লোকাধীশ ওর পানে—বললো,—হিন্দি শিখেছি ভাষা শেখার জন্য, হিন্দি প্রচার করবার চাকরী নেবার জন্য নয়—আমায় কি চাকরী দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন কোথাও— ?

—না, চাকরী তোকে করতে হবে না কোনোদিন। যা করছিস, তাতেই ভালো চলে যাবে। শোন, হিন্দি বা হিন্দুস্থানী হবে ভারতের রাষ্ট্রভাষা, বাংলা ভাষার কোন আশা নেই। বাংলারই বহু বিশিষ্ট প্রতিভাবান ব্যক্তির এই মত, সর্ব্বভারতীয় ব্যাপারে বাঙলা ভাষা অচল।

—সর্ব্বভারতীয় ব্যাপারে বাঙলা দেশটাই অচল, জল-অচল দাদা, ওটাকে বাদ দিতে পারলেই সর্ব্বভারত হয়তো খুসী হন—লোকাধীশের কণ্ঠে বেদনার সুর ঘনীভূত হচ্ছে—কিন্তু জয়দেব, চণ্ডীদাসের বাংলা, শ্রীচৈতন্যের রঘুনাথের বাংলা, প্রতাপ সীতারামের বাংলা, রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের বাংলা, বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শ্রীঅরবিন্দের বাংলাকে অত সহজে জল-অচল করা যাবে না। বাংলা ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জন করেছে তার যুগার্জ্জিত সাধনাবলে, কিম্বা বাংলা হয়তো সর্ব্বজাতিত্বের ঊর্দ্ধে উঠে গেছে তার তন্ত্রধর্ম্মের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যে···।

—এটা গাড়ী, গড়ের মাঠ নয়—বক্তৃতা থামা তোর—বড়দা ধমকে দিলেন লোকাধীশকে। থেমে গেল লোকাধীশ, বড়দার ব্যক্তিত্ব অনন্য-সাধারণ; লোকাধীশের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব তার কাছে লোহার কাছে তূলার তুল্য লঘু। থেমে গেল সে, কিন্তু মনের অস্বস্তি ধূমায়িত হতে লাগলো বুকের মধ্যে। বড়দা বললেন,—মানুষ অবস্থার দাস, নিজেকে পারিপর্শ্বিক প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে চলতে না পারলে তার মরণ অনিবার্য্য।

—মানুষের বেলা এটা সত্যি নয় দাদা,—পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিকেই সে পরিবর্ত্তিত করে নিতে পারে নিজের বাঁচবার জন্য—তাকে মানুষ হয়ে বাঁচতে হবে, পশু হয়ে নয়।

—বিস্তর শিখে ফেলেছিস, দেখছি,—বড়দা কঠোর স্বরে বললেন,—তোর থেকে আমি অন্ততঃ আট বছরের বড়, মাঝখানে যে ভাইটা ছিল, থাকলে আজ কাজ হোত।

কবে কোন ভুলে-যাওয়া ভাইএর জন্য শোক বুঝি উথলে উঠল বড়দার আজ। সত্যি তাদের আরো ভাই ছিল নাকি? জানে না লকু, হয়তো ছিল, তার মনে পড়ে না। কিন্তু বড়দা তার জন্য আজ হঠাৎ এত শোকার্ত্ত হচ্ছেন কেন?

—হয়েছিস তো একটা ষাঁড়ের গোবর—না হোমে না যজ্ঞিতে লাগে। করিস সাহিত্য। কি কাজ হবে তোর বিনিয়ে বিনিয়ে গল্প উপন্যাস লিখে, তা তুই জানিস—রাগের চোটে কিছুক্ষণ থেমে রইলেন তিনি। প্রকাণ্ড একটা পার্ক ওখানে,—নাম তেলকটরা পার্ক। গাড়ীটা থামাতে বললেন হঠাৎ।

—আয়, ওখানে বসে কয়েকটা কথা তোকে বলবো আমি। বাড়ীতে তো সকাল থেকেই ভীড় রাত পর্য্যন্ত।—হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন লকুকে। লকু চিরদিনের অনুগত ভাই। বিদ্রোহ সে করবে না—

জানেন উনি—নিজের সমস্ত আদর্শকে অগ্নিস্মাৎ করেও সে দাদার হাতে আত্মসমর্পণ করবে, লক্ষ্মণ যেমন করে সীতাকে নির্ব্বাসন দিয়ে এসেছিল। নীরবে নেমে চললো লোকাধীশ দাদার সঙ্গে। কোণের দিকে একটা বেঞ্চি, উপরে লতাগুল্মের ছায়াবীথি, বেশ নির্জ্জন এখন স্থানটুকু। বসলেন ওঁরা। দূরে বহু দূরে, প্রাচীন দিনের সহস্র ভগ্নাবশেষ মৃত শ্মশানের মত তাকিয়ে রয়েছে যেন মন্দিরে, মিনারে, গম্বুজে, গির্জ্জায়; সুপ্ত মহাকালের সুদীর্ঘ শ্বাস ভেসে আসছে বায়ুতরঙ্গে। লোকাধীশের মনে জাগলো কবিতা,

"অতুল বিরাট বিপুল দিল্লী, শত সম্রাট-প্রেয়সী অয়ি—"

—বোস এখানে—বড়দা নিজেই বসে চুরুট ধরালেন একটা। হ্যাভানা চুরুট, দামী, সুগন্ধী, সৌখীন। গলাটা সাফ করে নিয়ে আরম্ভ করলেন,

—বর্ত্তমানে বেঁচে থাকতে হলে যা দরকার তাই আমাদের করতে হবে; —মানুষের দরকার, অন্ন-বস্ত্র, আবাস, মানুষের দরকার শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, কিন্তু সকল মানুষের জীবনে এইসব সুযোগ সুলভ নয়। সুযোগ কদাচিৎ আসে; যখন আসে তখন তাকে কাজে না লাগানো পাপ। সেদিন বিদেশীর বিরুদ্ধে নিরস্ত্র যুদ্ধঘোষণা করে জেল খেটেছি, ঘানি টেনেছি, তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী হয়ে আড়াইফুট সেলে দিনরাত্রি না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। সেদিন—সেই অবস্থাতেই নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম যে, স্বাধীনতা আমাদের জীবনে দেখা হবে না!—কিন্তু,—চুরুটে আর একটা লম্বা টান উনি দিলেন, লোকাধীশ নীরবে বসে শুনছে—কিন্তু সেই শুভদিন যখন এলো এবং সুযোগও কিছু পেলাম আমরা, তখন তার সুষ্ঠু প্রয়োগ না করা অপরাধ হবে নিজের প্রতি, পরিবারের প্রতি···

—দেশের প্রতিও—লোকাধীশ আস্তে বললো,—অতি আস্তে!

—শোন্—বড়দা ওর ক্ষীণ প্রতিবাদটাকে ডুবিয়ে দিলেন—বল্‌তে লাগলেন,

—যে ইচ্ছার ঐকান্তিকতা নিয়ে আমি এখানে এসেছিলাম, তার সবটাই হারিয়ে গেছে। তিনপুরুষের বিপ্লবী আমরা; ঠাকুরদা, বাবা আর আমরা দুভাই দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার কিছু কম করিনি। বাবা দেশত্যাগী হয়ে গেলেন পর্য্যন্ত। ইংরাজের হাতে মার খেয়ে আমার শরীর স্বাস্থ্য প্রায় গুড়িয়ে এসেছিল—অনশনে আর অর্দ্ধাশনে মা-বৌকে আধমরা করে তুলেছি কিন্তু স্বাধীনতা যেদিন এলো, সেদিন উচ্ছ্বাস আর উৎসাহ আমাদের যতই আকাশস্পর্শী হোক, দেখা গেল, সেটা হোমাপাখী নয়—কোনো পাখীই নয়, কলে চলা এরোপ্লেন মাত্র। তেল ফুরুতেই ওকে মাটিতে পড়তে হলো—আমি ঐ উচ্ছ্বাস আর উৎসাহটার কথা বলছি, স্বাধীনতার নয়।

লোকাধীশ চুপ করে রইল। চুরুটে মৃদু একটা টান দিলেন রণাধীশ, মিনিট খানেক চুপ করে রইলেন, তারপর অতি মৃদুকণ্ঠে বলতে লাগলেন,

—যে স্বাধীনতা মানুষকে সত্যিকার স্বাধীনতা এনে দেয়, তা আমরা আজো হইনি, হতে দেরী আছে। সেটা হচ্ছে শুধু রাজনৈতিক বা সামাজিক বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নয়, ওকে অবলম্বন করে আত্মিক স্বাধীনতা। কথাটা একটু কঠিন হচ্ছে বোঝানো…। মানুষের আত্মা পরাধীন হয়ে গেছে, বিশেষ করে ভারতে—লোভের হাতে, কামের হাতে, দম্ভের হাতে মানবাত্মা আজ বন্দী; পদগৌরবের মোহ, আর বাড়ী-গাড়ী-নারীর বিলাসের শেকলে মানুষ আজ বন্দী। এর থেকে উদ্ধার হতে, মুক্ত হতে তার দু'দশ বছর যাবে না, শতাব্দি কেটে যাবে।

—মানুষের নৈতিক জীবন পঙ্কিল হয়ে গেছে সর্ব্বত্র, সে কথা ঠিক। লকু বলল।

—মানুষ তার নৈতিক জীবনটারই গর্ব্ব করতে পারতো—বড়দা বললেন—অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে রাজ্যশাসনের অধিকার সে অর্জ্জন করেছিল তার নৈতিক উৎকর্ষের ফলেই, কিন্তু আজ সেটা হচ্ছে শক্তিবলে। "মাইট ইজ রাইট" কথাটার মাইট শব্দটাই আজকার পৃথিবীতে প্রবল। যে নৈতিক শক্তি নিয়ে আমাদের ঠাকুরদা বা বাবা রণক্ষেত্রে গিয়েছিলেন, তার অভ্যন্তরে ছিল বজ্রাগ্নি, সে অগ্নি সত্যের পূজারী, কিন্তু আজ যা নিয়ে আমরা লম্ফ ঝম্ফ করছি, তাতে বজ্র নেই, আছে আওয়াজ শুধু, আর চোখ ঝলসানো আলো। এ আলো চোরাবাতির মত অলি-গলিতে সোনা কুড়িয়ে ফেরে; এ আলো সূর্য্য নয়, মন্দিরের স্নিগ্ধ মৃৎপ্রদীপ নয়, এটা জোনাকীর আলোর মত শীতল, দাহিকা-শক্তিহীন—শুধু জোনাকীকেই খাবার খুঁজে দেবার কাজে লাগে।

—আমরাও কি জোনাকী হয়ে যাব? বড়দার বিরাট বক্তৃতার উত্তরে লকু ঐ ছোট কথাটুকু বলে চাইল ওর মুখ পানে।

—চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা যখন অন্ধকারে সবাই ডুবে গেল, তখন তুমি একাই সূর্য্য হয়ে—

—সূর্য্য একাই থাকে দাদা, অনন্ত অসীম আকাশে তার সঙ্গী নেই কেউ আর।

বড়দা বিমর্ষ হয়ে পড়লেন লকুর কথাটা শুনে। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন; চুরুটে কয়েকটা টান দিলেন; যেন তিনি আর কিছু বলতে সাহস পাচ্ছেন না, অথবা ইচ্ছে করেই বলছেন না। কিন্তু বলবার জন্যই ডেকেছেন লকুকে।

—আমাকে কি করতে হবে বলুন, আপনার আদেশ আমার মতের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে যাবে, তার বিচার আমি করবো না দাদা,—নির্ব্বিচারে তাকে মেনে চলাতেই আমার সহোদরত্ব, কিন্তু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি,

মতের অমিলের জন্যই আমাদের পিতৃবিচ্ছেদ ঘটেছে।—লকু বলল সজল স্বরে।

—মতের অমিল ঘটলে তোকে সে-কাজ করতে আমি বলবো না লকু। স্বমতে যদি তোকে না আনতে পারি তো, তোর মতেই আমাকে যেতে হবে। কিন্তু আমার কথা এখনো শেষ হয়নি···উনি থামলেন, লকুও চুপ করে রইল। একজন সাহেব একটি ছোট মেয়ের হাত ধরে পার্কের ও গেটে ঢুকে এ গেট দিয়ে বার হয়ে যাবেন। কাছাকাছি আসতেই বড়দা মুখখানা নামালেন, কি জানি, উনি আবার অভিবাদন করবার জন্য এসে পড়তে পারেন। বড়দা এখন সর্ব্বজন-পরিচিত ব্যক্তি। লকু দেখলো ব্যাপারটা। কিছু বলল না—বলবার কিছু নাইও। তেজস্বী উন্নতমস্তক বড়দাদার মাথা নত হোল, এইটুকু শুধু দেখলো সে। লোকটি চলে গেলে কথা আরম্ভ করলেন,

—বাবার আমল থেকে এ পর্যন্ত আমাদের যা ছিল, জীবনটুকু ছাড়া আর সবই গেছে, কেমন? সেই জীবনকে আমরা আহিতাগ্নি রূপেই সঞ্চিত রেখেছিলাম এই সেদিন পর্য্যন্ত কিন্তু লকু, জীবনের পরিধির একটা সীমানা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেটা ফুরিয়ে আসে একদিন এবং আসবেই। বর্ত্তমানে দেশের যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে, তাতে বোঝা যায়, হোমাগ্নি এখন আর জ্বলবে না; এখন পেট্রল-কেরোসীন-গ্যাস-ইলেকট্রীকের যুগ, ঘি-এর বদলে বনস্পতি, দুধের বদলে স্যোয়াবীন, চিনির বদলে স্যাকারিণ চলছে— চলবেই। মানুষের নৈতিক মানদণ্ড নীচু হয়ে গেছে বলা চলে না, সেটা নির্লোপ হয়ে গেছে। তার পুনস্থাপনের জন্য যে মহাশক্তিশালী মহামানবের দরকার তিনি কবে আবির্ভূত হবেন, জানা নেই। হয়তো যুগব্যাপী সময় লাগবে মানুষের তাঁকে আনতে; কিন্তু মাঝের এই সময়টা কাটাবো কি করে?

—তাঁকে আনবার সাধনা করে।

—ওটা সাহিত্যের কথা, স্বপ্নের কথা, নিরাহার নিরালম্ব হয়ে তপস্যা করার কথা! বর্ত্তমান বস্তুগত জগতে ওর মূল্য নেই। মানুষকে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে হবে মানুষের মত হয়ে; পরিবারের ভরণপোষণ, সন্তানের শিক্ষা, স্বজনের উন্নতি বিধান তার প্রথমতম কর্ত্তব্য। অবশ্য স্বদেশের উন্নতিও তার পরেই পড়ে···

—সবেরই আগে সেটা হলে বাকিগুলো আপনি হয়, দাদা।

—হ্যাঁ, তাতো হয়। কিন্তু ঐ যে বললাম, সারা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে এখন শক্তির পরীক্ষা চলেছে। এখন মুখে বড় বড় বুলি আর বক্তৃতা দিয়ে মনের ভাবকে চাপবার দিন। নিষ্ঠা নামক গুণবাচক কথাটা তুমি অভিধান থেকে তুলে দিতে পার, যদি সেটাকে শুধু ভোগনিষ্ঠা বলে না চালাও।

—আপনি বলতে চাইছেন যে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বেঁচে থাকবার মত কিছু সঞ্চয় আমাদেরও করে নেওয়া উচিত, কেমন?—লকু সোজা করে দিল বক্তব্যটা।

—কতকটা তাই। দুঃখ ঢের সয়েছি লকু, পৃথিবীতে জন্মাবার পর থেকে সুখের মুখ প্রায় দেখিইনি। যে সুযোগ এসেছে, তাকে প্রত্যাখ্যান করা মূঢ়তা; কারণ, একা আমি বা তুমি কিছুই করতে পারি না এতবড় দেশটার। আর আমাদের হাতে ক্ষমতাও তেমন কিছু নেই···

লকু নিঃশব্দে শুনে যেতে লাগলো কথাগুলো। বড়দা বললেন যে এর পর লকুকে বাড়ী যেতে হবে এবং সুবোধের সঙ্গে দেখা করে কয়েকটা বিশেষ কাজ করতে হবে। সব শুনে লকু শুধু বললো,

—বেশ, আমি পরশু দিনই রওনা হয়ে যাচ্ছি।

—'এয়ারে' চলে যাবি—অনর্থক কষ্ট করার কি দরকার! আগে কলকাতা গিয়ে ঐ কাজটা করে তার পর যাবি বাড়ী; চল, যাই।

লকুও উঠলো ; সারা প্রাণ জুড়ে তার শুধু হাহাকারের মত একটা ইংরাজি কথা জেগে উঠছিল—Alas for a handful of silver he left us—

উপরের ঘরেই ইন্দ্রজিতের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে দুপুরে। অল্প একটু বিস্মিত হয়েছিল ইন্দ্রজিৎ গোড়ায়, কিন্তু বিস্ময়ের যথেষ্ট কারণ আপাততঃ বিদ্যমান নাই। অনেক দিন পরে সে এ বাড়ীতে এসেছে, এবং হয়ত কন্যার বিবাহের ব্যাপার নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আজও মতদ্বৈধ চলছে। হয়ত কাবেরী...কিন্তু অত সুখ সইবে কি কপালে? মা'কে মনে পড়লো ইন্দ্রজিতের। মা—চিরদুখিনী মা ইন্দ্রজিতের, যাঁর সর্ব্বশেষ আশীর্ব্বাদ আজো ওকে চালিত করে—অনুপ্রেরিত করে—অনুভাবিত করে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে।

বাচ্চা চাকরটা এসে একটা পাথরের গেলাসে একগ্লাস ডাবের জল দিল—ঘুমিয়ে উঠে এঁরা ডাবের জলই খান হয়তো। ঘড়িতে দেখলো ইন্দ্রজিৎ, চারটা পঁচিশ বেজেছে। বেলা আর বেশী নাই; ঘুমিয়েছিল তাহলে ইন্দ্রজিৎ। কিন্তু কখন ঘুমুলো? তার যেন মনে পড়ছে না। পরে অনুভব করলো, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল, তাই ঘুমের ব্যাপারটা মনেই নাই। প্রচুর খেয়েছে মধ্যাহ্নে। এক নিশ্বাসে ডাবের জলটা পান করে নিল ইন্দ্রজিৎ—ডাব! মহার্ঘ বস্তু; আগের দিনে দাম ছিল দু'পয়সা, আজ সাত আনা থেকে বারো আনা। কজন লোক ডাব খেতে পারে এ দিনে? পারে বইকি; যারা কালোবাজারের তলায়, অধিক লাভের অন্ধকারে, উৎকোচের আওতায় ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স বাড়িয়ে চলেছে, তাদের ব্যাঙ্কের টাকার অঙ্কে কিছু ভাগ অবশ্যই বসানো উচিৎ এইসব ডাবওয়ালা,

শাকওয়ালা, মাছওয়ালা, দুধওয়ালাদের। কিন্তু যাদের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স না থেকে কাবুলী খাতায় খৎ লেখা আছে, তারা কি খায়? চার আনায় এক গজ পুঁইডাঁটা আর দু'আনায় আঁসপাতলা কুমড়ো ফালীতেই তাদের তো চলে যায়—না, এসব আর ভাববে না ইন্দ্রজিৎ। চাকরটাকে বললো,

—মাকে খবর দাও তো, আমি এবার যাবো!

—মা বললেন, আপনি চা খেয়ে একটু বেড়িয়ে আসবেন দিদিমণির সঙ্গে!

—কোথায়?

—তা তো জানি না আমি হুজুর!

—ও, আচ্ছা! চাকরটাকে আর কিছু না শুধুনো উচিৎ ভেবে ইন্দ্রজিৎ বিদায় করে দিল ওকে। কিন্তু ভাবতে লাগলো, কাবেরী কোথায় তাকে নিয়ে যাবে? সিনেমা? গড়ের মাঠ? ক্লাব, সুইমিং পুল?—দূর ছাই! ইন্দ্রজিৎ আর ভাবলো না। বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে ওখানেই তার লম্বা চুলগুলো আঁচড়ে নিল চিরুণী দিয়ে। সবই রয়েছে বাথরুমে; কিন্তু তার জামাকাপড় তো সবে এক সেট! হোকগে, বেশ পরিষ্কার আছে। ইন্দ্রজিৎ পরে ফেললো জামাকাপড়; বেশ দেখাচ্ছে ওকে, বেশ বাবু-বাবু। একি সেই ইন্দ্রজিৎ, কয়েকদিন পূর্ব্বে যে উৎকলের গুহায় আড্ডা দিত, আচ্ছাদনের জন্য ছিল মাত্র কম্বল একখানা! এখনকার ইন্দ্রজিৎ গলায় সোণার বোতাম, হাতে রিষ্টওয়াচ আর আঙ্গুলে আংটি পরলে দিব্যি সভ্য-ভব্য ভদ্র হয়ে যেতে পারে, এমন কি, সিনেমার নায়কও হয়ে যেতে পারে। চেহারাখানা ভালই দিয়েছিলেন ভগবান, সবল, সুস্থ, সুন্দর—মনটা কেন বাবুর মত দেন নি, তাই ভাবে ইন্দ্রজিৎ,—কেন বিলাসীর মত মন হোল না ওর? তিক্ত-বিরক্ত লাগে বিলাস-ব্যসন। এই বৈরাগ্য কি স্থায়ী হবে, নাকি কোন এক তন্বী তরুণীর দেহবল্লরীর অমোঘ বাঁধনে...

—চলুন—গাড়ী এসে গেছে···কাবেরীর কণ্ঠস্বর চকিত করে দিল ওকে।

—গাড়ী এসে গেছে ? কি গাড়ী ? কোত্থেকে এলো ?

—গাড়ীটা ক্যাডিলাক্, এলো গ্যারেজ থেকে—কাবেরী হেসেই বলল, আকাশের নক্ষত্রই গুণবেন, মাটিতে কোথায় কুয়ো আছে, জানবেন কি করে! আসুন।

—কোথায় যেতে হবে ?

—আপাততঃ চায়ের জন্য লনে, তারপর গাড়ীতে উঠে মাঠে বা সিনেমায় বা রাস্তায়।

—রাস্তায় ?

—হ্যাঁ—আমি আপনাকে অমরাপুরীতে নিয়ে যেতে চাই, আপনি আমাকে টেনে পথে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারলে বুঝবো,তপস্যা সিদ্ধি হয়েছে।

—তপস্যাই করতে পারলাম না, তার আবার সিদ্ধি—আনমনে বলতে বলতে ইন্দ্রজিৎ এগিয়ে এল, নীচে নামলো, বসলো গিয়ে লনে চা খাবার জন্য। কাবেরী বরাবর ওর পিছনে আসছে, কিন্তু কথা আর একটাও হোল না। মা ছিলেন ওখানে, চায়ের সব ব্যবস্থা তিনিই করে দিলেন। মোহিতবাবুও চা খাচ্ছেন—অন্য আর কেউ নাই বাইরের লোক। মিঃ চাটার্জিই বললেন,

—তোমাদের কর্ম্মপন্থাটা কি ইন্দ্রজিৎ ? কি মিশন নিয়ে তোমরা কাজে নেমেছ ?

—ভারতকে তার সদ্ধর্মে জাগ্রত করা, প্রতিষ্ঠিত করা ; এখানে ধর্ম্ম শব্দটার অর্থ পূজো-আহ্নিক-হোম-যাগ নয়,—ধর্ম্ম যা মানুষকে ধারণ করে, পোষণ করে, চালন করে। ভারত জাগলে সারা পৃথিবী জাগবে, অর্থাৎ জাগাতে হবে ভারত-সন্তানকেই।

—কি ভাবে? বর্ত্তমানের এই ভোগলিপ্সু পৃথিবীকে তোমরা কি সাধু মোহন্ত বানাতে চাও?

—মোহন্ত নয়, সাধু বানাতে চাইছি। বানাতেও চাইছি না, শুধু মনে করিয়ে দিতে চাইছি যে তোমরা সাধুই ছিলে, আবার সাধু হও। শুধু 'রামরাজ্য রামরাজ্য' বলে বক্তৃতা দিলে রামরাজ্য আসবে না; রামের মত প্রজাবৎসল হতে হবে রাজাকে আর অযোধ্যার মত প্রজাও থাকতে হবে রাজ্যে। বশিষ্ঠের মত গুরুরও দরকার; কিন্তু...ইন্দ্রজিৎ একটু থেমে বলল—আমরা রামরাজ্য চাইছি না, স্বরাজ্য চাইছি! মানুষের মহত্তর সম্ভাবনাকে আবাহন জানাতে চাইছি, যে মানুষের মধ্যে হবে মানুষটাই বড়ো, পশুটা নয়।

—কিন্তু ইন্দ্রজিৎ—মিঃ চাটার্জি এক ঢোক চা গিলে বললেন,—সমষ্টি-বদ্ধ অবস্থায় যারা মানুষের ভালোত্বের সম্ভাবনায় অস্থা রাখে তাদের বলা হয় স্বপ্নবিলাসী। সমাজবদ্ধ সকল মানুষ একেবারে ভালো হয়ে উঠবে আর সব দুর্নীতি পরিত্যাগ করে তপস্বী, সাধু, ত্যাগী হয়ে উঠবে, এটা কোনো যুগে হয়নি, হবেও না; এ স্বপ্ন, বাস্তবতার কিছু নাই এতে।

—আপনি খাঁটি বাস্তবপন্থীর কথাই বললেন। বাস্তববাদীরা মনে করেন, বস্তু আগে মন পরে—তাই তাঁরা মানুষের জড়ধর্ম্মী অবস্থাকে বিপ্লবের চাবুক দিয়ে ঘোড়ার মত ছুটিয়ে তাড়াতাড়ি কিছু কাজ করিয়ে নেন। কিন্তু আমাদের এই দেশে বহু পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের কথা রয়েছে—"মনঃ পুব্বঙ্গমা ধম্ম"—মনই ধর্ম্মের আগে যায়, অর্থাৎ মানুষের জড়ধর্ম্মকে মনই চালিত করে। সেই মনকে যদি ঠিক পথে চালাবার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে মনুষ্যধর্ম্মটা জাগানো খুব কঠিন হবে না!

—ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটা প্রাযোজ্য হলেও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, সমষ্টিবদ্ধ অবস্থায় কি করে হবে?

—হবে, হয়েছিল এই ভারতেই। শোষণ বিহীন সমাজ ছিল, অত্যাচার বিহীন রাজা ছিল, আত্মনির্ভরশীল প্রজা ছিল—তখন মন তাদের মানব-ধর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করতো, আবার সেই মনকে যাঁরা প্রস্তুত করে দিতেন তাঁরা ছিলেন রাজার উপরে, ভগবৎ সান্নিধ্যে! মন্দিরে মন্দিরে, মঠে মঠে শুধু তাঁরা থাকতেন না, তাঁরা থাকতেন মানুষের একান্ত সান্নিধ্যে, পাঁচালিতে ছড়ায়, কথকথায়, লোকসঙ্গীতে, লোকাভিনয়ে। গীতা উপদেশক সম্রাট শ্রীকৃষ্ণও সেদিন বিদুরের ক্ষুদ্ খেতে আসতেন—মানুষের সেই শিক্ষাকে সর্ব্ব সাধারণ্যে চালাবার জন্য খবরের কাগজ, রেডিও, সিনেমেটোগ্রাফ্ ছিল না সেদিন, কিন্তু তার থেকে মূল্যবান বস্তু ছিল, সেটা 'ব্যক্তি' আর সেই ব্যক্তির নিষ্ঠা! তিনি 'আপনি আচরি ধর্ম্ম' অপরকে শেখাতেন। এই ব্যক্তিত্বই কার্যাকরী, বর্ত্তমান দিনে যার একান্ত অভাব। পণ্ডিত জহরলাল সেদিন অধিক ফসল ফলাবার আবেদন করে যে সুন্দর, সুদীর্ঘ এবং করুণ আবেদন করলেন, এই বিরাট ভারতবর্ষের কয়টা ফসল-ফলানেওয়ালা চাষীর কানে তা পৌঁছেছে বলতে পারেন? ওখানে শুধু বাণী আছে, ব্যক্তি নেই! দেশে হাজার হাজার জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, হাকিম,—দারোগা, দফাদার, চৌকীদার, লাখ লাখ টাকা খরচ হয় তাদের জন্য প্রতিদিন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাড়ীর টবে ঝিঙেলতা গজিয়ে প্রধান মন্ত্রীকে হয়তো পাঠাতে পারেন কিছু মোটা পুরস্কার পাবার আশায়—কিন্তু পাশের বাড়ীর চাষার কানে জহরলালজীর আবেদনটা পৌঁছে দেবার বেলা তার প্রেষ্টিজ খোয়া যায়।

চা-টা জুড়িয়ে যাচ্ছে—কাবেরী স্মরণ করিয়ে দিল ইন্দ্রজিতকে। খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ও, চায়ের দিকে নজর না দিয়ে বলেই চল্ল, —ডাকাতেরা মেয়েদের গায়ে হাত দিত না এই পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা, সবিনয়ে বল্তো 'মা, তোমারা গায়ের গহনাগুলো খুলে দাও।'

আর আজ শুধু ডাকাত নয়, রীতিমত ভদ্রমার্কামারা সমাজসেবীরাও অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে কূলবধূকে বের করে নিয়ে যায়।—সমাজবাসী নিরন্ন হতভাগ্যের দল অর্থের জন্য নিজের ঘরের বধূকে দিয়ে আসে গভীর রাত্রের অন্ধকারে। বক্তৃতায় গগন বিদীর্ণ হচ্চে, ব্যক্তি নাই, মরেছে সে।

ইন্দ্রজিতের কথাগুলো ধরে হয়তো অনেক তর্কই তোলা যায় এবং হয়তো তুলতেন মোহিতবাবু। কিন্তু ইন্দ্রজিতের কথাগুলোতে এমন বেদনার নিষ্ঠা জাগছে, যে, প্রতিবাদ করে তার মনকে পীড়িত করতে ইচ্ছা করছিল না তাঁর। শুধু বললেন—দেশে ভাঙনের অবস্থা চলছে এখন—মানুষ অস্থির, ব্যক্তিত্ব বিপন্ন; সাধারণ মানুষ দুটা খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে চায় কিন্তু সেই খাওয়া পরার সমস্যাটাই অত্যন্ত বড় হয়ে উঠেছে; এ যুগে কিছু স্থিতিশীল সৃষ্টি সম্ভব বলে মনে হয় না।

—"যুগে যুগে যিনি সম্ভবামি," তাকে আনবার সাধনাই করছি আমরা। যিনি গদীতে বসে সাধুই থাকবেন, মোহন্ত হয়ে উঠবেন না—যাঁর ব্যক্তিত্ব সূর্য্যের মত, দরকার হলে নিদাঘের পীড়ন দিয়ে যিনি বর্ষার বারি সঞ্চিত করবেন আমাদের জন্য, শীতের শুষ্কপাতা ঝেড়ে ফেলে বসন্তের নব মঞ্জরীতে সাজিয়ে দিবেন আমাদের উদ্যান। যার হাতে দণ্ডটা প্রতিশোধ নেবার জন্য আমরা দেবনা, দেবো প্রতিরোধ করবার জন্য আমাদের অশান্তি, প্রতিকার করবার জন্য আমাদের দুঃখ, প্রতিষ্ঠা করবার জন্য আমাদের মনুষ্যত্ব, ব্যক্তিত্ব।

চায়ে কয়েকটা ঘনঘন চুমুক দিল ইন্দ্রজিত। একটুকরো কেক কেটে ওকে দিতে দিতে কাবেরী বলল আস্তে—তিনি কি সত্যি আসবেন ?

—হয়তো এসেছেন। হয়তো কোন্ কংশ কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে কোথায় কোন্ মাঠে-ঘাঠে-বাটে ধেনু চরিয়ে বেড়াচ্ছেন, দেখে

ফিরছেন সাধারণ মানুষের অসাধারণ দুঃখ দুর্দ্দশা, ব্যক্তির জীবনে বিপর্যয়ের বিস্ফোটক, সমাজের জীবনে স্বৈরাচারের ঘুণ।

কাবেরী বললো,—রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্ম্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।"
তারপর বলেছেন :—এসো কবি অখ্যাতজনের—
নির্ব্বাক মনের।
মর্ম্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার···

হয়তো আসবেন তিনি।—আবৃত্তি ভালো করে কাবেরী, গলা তো মিষ্টি আছেই। ইন্দ্রজিৎ শুনলো এবং বললো,—সেই দিনের জন্য তাঁর প্রত্যাশায় বসে আছি নয়, তাঁকে আনবার জন্য তোরণ রচনা করছি আমরা।

মোহিতবাবু আর কিছু বললেন না। চা খাওয়া হলে মা বললেন কাবেরীকে,

—যাও, ওকে একটু ঘুরিয়ে আন মাঠের দিকে। দেখে এসো ইন্দ্রজিৎ, কলকাতার অনেক পরিবর্ত্তন চোখে পড়বে।

—ভালোর দিকে না মন্দের দিকে?—প্রশ্ন করলো ইন্দ্রজিৎ।

—সেটা তুমি নিজেই বিবেচনা করো বাবা—আমি আর কি বলবো।

কাবেরী ওকে নিয়ে বেড়াতে বেরুলো। আর কিছুর জন্য নয়—ওদের মধ্যে একটু ভাবের আদান-প্রদান হোক, পরস্পরকে কিভাবে নেবে, জানা যাক, এই উদ্দেশ্যেই মা-বাবা এরকম ব্যবস্থা করলেন। তা ছাড়া, ইন্দ্রজিৎ পূর্ব্বথেকেই কাবেরীর সঙ্গে বিশেষ

পরিচিত; নইলে কাবেরীকে এরকম ভাবে কারো সঙ্গে বেড়াতে পাঠান না মা। ওরা চলে গেলে মোহিতবাবু বললেন,

—ছেলেটার আন্তরিকতা অসাধারণ। ইস্পাৎ খুবই খাঁটি, কিন্তু হলে হবে কি, ওতে ক্ষুরও হয়, খাঁড়াও হয়।

—তুমি কোনটা চাইছ—ক্ষুর না খাঁড়া?

—আমি চাইছি এক্সেল, বল বিয়ারিং, হুইল, স্প্রিং। তার ধার তুমি চাক্ষুষ দেখতে পাবে না, কিন্তু বর্ত্তমান জগতে ওগুলোই দরকার—

—ক্ষুর খাঁড়ারও দরকার......

—মোটে না। দাড়ী না গজাবার ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক করে দিতে পারবেন, আর, পাঁঠা কাটতে হবে না। পিষে কিমা করে নেওয়া যেতে পারে, এমন কি র-মিট জুষ আরো উপকারী......হাসলেন তিনি।

—রঙ্গ রাখো, বুড়ো বয়সে আর......

—বুড়ো হয়ে গেলাম নাকি! কিন্তু তোমার পরণে রঙ্গিন শাড়ী থাকলে আমার মোটে মনে থাকে না যে আমি পঞ্চাশ পার হয়েছি।

মিসেস চাটার্জি উঠে যাচ্ছেন রাগ করে হয়তো। কিন্তু মিঃ চাটার্জ্জি বললেন,

—ভালো করে ওয়াচ রাখ। তোমার মেয়ের মনের গতি তোমার থেকেও সূক্ষ্ম।

—ইন্দ্রজিতের হাতেই ওকে দেব আমি।

—তারপর মেয়েকে নিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে বলছো?

—না, মেয়ে ওকে সংসারী করবে—মেয়ের যা কাজ। শিবকে যা করেছেন গৌরী।

—ভুল করছো। শিবকে গৌরী কোনোদিন সংসারী করতে পারেনি। কোনো পুরাণে এরকম লেখে নি! সিদ্ধি আর সাপের বিষেই

লোকটা বুঁদ হয়ে রইল। তবে ওরা দেবতা, ব্রেড্ প্রবলেম তো সল্ভ্ করতে হয় না, কাজেই চলে যাচ্ছে! এখানে কিন্তু ব্যাপারটা অন্ন-বস্ত্র-আবাস-আভিজাত্যতে কণ্টকাকীর্ণ!

—হোক্—মানুষ যদি মনের সুখে থাকে তাহলে ওগুলোর স্বল্পতা অথবা অভাব মেনে নিতে পারে—অন্ততঃ-আমার মেয়ে নিতে পারবে। তাছাড়া ওগুলোর অভাবই বা হবে কেন? আমাদের যা কিছু আছে, সবই তো ওদের। সবই তো দিয়ে যাব।

—শিবের বাবাও হয়তো বহু টাকার সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিলেন; ভদ্রলোক নেশা করে সবই উড়িয়েছেন, নিশ্চয়।

—শিবের বাবা কেউ ছিলেন না—রেগে বললেন মিসেস চ্যাটার্জ্জি; ইন্দ্রজিৎ নেশাও করে না—চলে যাচ্ছেন তিনি।

—নেশা করে না ইন্দ্রজিৎ! বলো কি? পাঁড় মাতাল। দেশাত্ম-বোধের ব্রাণ্ডির সঙ্গে মনুষ্যত্ববোধের হুইস্কি খায় ও!

কিন্তু মিসেস ততক্ষণ চলে গিয়েছেন।

পশ্চিম বঙ্গে অনেক বাস্তুহারাই এসেছেন, কিন্তু ওঁরা বলেন, যায়গাটা বড্ড বেশী ব্যাকওয়ার্ড—তা' ছাড়া নদী-বহুল দেশের অধিবাসীদের পক্ষে নদী হীন শুকনো রাঙামাটি আর ধূলো কাঁকর সত্যি বিরক্তিকর। যান-বাহন একান্ত দুর্লভ—গরু বা মোষের গাড়ী মাত্র পাওয়া যায় পল্লীগ্রামে; আগের দিনে পাল্কীর চল ছিল, এখনও বিয়ে ইত্যাদি ব্যাপারে এক আধটা দেখা যায়; কিন্তু হলে কি হবে,—সমস্ত অসুবিধা সহ্য করেও এঁরা অনেকে থাকবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। অনেকে আবার কলকাতার কাছা-

কাছি যায়গায় থাকবার জন্য ফিরে গেলেন। অবশ্য কলকাতার কাছা-কাছি থাকতে পারলে সকলেরই ভাল হয়, কিন্তু ওদিকে জমির দাম শুনলে মানুষের মাথা ঘুরে যায়। যাঁরা রইলেন বা থাকবার জন্য জমি কিনে ইট-কাঠ-চুণ-সুরকীর চেষ্টায় ঘুরছেন, তাঁদের সংখ্যাও খুব কম হবে না। 'সেঁজুতি' গ্রামে যারা এসেছেন, তাঁরাই হবেন প্রায় শ' তিনেক। এঁরা প্রায় সকলেই ভদ্র মধ্যবিত্ত, দু চার জন ধনীও আছেন। সুবোধ এই রকম লোকই চায়, কারণ ভোট ইত্যাদি ব্যাপারে, যে কোনো মস্তিষ্ক চালাবার কাজে এবং দরকার হলে যুদ্ধক্ষেত্রেও এঁরা যান সর্ব্বাগ্রে। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরাই বাংলার, তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ;—কিন্তু আজ এঁদের মৃত্যু ঘটতে বসেছে!

আত্ম রক্ষার জন্য অনেক রকম উপায় অবলম্বন করে জীব, যখন তাদের মৃত্যুকাল আসে ঘনিয়ে, তা সে রোগী হোক, ভোগী হোক, যোগী হোক, মৃত্যুকে এড়াবার প্রয়াস মানুষের মর্ম্মকোষে অবিনশ্বর। কাজেই এই মধ্য-বিত্ত শ্রেণীও সে চেষ্টায় বিরত হচ্ছেন না। সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক থেকে রাজনীতিক, বৈজ্ঞানিক, সমালোচক, এমন কি রাষ্ট্রগুরু, লোকগুরু, ধর্মগুরু পর্য্যন্ত জন্মায় এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে—এটা ইতিহাস। কিন্তু বর্ত্তমানে ব্যাপার এমন দাঁড়িয়েছে যে, মধ্যবিত্ত আর টিকবে না; থাকবে ধনী আর শ্রমিক। এখানে শ্রমিক অর্থে শ্রম বিক্রী করে যারা অর্জন করে; মধ্যবিত্তরাও শ্রমই বিক্রি করেন, কাজেই তাঁরা শ্রমিকই, কিন্তু ভারতের বিশিষ্ট দু'একজন সমাজতত্ত্ববিদ নাকি বলছেন যে, মধ্য-বিত্তরা সাধারণ শ্রমিক শ্রেণীতে না আসা পর্য্যন্ত দেশের বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। ভাল কথা, কিন্তু তখন আর মধ্যবিত্তরা মধ্যবিত্ত থাকবেন না—হবেন সাধারণ শ্রমিক। প্রয়োজন আর প্রেস্‌টিজের জন্য যে শিক্ষাদীক্ষা তাদের অর্জন করতে হোত, তার তাগিদ যাবে ফুরিয়ে এবং

গোটা দেশটায় জন কয়েক বিশেষ ভাগ্যবান শিক্ষিত ছাড়া আর সবই হবে সাধারণ ; অবশ্য সাধারণ শ্রমিকে আর মধ্যবিত্ত শ্রমিকে তফাৎ শুধু এই যে, এ পক্ষ বেচে কায়িক শ্রম, আর ওপক্ষ বেচে মানসিক শ্রম। কিন্তু ওরা বলছেন যে এটা অস্পৃতার থেকেও খারাপ। তবে কি মধ্যবিত্তরা সাধারণ শ্রমিক হয়ে প্রতিযোগিতা করবে ওদের সঙ্গে? দেশে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, হাকিম থেকে টাইপিষ্ট, কেরাণী ক্যাসিয়ার পর্যন্ত সবই মধ্যবিত্ত। এখন জজ বা জজের ছেলে যতক্ষণ জুতো পালিস করবার কাজে না আসছেন, ততক্ষণ নাকি সাম্য হচ্ছে না!

সুবোধ এই মতটা বা এই রকম কিছু একটা মত কাগজে পড়ে নিদারুণ উৎসাহিত হয়ে উঠলো। যে কারখানাটা ও এই বছর দুই থেকে গড়ে তুলেছে তার কাজ প্রায় শেষ হয়েছে, এবং ওখানে 'সেজুতি গ্রামের' অনেক ব্যক্তি চাকরীও পেয়েছেন। কারখানা বেশ বড়—এবং আরো অনেক লোক নেওয়া হবে ওখানে ; আপাততঃ শ' খানেক ভদ্র মধ্যবিত্ত রয়েছেন। কারখানাটা চালু হয়ে গেলে একটা বিরাট সম্পদে পরিণত হবে, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ; শুধু সুবোধের সম্পদ নয়, 'সেজুতি গ্রামের' সম্পদ নয়, সারা ভারতের সম্পদ হয়ে উঠবে ওটা। কিন্তু কথা হচ্ছে "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি"—ভাল কাজ করতে অনেক বাধা। যে সব মজুর ওর কারখানায় আসছে উচ্চ হারে দিন মজুরীর জন্য, তারা আগে চাষ করতো ; চাষ এখন বন্ধ করে দিয়েছে ওরা—"অধিক খাদ্য ফলাও" শ্লোগানের শ্রাদ্ধ হচ্ছে ওখানে তাই। সুবোধের নিজেরই আছে হাজার বিঘা ধান জমির চাষ। লাঠির জোরে হয়তো ওর জমিতে ধান পোঁতা হবে, কিন্তু চাষের জন্য যে আন্তরিকতার প্রয়োজন তা চাষাদের নাই আর। অনেক সাধারণ লোকের জমি পতিত পড়ে থাকবে, মনে হয়। সুবোধ ঠিক করলো যে খুব জোর গলায় একটা বক্তৃতা দিয়ে সে ভদ্র মধ্যবিত্ত

ছেলেদের সাধারণ শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত করবে কারখানায়। একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাবে সে ভারতে! বড়দা যদি এই সময় একবার এসে পড়েন তো ভালো হয়। বড়দা কি এখন আসতে পারবেন? তিনি যে ভয়ানক রকম ব্যস্ত আজ কাল! ভাবছে সুবোধ, হঠাৎ মেঘ না চাইতে জলের মত এসে পড়লো লোকাধীশ। বলল, ·

—সবাই ভালো আছে সুবোধ?

—আরে! তুমি!—এসো এসো—কখন এলে ভাই? কোথা থেকে? কলকাতা?

—হ্যাঁ। আপাতত কলকাতা থেকেই—লকু বসলো গদীমোড়া কোচে।

—বড়দার ওখানে যাও নি?

পঠাদ্দশা থেকেই লকুর সাথে তার ভাব এবং বিদ্বেষ-বৈরীতা! আজ স্বার্থের খাতিরে সুবোধ ভুলেই গেল বৈরী ভাবটা ক্ষণিকের জন্য, কিন্তু লকুর সুদীর্ঘ সুন্দর অবয়বটার দিকে ভাল করে চোখ পড়তেই আবার তার মনে জেগে উঠলো প্রতিদ্বন্দ্বীতা, কিন্তু মনের ইচ্ছাকে গোপন করবার কৌশল ভালই আয়ত্ত করেছে সুবোধ এই কিছু দিনের মধ্যে।

—দাদার ওখান থেকে কলকাতায় এসেছিলাম পরশু। আজ ট্রেনে এসে পৌছুলাম এখানে। ভোরেই এসেছি—এখনো কারও সঙ্গে দেখা হয় নি। তুমি আবার বেরিয়ে যেতে পার ভেবে এখানেই এলাম সর্ব্বাগ্রে। তোমার কাজ কর্ম্ম চলছে কেমন?

—ভালো! বড়দার সাহায্য আমি গোড়া থেকেই পাচ্ছি; আশা করি তুমি শুনেছ! তবে, কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি আমাকে যে চিঠি লিখে-ছেন তাতে এমন কিছু কথা আছে যা আমি তোমাকে বলবার পূর্ব্বে জেনে নিতে চাই, তিনি তোমায় কতটা বলেছেন।

—তিনি আমাকে সবই বলেছেন। স্বমতের বিরোধী হলেও আমি তাঁর সহোদর, কাজেই তিনি যা করবেন, তার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে আসবেই। বেশ, আমাকে দিয়ে যা করবার, তুমি করিয়ে নাও! হপ্তা খানেক পরে আমাকে আবার বোম্বাই যেতে হবে!

—বোম্বাই? কেন?

—আমার একখানা বই হিন্দিতে ফিল্ম হচ্ছে ওখানে।

—ও, খুব আনন্দের কথা—সুবোধের চোখটা এক মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠলো যেন।

—বড়দার মতে তোমার অমত হবে না, আমি জানতাম, শুধু আমার ভয় করে বৌদিকে; তিনি কি কিছু শুনেছেন?

—না—বড়দাও তাঁকে কম ভয় করেন না। আপাততঃ তাঁর কাছে এসব গোপন রাখতে হবে, দাদার এই আদেশ!

—খুব ভাল! নইলে সঙ্কর্ষণের মেয়ে হয়তো কর্ষণ করে নিড়িয়ে দেবে আমাদের সব প্ল্যানের আগাছা—সুবোধ সাহিত্যিক ভঙ্গিতে কথা বলবার চেষ্টা করছে। লোকাধীশ বুঝলো এবং একটু হেসে বলল,

—তাকে জানানো হবে না এখন। কাউকেই জানাবার দরকার নেই। তবে আমার মনে হচ্ছে সুবোধ, খুব বেশী দিন এসব চলবে না। জাগ্রত জনমত আজ সক্রিয়।

—হোক, যে কদিন চলে, কিছু করে নেওয়া যাক।

—কিন্তু করে কোথায় রাখবে! তুমি কি মনে কর, চিরদিনই তোমার গোলার ধান দেখতে দেখতে নিরন্ন এই মানুষগুলো কেঁদেই চলবে? কেড়ে নিতে আসবে না? তোমার ব্যাঙ্কের অঙ্ককে মুছে দিতে তাদের কতক্ষণ লাগবে সুবোধ, যেদিন তারা শক্তির দণ্ড হাতে নিয়ে বেরুবে?

—তুমি ভুল করছো একটা ছোট্ট জায়গায়—সুবোধ বললো,—সাধারণ মানুষ জড়ধর্ম্মী। তাদের জড়ত্বকে বিপ্লবের বুলিতে তাতিয়ে কয়েকজন লোক কিছু রোজগার করে—তারা চলে গেলেই ওরা আবার জড় জগন্নাথ হয়ে যায়। এই জড়ধর্মী মন খেয়ে পরে শান্তিতে বেঁচে থাকবার বেশি আর কিছু চায় না। তার ব্যবস্থা অবশ্যই করে দিতে হবে দেশের কর্ত্তাদের…

—কর্ত্তাদের ?

—হ্যাঁ, কর্ত্তা! দেশ যার হাতে থাকে সেই তার কর্ত্তা, হোক তা যুদ্ধ করে অধিকার, হোক তা ভোটের জোরে অধিকার—হোক বহু নায়কত্ব, হোক এক নায়কত্ব—হোক গণতন্ত্র, হোক ধনতন্ত্র, হোক সাম্রাজ্যবাদ, হোক সাম্যবাদ, সাধারণ চিরদিনই সাধারণ! মানুষরূপী হাতিয়ার নিয়ে যারা কারবার করে তারা দুদিনে এটা বুঝে যায়। গণ থাকলেই ধন থাকবে, আর ধন থাকলেই ধনতন্ত্রও থাকবে, কিন্তু যাক—যদি বা আসে সেদিন, যেদিন সব আমাদের কেড়ে নেবে প্রলিটেরিয়েট প্রজার দল,—সাধারণ সাম্যবাদী শ্রমিক, কৃষক, মজুর, সেদিন আমরাও মজুর-শ্রমিক হয়ে যাব, হতে বাধ্য হব—কিন্তু সেদিনের দেরী আছে বহু শতাব্দি।

—দেরী নাই আর; সত্যের আগুন জ্বলেছে,—লকু কথাটা বলে থামলো,—এখানে এসব কথা বলে কোনো লাভ নেই, তাই বললো—যে কনট্রাক্টটা তুমি চেয়েছিলে তা কলকাতা থেকে আমি করিয়ে দিয়েছি, আর কাপড়ের ব্যাপারটাও হয়ে গেছে। সিমেণ্ট আর সুতোর পারমিটও পেয়ে যাবে শীগ্রি। মোড়ল মশাইকে বলো, তাঁর আড়তের চালগুলো যেন এখন না ছাড়েন!

—মোড়ল এসে পড়বে এখুনি! বসো তুমি; চা আর কিছু খাবার যোগাড় দেখি আমি……সুবোধ উঠে ভেতরে গেল। লকুর জন্য বিশেষ

ব্যবস্থা করবে, এইটা জানাতেই সে নিজে গেল ভেতরে, নইলে যাবার কিছু দরকার ছিল না। লকু চুপ করে বসে রইলো; ব্যাটারী সেটে রেডিও চলছে আস্তে আস্তে। বক্তৃতা চলছে, বক্তৃতা মানে—গ্রো মোর ফুড্—না হয় কাপড় কম পর আর চাল কম খাও—কিম্বা আমেরিকানরা ভারতকে কতখানা সম্মানের চোখে দেখে সে সম্বন্ধে সেখানকার বিশেষ দৈনিকের সম্পাদকের প্রাইভেট সেক্রেটারী কুমারী অমুকের সার্টিফিকেট। লকুর ক্লান্ত মস্তিষ্কে বিরক্ত জাগছে। উঠে গিয়ে চাবি টিপে রেডিওটা বন্ধ করে দিল। দেখতে লাগলো সুবোধের সাজানো বৈঠকখানাটা, মেঝে মার্কেলের—দেওয়ালগুলো সুন্দর রঙ করা; মেহগণীর আসবাব ঘরে, দামী দামী আসন, কুশন, আরাম কেদারা। চার খানা দেওয়ালে সব বড় বড় চিত্র নেতাদের। কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টদের গোটা ইতিহাসটা দেওয়ালেই পাওয়া যাবে। হলের মাঝে ছোট্ট একটি মার্কেল টিপয়, তার উপরে মহাত্মা গান্ধীর ডাণ্ডী অভিযানের ব্রোঞ্জমূর্ত্তি। ঐখানেই দাঁড়ালো লকু!

মূর্ত্তিটি সুন্দর—বীরত্ব, ধীরত্ব এবং প্রসন্নতা যেন একই সঙ্গে জেগে উঠেছে মুখে তাঁর! কটিবাস, হাতে ক্ষীণ যষ্ঠি, কিন্তু চরণযুগলে বিশ্ব পরিক্রমণের অপরাজেয় শক্তি যেন। নমস্কার করলো লকু। কিন্তু এখানে কেন এ মূর্ত্তি? কেন? কেন? এই চোর, দস্যু, পরস্বাপহারী, মানব-শয়তানের ঘরে কেন এই মূর্ত্তি! না;—লকু নিজেও আজ কম নয় সুবোধের থেকে শয়তানত্বে কিছু! নিশ্বাসটা পড়লো ধীরে—দীর্ঘ হয়ে,—দাহন করে যেন ওর অন্তশ্চেতনাকে!

এখন আর এ সব ভাবনা বৃথা; লোকাধীশ নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো বৌদির কথা ভেবে। বিশাল কূলহীন পারহীন মহাসমুদ্রে তার দিকদর্শন যন্ত্রটা বিকল হয় নি—নির্ভুল ভাবেই চলছে এখনো। দেখা

যাক, কোথায় গিয়ে পড়ে। মানুষকে মারবার জন্য কত রকমের কত বিরাট বিরাট যন্ত্রপাতি তৈরী করছে মানুষ, কিন্তু মানুষের আত্মাকে হত্যা করতে লাগে কয়েকমুঠো টাকা আর কিছু খ্যাতির উপাধী। বেশী যদি কিছু লাগে তো বোতল কয়েক মদ আর কয়েকটা সুন্দরী নারী। কিন্তু এতদূর আসতে হবে না, কিছু টাকা আর কিছু নাম যশ দিয়েই অনায়াসে আত্মাকে হত্যা করা যায়। ব্যষ্টির আত্মাকে হত্যা করতে পারলে সমষ্টিকে অর্দ্ধমৃত করে করায়ত্ত রাখা কিছুমাত্র কঠিন নয়।

সুবোধ এসে পড়ায় চিন্তাটা আর অগ্রসর হোল না ওর। পিছনে চাকরের হাতে চা-খাবার সমেত এল সুবোধ। লকু দেখে বলল আস্তে,

— অত খাবার কেন? শুধু চা হোলেই হোত।

—তা কি হয় লকু—বসো; বহুদিন দুজনে এক সঙ্গে খাইনি! তারপর তোমার সাহিত্যচর্চ্চা কতদূর এগুলো, শোনা যাক...

—এগুচ্ছে কোথায়! পিছিয়ে আসছে বরং।—লোকাধীশ ক্ষীণ হাসলো।

—কেন? কাগজে পড়ছিলাম, তুমিই নাকি গণ-সাহিত্য সৃষ্টি করছো। ম্লান মূক মুখের ভাষা নাকি তোমার কলমেই ফুটে উঠছে?

—এটা যদি তোমার ঠাট্টা হয়, তাহলে আমি এড়িয়ে যেতে চাই সুবোধ, আর,...

—মাইরি ঠাট্টা নয়। আমি ঐ রকম শুনেছি যেন কার কাছে, হ্যাঁ, অসিত বলছিল।

—এদেশে গণ-সাহিত্যের জন্ম হতে দেরী আছে। গণমনের ভাবকে ভাষায় রূপ দেবার জন্য আগামী যুগের কবিকে আহ্বান জানাচ্ছি আমরা।

—ও, তাই! তিনি তাহলে এখনো আসেন নি?

—না। কিন্তু সাহিত্যের আলোচনা এখন থাক! আমাকে কি

কাজে লাগাবে তুমি, সেইটে বল। শুনে ভেবে দেখি, কতদূর কি আমি করতে পারবো!

—তোমার কাজ তোমার যোগ্য কাজই হবে, ভাবছো কেন? সুবোধ হাসলো।

—আমার যোগ্য কোনো কাজই আমি দেখতে পাই নে। কাজের মানুষ তো নই আমরা। তোমরা বল-বুদ্ধি-ভরসা দিলে চেষ্টা করে দেখতে পারি।

—বেশ, তাই হবে। আজ বিকেলে তোমাকে নিয়ে যাব, ঐ যে ডাঙ্গায় নতুন কলোনী হয়েছে, ঐটা দেখাতে! দেখে খুসী হবে; গ্রামটা ভালই গড়ে উঠলো। গান্ধীজীর পদ্ধতিতে ওখানে বুনিয়াদী শিক্ষা, চরকা সঙ্ঘ, উটজশিল্প ইত্যাদি করানো হচ্ছে। মানে, একখানা আদর্শ গ্রাম তৈরী করার চেষ্টা করছি। আপাততঃ একটা ভালো প্রবন্ধ আর কয়েকটা ফটো কোনো ভাল খবরের কাগজে ছাপাতে হবে। তারপর ওর সংলগ্ন মিল—ভারত সরকারের শিল্প প্রচেষ্টার সঙ্গে অনেক ধনিক যোগ দিচ্ছেন না, কিন্তু আমরা নির্ভয়ে ওটা আরম্ভ করেছি এবং গড়ে তুলেছি। জাতীয় শিল্প সরকারী-করণ হলেও আমরা প্রস্তুত আছি, কারণ ওটা জাতীয় হিতার্থেই উৎসর্গীকৃত।

—থামো! ঐ শেষের লাইনটা না বললেই পারতে! লকুর খাওয়া শেষ হয়েছে।

—ঐটাই তো বলতে হবে, আর ঐটাই তোমাকে লিখতে হবে; ত্যাগের ভণ্ডামী না করলে ভোগের আয়োজন পূর্ণ হয় না—জান তো।

—আচ্ছা, বিকালে আমি আসবো—বলে লকু উঠে পড়লো। ওর মনের অবস্থা এমন যে আর বসতে মন চাইল না। সেজুতির বাড়ীর পানে চলতে লাগলো লকু!

ইন্দ্রজিতকে নিয়ে কাবেরী বেরুলো মোটরে। সিনেমাগৃহের অন্ধকারে ঢুকিয়ে সময়টা নষ্ট করবার ইচ্ছে ওর নেই, কারণ তাতে কথাবর্ত্তা কিছু হবে না। গড়ের মাঠের পানেই গাড়ী চালাতে বললো সে ড্রাইভারকে।

আউটরাম!

চৌরঙ্গীর পাশে তেকোনা ছোট্ট পার্কটায় অশ্বারোহী মূর্ত্তি; সুন্দর! বীরত্ব যেন মূর্ত্তি ধরে আছে। কাবেরী বললো—স্বাধীন ভারতের বোঝা এগুলো আজ!

—কেন? এ-মতটা আপনার নিজের না পরের? ইন্দ্রজিৎ প্রশ্ন করলো।

—পরের। অনেকে বলে। বলে যে ওগুলো আর কেন রাখবো আমরা—ঠিক বলে না?

—আমার ঠিক মনে হয় না। ও-কথা গুলো সস্তা ভাবালুতা! ইংরাজ এই ভারতকে শাসন করেছে দু'শ বছর, এই বিরাট মহানগরী গড়েছে। ক্লাইভ থেকে আরম্ভ করে মাউন্টব্যাটন পর্য্যন্ত তার স্বদেশের আর স্বজাতির জন্য কি অগাধ পরিশ্রম করেছে—ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। ভারতের প্রতি স্তরে, ভারতীয়ত্বের প্রতি পরতে সে তার স্বাক্ষর দিয়ে গেছে। শুধু আউটরাম বা ঐ কয়েকটা মূর্ত্তির ওপর এত রাগ কেন আপনার? ঐ যে বিরাট ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ঐ যে অক্টারলোনী মনুমেণ্ট, ঐ যে হাইকোর্ট; ঐ যে ওয়ার-মেমোরিয়াল—কটা তুলবেন আপনি, আর তুলে নেড়া করে লাভ কি?

—কিন্তু ওগুলো আমরা রাখবোই বা কেন? ঐ সব পরাধীনতার প্রতীক?

—ওগুলো ইতিহাসের পাতা। আউটরাম দীর্ঘ দিন পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেছেন। আজ তাঁর প্রতিমূর্ত্তির উপর দ্বেষ বা হিংসার ভাব পোষণ

করা ভারতীয় সহনশীলতার পরিচায়ক নয়। মৃত বীরের প্রতি শ্রদ্ধাই জানানো উচিৎ আমাদের। তাঁর দেশের জন্য, জাতির জন্য তিনি যথেষ্ট করেছিলেন—আমাদের কাছে সেটা অপ্রিয় হলেও তাঁর বীরত্ব তাতে খাটো হয় নি। তাছাড়া ও মূর্ত্তিগুলো ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন।

কাবেরী চুপ হয়ে গেল। ইন্দ্রজিতের মতের সঙ্গে ওর মত মিলছে না, একটুক্ষণ থেমে বললো—আমাদের ক্ষুদিরাম থেকে নেতাজী পর্য্যন্ত আমরা এখানে বসাবো—আমাদের দেশে বীরের তো অভাব নেই!

—বসান! ইংরাজ তো ছেড়ে দিয়ে গেছে, যত খুসী মূর্ত্তি বসান আপনারা, কিন্তু মৃত বীরদের. তা তাঁরা যে দেশেরই হোন, অশ্রদ্ধা করা ঠিক নয়।

—অনেকে বলছেন কিন্তু যে ওগুলো রাখা উচিৎ নয় আমাদের।

—যাঁরা বলেছেন, তাঁরা যখন-যেমন স্থবিধা পান বলেন। দু'বছর আগে তাঁরাই ঐসব মূর্ত্তির তলায় ফুলের মালা দিতে আসতেন। যখন যে ক্ষমতার মসনদে থাকেন, ওঁরা হন তারই উপাসক। ঐ কয়েকটা মূর্ত্তি তুলে ফেললেই কি ইংরাজের 'কালচারেল কঙ্কোয়েষ্ট' বাতিল হয়ে যাবে, ভাবেন? ইংরাজ ভারতের প্রতি ধূলিকণায় তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রেখে গেছে। সে ছিল, সে এখনো আছে, সে আরো কতদিন থাকবে তা জানা নেই কারো। শোষণ সে করেছে আমাদের, কিন্তু শাসনও সে করতে জানতো। তার আইন, তার শৃঙ্খলা, তার কূটনীতি, কোনটাই কম ছিল না। শক-হূন-পাঠান-মোগল শত শতাব্দিতে যে ভারতকে কৃষ্টিগত জয় করতে পারে নি—ইংরাজ মাত্র দু'শ বছরে তাই করেছে।

—কিন্তু আবার আমরা আমাদের পূর্ব্ব সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করবো।

—করবেন—করতে পারলেই ভাল; ওগুলো তুলে ফেলে বসান আপনা-

দের বীরের মূর্ত্তি কিন্তু কে সে কাজ করবেন, তাই ভাবছি। নেতাহীন দেশ, নিরন্ন অধিবাসী, নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি—কে করবে সেই বিরাট কাজ? কোথায় সেই শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পাঞ্চজন্য বাজিয়ে বলবেন;—যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়—'সর্ব্ব কর্ম্মফল পরিত্যাগ করে যোগযুক্ত চিত্তে শুধু কর্ম্ম কর।' এই কর্ম্মযোগ ভুলে গেছে ভারত আজ।

—কি করে আবার মনে করানো যায়?

—সর্ব্বাগ্রে চাই শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান-বাঁশী—জাতীয় চেতনাকে পুনর্গঠন করতে পারে যে বাঁশরী। যার আবেগ মানুষকে ভুলিয়ে দেবে স্বার্থ, দ্বেষ, হিংসা, লোভ; কামনার উর্দ্ধে নিয়ে যাবে তাকে মহামানবত্বের প্রদীপ্ত পথে। এ সাধনা বীরত্বের নয়, বীর্য্যবানের সাধনা, আপনাকে নিঃশেষে দান করবে যে প্রেমিক, এ তারই সাধনা।

—বীরত্বের থেকে বড়ো সে সাধনা?

—হ্যাঁ। বীরত্বই মানবত্বের শেষ সীমা নয়, তার শেষ সীমা প্রেম। সে প্রেম সব ভুলে শুধু ভালোবাসতেই পারে—সব মানুষের মনের মধ্যে সে শুধু ভালোটুকুই দেখে—বিরোধের মাঝে সে শুধু মিলনকেই ডাক দেয়। ভারতের সাধনা সেই সাধনা, সহস্র অনৈক্যের মধ্যে সে ঐক্যকে করে সুপ্রতিষ্ঠ। বহুর মধ্যে সে দেখে এককে। সেই বিশাল সংস্কৃতির পরিবাহক আমরা আজ তুচ্ছ কয়েকটা পাথরের মূর্ত্তি নিয়ে খবরের কাগজকে কলঙ্কিত করছি। জাতির পরাধীনতার ইতিহাসে ওগুলোর প্রয়োজন—প্রতিমুহূর্ত্তে ওরা স্মরণ করিয়ে দেবে, আমরা পরাধীন হয়েছিলাম—কেন, কি দোষে, তার অনুসন্ধান করবো আমরা—মৃতের উপর অনর্থক বিদ্বেষ পোষণ করা আমার মতবিরোধী।

—আপনার মতের সঙ্গে আমার মত মিললো না কিন্তু—হাসলো কাবেরী।

—না মেলাই স্বাভাবিক। আমি সন্ন্যাসী, আপনি সংসারে ঢুকবার জন্য ব্যগ্র, উন্মুখ হয়ে আছেন।

—কে বললো ?

—বলে নি কেউ, অনুভব করছি নিজেই—ইন্দ্রজিত হাসলো একটু নিঃশব্দে।

—সংসারে আমাকে ঢুকতে হবেই, কারণ আমি বাবা-মার এক সন্তান—অবশ্য, কার হাত ধরে ঢুকবো, আমি জানি নে ; এখানে আমি ভাগ্যের ভরসা করি।

কাবেরী কথাগুলো বললো অত্যন্ত মৃদু আর শান্ত গলায়। এতোটুকু উত্তেজনা নেই ওর মধ্যে। ইন্দ্রজিত লক্ষ্য করলো এই ভাবটা। এতখানা নিস্তেজ ভাবে কোনো শিক্ষিতা তরুণী তার ভাবী জীবনের সম্বন্ধে কথা বলতে পারে, ওর জানা ছিল না। কিছু বিস্মিত হোল, কিছুটা আনন্দিত হোল, বলল,

—মনের এই নিরাসক্তি কর্মযোগের সহায়তা করে খুব বেশি। তবে কার হাত ধরে ঢুকবেন, সেটা নিজেই ঠিক করে নেওয়া উচিৎ এবং যার হাত ধরে ঢুকবেন, তাকেও জানা আর জানানো উচিৎ—।

—জানা হয়ে গেছে, জানানো মুস্কিল।—অতি ক্ষীণ হাসলো কাবেরী।

—তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে কার হাত ধরে ঢুকতে চান, সেটা প্রায় ঠিক করেই ফেলেছেন—এখন ইংরাজি কায়দায় প্রপোজ, এ্যাকসেপ্ট আর এনগেজমেণ্ট বাকি !

—চলুন—ঐ মাঠের ঘাসে একটু বেড়াই। ড্রাইভার, রোখো তো।

কাবেরী জবাবটা এড়িয়ে গেল গাড়ী থামাতে বলে। নেমে পড়ল দরজা খুলে। ইন্দ্রজিত বুঝে গেল সবই। কিন্তু ও ভাবছে আকাশ পাতাল। ভোগী বা বিলাসীর মন নয় তার ; তাহলে অনেকদিন আগেই

কাবেরীকে সে লাভ করতে পারতো। আস্তে গাড়ী থেকে নামতে নামতে বলল,—কবি বলেছেন—"নারীর প্রেমে নরের শুধু আনন্দ নয়, তার কল্যাণ—" কিন্তু এক্ষেত্রে যোগভ্রষ্ট হবার প্রচুর আশঙ্কা রয়েছে; কল্যাণ কি অকল্যাণ হবে. বোঝা যাচ্ছে না।

—বুঝে দরকার নেই; আসুন—কাবেরী এগুলো মাঠের দিকে। নবীন বসন্ত পত্র-পল্লবে নাম লিখে যাচ্ছে রক্তশ্যাম মসীতে, লতাকুঞ্জ অভিসারিকার মত সেজে উঠলো; দূরের একটা ক্লাবের আঙ্গিনায় অসংখ্য মরশুমী ফুলের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা দেখা যাচ্ছে। অস্ত সূর্য্যের রশ্মি এসে লেগেছে কাবেরীর কপোলে; ওর তন্বী দেহবল্লরী যেন স্নান করতে নেমেছে মাঠের সবুজ সায়রে—ইন্দ্রজিত পিছনে পিছনে আসতে লাগলো।

খানিকটা গিয়ে একটি পাথরের বেদী, তার উপর কোন রাজপুরুষের মূর্ত্তি। বসলো গিয়ে কাবেরী; ইন্দ্রজিতও বসলো পাশে। কাবেরী ব্যাগ খুলে নেলকাটার বের করলো, নখ কাটবে। ইন্দ্রজিত হেসে বলল,

—কথাটা যখন উঠে পড়েছে তখন ওটা শেষ করে ফেলা যাক্।

—থাক, বাদ দিন; কাউকে যোগভ্রষ্ট করবার জন্য তপস্যা করছিনে আমি।

—কিন্তু ভারতের নারীরা যুগে যুগে তাই করে এসেছে; সেই উমার তপস্যা থেকে।

—আমি উমা নই, আমি কাবেরী, জলপ্রপাতে সব ভেঙ্গেচুরে দিয়ে যাই।

—তাহলেই তো যোগভ্রষ্ট হতে হোল—হাসলো ইন্দ্রজিত—অতদূর থেকে এই জলপ্রপাতের টান টেনে এনেছে আমায়—কিন্তু এখনো আমি ডাঙায়।

—থাকুন ডাঙাতেই ! কে আপনাকে জলে নামতে বলছে !— ওর কণ্ঠে অভিমানটা এত বেশি স্পষ্ট যে ইন্দ্রজিত আশা করেনি। একটু ভেবে নিয়ে বলল,

—ডাঙায় থাকা যাচ্ছে না, জলেও নামা যাচ্ছে না— অতি সাংঘাতিক অবস্থা।

কাবেরী নখ কাটতে লাগলো বসে বসে। কোনো জবাব দেবার ওর ইচ্ছা নাই, দেবার মত কথাও কিছু নাই। ইন্দ্রজিতও চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। কিন্তু চুপ করে থাকাটা অন্যায় হচ্ছে। অবিচার হচ্ছে একটি তরুণী হৃদয়ের প্রতি। এটা অনুভব করতে ইন্দ্রজিতের মত ভাবুক পুরুষের বেশি সময় লাগে না। বলল,

—হেঁয়ালী ছেড়ে সোজা কথায় আসা যাক ; আমার মত নিরাসক্ত মানুষকে দিয়ে ঘর বাঁধা কি চলবে ?

—অহঙ্কারটা একটু কম করবেন। মানুষ আবার নিরাসক্ত হয় কোথায় ? গীতা আওড়ালেই শ্রীকৃষ্ণ হয না কেউ। আসক্তি সৃষ্টিতে ওতোপ্রোত ! ঐযে ঘাস, মাটিতে লেগে আছে বলেই বেঁচে আছে, বাড়ছে ; ঐযে সূর্য্য, পৃথিবী তার টানে নিজকে প্রস্ফুরিত করে ; এই যে মানুষ, পৃথিবীকে ভালবাসে বলেই গীতার ভাষ্য তাব দরকার নিজকে প্রবুদ্ধ করতে, প্রকাশিত করতে, প্রসারিত করতে !

কাবেরীর কথাগুলো যেন তাপহীন আলোকের কণা। ইন্দ্রজিৎ কথা বলতে পারলো না কিছুক্ষণ কিন্তু কথা তার বলা উচিত ; বলল,

—এ কথা নিয়ে তর্ক অনেক করা যায়, কিন্তু আমি করতে চাই না।

—কেন ? করুন না তর্ক !

—থাক—আত্মসমর্পণ করাটা তর্ক করার চাইতে ভাল মনে হচ্ছে ! ওর হাত থেকে নখকাটার যন্ত্রটা টেনে নিল ইন্দ্রজিত। বলল,

—মতের দ্বন্দ্বে যদি মনের দ্বন্দ্ব না ঘটে তাহলে তর্কটা ভালো ; নতুবা ওকে বাড়তি নখের মত ছেঁটে ফেলা উচিৎ—নিজের নখ কাটতে আরম্ভ করলো ইন্দ্রজিত। কাবেরী কিছু বললো না, ও যেন কিছুর প্রত্যাশায় বসে আছে ; কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেল, ভ্রমণবিলাসী বহুলোক চলে গেল সামনে দিয়ে ; দেখে দেখে গেল তারা কাবেরীকে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই। ইন্দ্রজিত নখ কাটছে নিজের। কতকাল নখ কাটেনি ও ? নখই কাটবে নাকি ? কাবেরী অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে। বলল,

—আর নেই নখ ; চলুন বাড়ী যাই।

—বাড়ী নয়, আমাকে উৎপলাদির আশ্রমে যেতে হবে।

—কেন ? সেখানে কেন আবার ? —নিজের অজ্ঞাতসারেই বলে উঠলো কাবেরী।

—ওখানে তো উঠেছিলাম। সকালে যাব বিহারীনাথ, গুরুদেবের চরণবন্দনা করতে ; উৎপলাদির আশ্রম থেকেই যাব।

—চলুন, পৌঁছে দিই। কিন্তু বাড়ী থেকে কাল সকালে ট্রেণ ধরলে কি ক্ষতি ছিল ?

—পলাদির সঙ্গে কিছু কথা আছে।

—ও—চলুন !

গাড়ীতে এসে উঠলো কাবেরী আগেই, ইন্দ্রজিত হয়তো ওকে তুলে দেবে কিম্বা দেবে না, কে জানে। যদি না দেয় তো সে দুঃখ সহ্য করতে রাজি নয় ও। সটান এসে বসলো আসনে। ইন্দ্রজিতও এল, হাতে সেই নেলকাটারটা। কাবেরী কোণের দিকে ঠেস দিয়ে বসেছে, আধ-শোয়া অবস্থা, অনায়াসে ও ঘুমিয়ে যেতে পারে ওখানে। দেখলো ইন্দ্রজিত, তবু চুপ করে রইল। এটা কি পরীক্ষা হচ্ছে নাকি কাবেরীর নিষ্ঠার উপর ! কাবেরী কাঠ হয়ে বসে রইল।

গাড়ী এসে পৌছাল উৎপলার আশ্রম-দরজায়। কৃষ্ণা বেরিয়ে কাবেরীকে দেখে বলল—নেমে আসুন—আসুন!

—আমি আর যাব না কৃষ্ণাদি! বাড়ী ফিরতে হবে। একটু তাড়া আছে।

ওজরটা দিয়েই কাবেরী ড্রাইভারকে আদেশ দিল গাড়ী ফেরাতে। ইন্দ্রজিত গাড়ী থেকে নেমেছে। এতক্ষণে বলল,

—আমি খুব সম্ভব বুধবার ফিরবো, আজ শুক্রবার ; মাকে বোলো।

—কাবেরী কথাটা শুনতে পেল কিনা বোঝা গেল না। গাড়ী চলতে আরম্ভ করেছে। ইন্দ্রজিত অতটা এগিয়ে আর কিছুই বললো না বা কিছুই করলো না কেন? লোকটা স্বপ্নেই বাস করে—মানুষ, না কি অতিমানব ও! কাবেরীর মত অপূর্ব্ব সুন্দরী তরুণীর হাতখানা পর্য্যন্ত ধরলো না ও একবার এতখানা কাছাকাছি এসেও। একি সংযম, নাকি অবহেলা, নাকি পরীক্ষা কাবেরীর নিষ্ঠার উপর? কোনটা সত্যি? কাবেরী কিছুই ঠিক করতে পারলো না। বাবার কাছে বলেছে, ইন্দ্রজিতকে সে বিয়ে করতে চায় না ; সে একটা স্বপ্ন শুধু। ঘর বাঁধা যায় না তাকে নিয়ে। কথাটা খুবই খাঁটি বলেছে কাবেরী, ওকে নিয়ে সত্যি ঘর বাঁধা যায় না। কাবেরী আর ওকে বাঁধতে চাইবে না। ও যেমন ধর্ম্মের ষাঁড় আছে, থাক। বিয়ে না হয় করবেই না কাবেরী। কিইবা বয়ে যাবে তাতে? ভালো যাকে বাসে না, তাকে বিয়ে করা সম্ভব নয় তার পক্ষে, আর যাকে ভালোবাসে সেতো ঐ…

কখন কে জানে কাবেরীর চোখ জলে ভরে উঠেছে—মুছলো আঁচলে।

পরকে আপন করে নেওয়ার শক্তি ছিল ভারতবাসীর ; সেই শক্তিবলে সে আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে আজ শত শতাব্দি কত বিদেশীর কৃষ্টিধারাকে আপনার স্বত্বায় পরিপাক করে নিয়েছে, অথচ আপনাকে রেখেছে স্বপ্রতিষ্ঠ, সুপ্রতিষ্ঠিত...কিন্তু...

রাবণ মাঝির বাড়ী যাবার পথে ভাবছিলেন সন্ন্যাসী। পথ একান্ত নির্জ্জন, কদাচিৎ এক আধজন পথচারী, ঐ দেশীয় লোক যাচ্ছে আসছে ; কিন্তু সন্ন্যাসী আশ্চর্য্য হয়ে শুনলেন, কয়েকজন যেন কোথায় কথা বলছে এই বিজন বনে, বাংলা কথা, মার্জিত কথ্যভাষা। কারা কয় ? বিস্মিত হয়ে উনি এগিয়ে গেলেন সেই দিকে, কথাগুলো যেদিক থেকে আসছিল। গিয়ে দেখলেন, চারজন যুবক আর তিনটি যুবতী ; প্রত্যেকের হাতে কিছু না কিছু রয়েছে। ওরা কি বাস্তুহারা কিম্বা পথ হারিয়ে ফেলেছে এই জঙ্গলে ? সন্ন্যাসী আরো কাছে গিয়ে শুধুলেন,

—আপনারা কোথায় যাবেন ? পথ হারিয়েছেন কি ?

—হ্যাঁ, আপনি বলতে পারেন, হরিপুর কোনদিকে যাব ?

—হরিপুর ? সে তো অনেকদূর এখান থেকে। প্রায় আট দশ মাইল, রাস্তাও ভাল নয়, সন্ধ্যে হয়ে আসছে, আজ আপনারা যেতে পারবেন না। সেখানে কে আছেন ?

—থাকেন আমাদের একজন আত্মীয়—যাবার কি বাস বা গাড়ী কিছু নেই ?

—বাস আছে, কিন্তু সে তো এ রাস্তায় নয়—সন্ন্যাসী বিশেষ চিন্তিত হোলেন ওদের জন্য।

—তাহলে কি করি বলুন তো এখন ! আপনি কোথায় যাবেন ?

—আমি ঐ সামনের গাঁয়ে যাব—ওর নাম ঘুরুষকাটা। কিন্তু ওখানে সব বাসিন্দাই সাঁওতাল। আপনারা যদি ইচ্ছে করেন তো

আজকার রাতটা ওখানে থেকে যেতে পারেন। ওরা খুবই অতিথি-বাৎসল; তবে ওদের সম্বল বড় কম। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা বিশেষ কিছু হবে না, শোবারও নয়, মাত্র নিরাপদে রাত কাটাতে পারবেন।

—বর্ত্তমানে ঐ যথেষ্ট, চলুন। আপনাকে ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন!

—ঠেকায় না পড়লে কেউ ভগবানকে ডাকে না বাপু—বললেন একটি মেয়ে।

—তাতো বটেই, বিপদেই মধুসূদনকে ডাকতে হয়। —উত্তর দিলেন আগের ব্যক্তি।

—সম্পদের সময়ও ডাকতে হয় বাবা—সন্ন্যাসী বললেন যেতে যেতে; তোমরা নিতান্ত ছেলে মানুষ, 'আপনি' না বললে রাগ করবে না তো?

—কি যে বলেন! বাবার বয়সী আপনি, তুমি কেনো, তুই বলবেন আমাদের।

—তা বেশ, তোমরা কেন এ পথে এলে! এদেশে কী প্রয়োজন তোমাদের? আমি সন্ন্যাসী, তোমাদের কোন অমঙ্গল হবে না আমার দ্বারা, বলো।

—বলা একটু মুস্কিল সন্ন্যাসীঠাকুর। তবে আপনাকে না বলাও অন্যায়। এই যে মেয়ে তিনটি দেখছেন, ওরা অপহৃতা হয়েছিল বছর দুই আগে। অনেক কষ্টে ওদের খুঁজে আমরা বের করেছি, কিন্তু আততায়ীর দল এখনো নিশ্চিন্ত নেই। তাই আমরা নিরাপদ কোনো যায়গায় ওদের দিন কতক রাখতে চাই। হরিপুরে ঐ মেয়েটির কাকা ডাক্তারী করেন; তাঁরই ওখানে ওদের রাখবো কিছুদিন; তারপর সুযোগ সুবিধামত কোনো আশ্রমে নিয়ে যাব।

—আশ্রমে কেন? বাড়ীতে নিয়ে যাবে না?

—বাড়ীতে! বক্তা যুবকটি যেন চমকে থেমে গেল, বলল—না, বাড়ীতে আর ঠাঁই হবে না।

—তাহলে উদ্ধার করলে কেন? যা হবার হোত সেই দস্যুদলের হাতেই। অপহৃতা মেয়েকে বাড়ীতে নেবার যার ঔদার্য্য নেই, সাহস নেই, উদ্ধার করতে যাবার বীরত্ব তার না দেখালেও চলতো!

—দেশের বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থা···যুবকটি বলতে গেল।

—রাখ তোমার সমাজব্যবস্থা। ব্যবস্থার কথা শুনছে কজন? আমাদের যে সংহিতা অর্থাৎ সমাজ-শাসনতন্ত্র—মনু-রঘুনন্দন প্রত্যেকেই অপহৃতা মেয়েকে ঘরে নেবার আদেশ দিয়েছেন। দেশাচারের মারাত্মক ভুলটাই চালাচ্ছো তোমরা। কিন্তু ইতিহাস জানো···?

—আজ্ঞে!

—মগ-দস্যুদের আমলে সারা বাংলাদেশের এমন বড় ঘর ছিল কমই, যেখান থেকে মেয়ে অপহৃতা বা বলাৎকারিতা না হয়েছিল। তখন সমাজ ছিল জীবিত, তাই সমাজ সঙ্গে সঙ্গে আইন করেছিল যে, ও-সব মেয়েকে সমাজে নিতে হবে। আজকার কৌলীন্যগর্ব্বী বিস্তর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য তাদের বংশধর। সমাজকে তোমরা মেরে ফেলেছ, আবার সমাজের কথা বলো কোন লজ্জায়? ওদের বাড়ী নিযে যাও—নির্দ্দোষী, নিরপরাধ মেয়েগুলোকে আশ্রমে ভাসিয়ে দেবার কথা মুখেও এনো না। নারী চির কল্যাণী,— 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতা'—ওদের অবহেলা করার অর্থ, তোমার এবং তোমার সন্ততির আর তোমার সমাজের মৃত্যু ঘটানো।

নিঃশব্দে চলতে লাগলো ওরা কোনো কথা না বলে। শুধু মেয়ে তিনটি সন্ন্যাসীর কথাগুলো শুনে কাঁদতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে ওদের একজন বলল,

—থাক্ ঠাকুর; ওদের মন যদি না চায়, তাহলে গিয়ে কি হবে!

ওভাবে তো ঘর বাঁধা যায় না! ওরা আমাদের ঘরে নেবে না জানলে আমরা আসতাম না। যা হবার হোত সেইখানেই। খেতে তারা দিত—না দিত তো না খেয়ে না হয় মরে যেতাম।

—কেঁদো না মা, ওরা যদি তোমাদের ঘরে না নেয়, তোমাদের আমি দেশের কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করবো—কিন্তু ওরা কেন নেবে না ঘরে, কেন নেবে না?

প্রশ্নটা নিজকেই যেন করলেন সন্ন্যাসী; কারণ কেউ উত্তর দিল না। চারজনের একজন এ'দের কেউ নয়; সেই সন্ধান দিয়েছিল। গুপ্তচর সে।

—আমার টাকাকটা দিলে আমি ঐ মোটরবাসখানা ধরে চলে যাই—সে বলল।

—হ্যাঁ—আপনাকে টাকা দিচ্ছি। বলে ওদের মধ্যে যে বড়, সেই দশখানা দশ টাকার নোট গুণে গুণে দিল গুপ্তচরকে। সরকারী গুপ্তচর নয় ও। সুযোগমত সন্ধান দিয়ে কিছু টাকা উপার্জ্জন করে নিল। মোটর-বাসখানা আসতেই সে তাতে চড়ে উল্টো পথে চলে গেল। এরা চলতে লাগলো সাধুর সঙ্গে।

সাধু নীরবে চলেছেন কিন্তু এরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। ওরা যে যথেষ্ট শিক্ষিত, তা ওদের কথাবার্ত্তায় বেশ বোঝা যায়; অন্ততঃ ওরা ইংরাজি ভালোই জানে। মেয়েগুলি একান্ত নিঃশব্দে চলেছে। সাধু হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—তোমাদের সঙ্গে এত সব জিনিষপত্র কোথা থেকে এলো?

—ওতে পরণের কাপড়-জামা আছে ঠাকুর, বিশেষ অন্য কিছু নাই!

সাধু আর কিছু বললেন না, কিন্তু তাঁর দারুণ সন্দেহ হতে লাগলো। কাঁদছিল মেয়েগুলো কিছুক্ষণ আগে. কিন্তু সাধু যখন ওদের কথা প্রথম শুনে খোঁজ করেন ওদের, তখন ওরা কেউ কাঁদছিল না, বরং হাসছিল। ব্যাপারটা নিতান্ত রহস্যময়। যে লোকটা টাকা নিয়ে চলে গেল, সেই

বা কে? ভাবতে ভাবতে সাধু পৌঁছুলেন রাবণ মাঝির ঘরে। ঘরেই ছিল রাবণ; আদর করে সাধুকে সে গ্রহণ করলো এবং এদেরকেও যাথাযোগ্য আপ্যায়ন করলো। কিন্তু সন্ন্যাসীর দারুণ সন্দেহ হয়েছে এদের উপর। ওরা নিশ্চয় মিথ্যে কথা বলেছে তাঁকে। ওরাই হয়তো এই মেয়েগুলিকে অপহরণ করেছে। বিগতযুগের বিপ্লবী মন জেগে উঠলো সাধুর মধ্যে। সেই অনুশীলন সমিতি, শ্রীঅরবিন্দের যুগ—লাটকে মারবার জন্য বোমা হাতে ঘুরে বেড়ানো, বনে জঙ্গলে পালিয়ে আত্মরক্ষা; গুপ্তচরদের উপর গুপ্তচর বৃত্তিতে শিক্ষালাভ। সাধু দাড়ীর আড়ালে হাসলেন একটু—আচ্ছা, দেখা যাবে!

রাবণ মাঝির সঙ্গে প্রাথমিক কথা-বার্ত্তার পর উনি নিখুঁৎ সাঁওতালী ভাষায় জানিয়ে দিলেন তাকে যে এরা যেন পালিয়ে না যেতে পারে। সারা রাত পাহারার ব্যবস্থা যেন করা হয়। রাবণ হেসে বলল,—হবে। অতঃপর রাবণের কাছে খোঁজ খবর নিয়ে উনি জানলেন যে, এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে নিদারুণ অসন্তোষ জেগেছে। তাদের দাবী দাওয়া যদি অবিলম্বে পূরণ না হয় তো, তারা কি করবে, তা এখনো ঠিক করে নি, কিন্তু ঠিক করতে দেরী হবে না। তারা বাংলা কথাই বলে, কিন্তু বর্ত্তমানে হিন্দি শিখতে হবে এবং হিন্দুস্থানী হতে হবে, এই রকম নাকি আদেশ!

চিড়ে দৈ যোগাড় করে দিল রাবণ। দুধও দিল; পেঁপে পাকা আর বনজ দু'একটা ফল তার সঙ্গে। আখের গুড়; সুন্দর গন্ধ তার। সবাই বেশ উদর পূর্ণ করে খেয়ে একটা ফাঁকা ঘরে শুলো। সন্ন্যাসী কিন্তু ওখানে শুলেন না। বললেন যে তাঁর তপ জপের জন্য আলাদা যায়গা দরকার।

নিস্তব্ধ রাত্রি। যুবক তিনজন যে ঘরে আছে, তার পাশের ঘরে আছে মেয়ে তিনটি। মেয়েগুলি ঘুমুচ্ছে। কিন্তু কগুলি মৃদু গলায়

কথা বলছে, কথাগুলো বেশির ভাগ ইংরাজিতে; অবশ্য বাংলাও বলছে,

—খাওয়া তো দিব্যি হোল, এখন যাওয়ার ব্যবস্থা; ঠিক তিনটের সময় জীপ আসবে।

—ঘুমুনো চলবে না। অনেকখানা এসে পড়েছি, প্রায় দুমাইল। চ'ল, উঠে আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়া যাক। ওঠা ছুঁড়িগুলোকে—যা...

—তিনটে মেয়ের জন্য কত টাকা দেবে বলেছে ওরা?

—আমরা দশ হাজার চেয়েছি; ওরা ছ' হাজার অবধি উঠেছে।

—জীপে তুলে দিলেই তো আমাদের কাজ ফতে?

—হ্যাঁ—তো আবার কি? তারপর উল্টো বাস ধরে সটান রামপুর-হাট—কলকাতা।

—ওদের নিয়ে কোথায় যাবে তারা?

—চুলোয় যাক, জাহান্নমে যাক না, তোর কি? টাকাটা পেলেই হোল আমাদের।

—রাত এখন কত, দেখতো ঘড়িটা?

টর্চ টিপে ঘড়ি দেখে লোকটা বললো—দুটো বাজতে পঁচিশ মিনিট। যা, আর দেরী নয়। রাস্তা চিনে যেতে হবে ঠিক। জ্যোস্না আছে।

—রিভলভার ঠিক আছে কি না, দেখে নে—বলে লোকটা মেয়েদের উঠাতে গেল।

সাঙ্ঘাতিক! সবটাই শুনলেন সন্ন্যাসী বাইরের জানালায় দাঁড়িয়ে। নারী-ব্যবসায়ী এরা; এই মেয়েগুলিকে বিক্রী করবে কোথায়! কিন্তু মেয়েগুলোও তো বেশ যাচ্ছে! ভেতরে আরো কিছু ব্যাপার আছে। কিন্তু এখন তিনি কি করবেন? ছেড়েই দেবেন, নাকি আটকে ফেলবেন ওদের? ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। এই পাপ ব্যবসা চলছে তাহলে দেশের মধ্যে!

চমৎকার! কিন্তু এদের সঙ্গে রিভলভার আছে, সন্ন্যাসী নিরস্ত্র। অবশ্য রাবণ আর তার সঙ্গীদল আছে। সময় বেশী নেই। ওরা এখনি বেরুবে। সাধু তাড়তাড়ি গিয়ে রাবণ মাঝিকে বললেন সব কথা এবং হুঁশিয়ার করে দিলেন যে ওদের সঙ্গে রিভলভার আছে। রিভলভারকে ভয় সাঁওতালের ছেলে করে না। আর্য্য যুগের ক্ষত্রিয় এরা, নির্ভয়ে বেরিয়ে এল সব; এদের দলটি তখন সবে মাত্র বেরিয়েছে ঘর থেকে। বনের গাছের আড়ালে চললো সাঁওতালরা ওদের অলক্ষ্যে। মাঝে একটা ছোট নদীর মত, শুকনো, তবে খালটায় নামতে হবে। ওরা থেমে এদিক-ওদিক দেখে নিল। কথা কিছু হচ্ছে না ওদের মধ্যে। ওরা খালটা পার হচ্ছে নিঃশব্দে। মেয়েগুলো একটু পিছনে পড়েছে; এই ঠিক সময়, সন্ন্যাসী সংকেত করলেন। দুর্দান্ত সাঁওতালগণ মেয়ে তিনটিকে ঘিরে ফেললো মুহূর্ত্তেই—কিন্তু যুবকরা তখন খালটা অতিক্রম করে গেছে। একনিমেষে ওরা দেখে নিল, তার পর দুম্ দুম্ দুম্ তিনটে গুলি চালালো। কিন্তু সাঁওতালদের সংখ্যা অন্ততঃ পঞ্চাশ—তারা ছুটে চলেছে ওদের ধরতে। ব্যাপার দেখে যুবকরা ছুটলো। গভীর বন, কোথায় কোন দিকে কে যাচ্ছে ধরা মুস্কিল। পাকা রাস্তাটাও দূরে নয়; দেখা গেল, তীব্র হেডলাইট জ্বেলে একখানা জীপগাড়ী আসছে; মুহূর্ত্তের জন্য থামলো সেটা, পর মুহূর্ত্তেই উধাও হয়ে গেল বিদ্যুৎবেগে। যুবক তিনটে পালালো কিন্তু মেয়েগুলো ধরা পড়েছে। একটা গুলি লেগেছে একজন সাঁওতালের গায়ে। সন্ন্যাসী প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। তারপর মেয়েগুলোকে শুধুলেন,

—কিসের লোভে তোমরা ওদের সঙ্গে যাচ্ছিলে?

—লোভ নয় বাবা, আমাদিকে চুরি করে এনেছে। যা বলতে শিখিয়েছে তা না বললে, মারবে—ওদের হাতে পড়ে কত যে লাঞ্ছনা চলছে আমাদের!

কাঁদতে লাগলো মেয়েগুলো হাপুস নয়নে। তাদের সান্ত্বনা দেবার মত কথা খুঁজে পাওয়া যায় না। কী ভয়ঙ্কর দুর্দিন এসেছে আজ ভারতে! অক্ষম রাজশক্তি এই অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে; অসক্ত পুরুষ এর প্রতিকার করতে; মৃত সমাজ এর প্রতিবিধান করতে। কে জানে, কি আছে এই জাতির ভবিষ্যৎ ভাগ্যে! হয়তো সব জাতিটাই মুছে যাবে, বিশেষ করে বাঙালীজাতি। আপন দেশের মা-বোনকে বিক্রী করে এরা অর্থার্জ্জন করতে দ্বিধা করে না। আশ্চর্য্য! এরাই জাতি আর জাতীয়তার বুলি বলে চীৎকার করে সভা-রাজপথ মুখর করে! নিজকে হত্যা করতে বসেছে আজ বাঙালী—এতো নৈতিক অধঃপতন বোধ হয় আর কোনো প্রদেশে ঘটে নি! অথচ এই বাংলাই জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, স্বাদেশিকতার পুণ্যতীর্থ—বঙ্কিম-বিবেকানন্দের বাংলা, রবীন্দ্র-অরবিন্দের বাংলা, চিত্তরঞ্জন-সুভাচন্দ্রের বংলা—আজ সেই বাংলায় মানুষ কৈ? নেতা কৈ? নীতি কৈ! শুধু দুর্নীতি—ভাঙনের বন্যার মুখে কয়েকটা বুদ্ধিজীবী, শঠ লম্পটের কয়েকখণ্ড সোনার চর অধিকার করে রাখার চেষ্টা, যে চর সোনার হলেও গলিত স্বর্ণের—অগ্নিবৎ—মৃত্যুবৎ! জাতিকে জন্মের মত অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে এরা সোনার চর দখলে রাখতে চায়—এই বাংলা, এই তার বাঙালীয়ানা। সারা ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে এর বিচার চলে না—বাঙালী জাতিকে তার নিজস্ব রূপ বজায় রেখে, নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সুপ্রতিষ্ঠ থেকে ভারতীয়ত্ব অর্জন করতে হবে—এটা প্রাদেশিকতা নয়, এর নাম বাঙালীয়ানা। কিন্তু বাংলাকে মরণোন্মুখ করা হয়েছে। বিধাতার অভিশাপ—মন্বন্তর, যুদ্ধের ভীষণ দাপট, গৃহবিবাদের রক্তস্রোত, তার পর অঙ্গের খণ্ডন, তারো পরে আপন সন্তানদের কাছ থেকে বাংলা মা আজ পাচ্ছেন কৃতঘ্নতার অভিশাপ। দেশের সম্পদ নারীকে তারা পরদেশীর কাছে বিক্রী করতে যায়—সমাজকে তারা

সুযোগমত ব্যবহার করে আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য—এমন যে তাদের ভাষা, তারও মর্য্যাদা তারা বিক্রী করে অর্থের বিনিময়ে—ভীরু, কাপুরুষ বাঙালী আজ তারস্বরে বলতে পারে না, তার ভাষা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা! ভারতের রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা যদি যোগ্য ভাষাকে দেওয়া হয়, তা হলে সেটা বাংলা—কিন্তু কে বলবে সে কথা? ভাষাসেবী বাংলা-দেশের নেতৃমণ্ডলী হিন্দির নাম উচ্চারণ করলে পাবেন অর্থ, সম্মান, পদগৌরব—অতএব 'আমরি বাংলা ভাষা' মাথায় থাক—কিছু নাম খাতির, অর্থ করে নেওয়া যাক এখন। এই এদের মনস্তত্ত্ব!

মৃত্যুমুখী বাংলায় আজ মানুষ নাই। দক্ষিণপন্থী আছেন, বামপন্থী আছেন, সোস্যালিষ্ট আছেন, কমিউনিষ্ট আছেন, আরো কত কি পন্থী আছেন, হিসাব করা যায় না,—কিন্তু নিষ্ঠাবান স্বদেশসেবক কোথায়? এঁরা সব পন্থী—ঝাণ্ডা উঁচিয়ে পন্থে পন্থে পরিভ্রমণ এদের কাজ—কিন্তু পথের শেষে কে নিয়ে যাবেন যেথানে আরাম, শান্তির আরাম, সজ্ঘের আরাম—যেথানে তথাগতের অমৃতময়ীবাণী উচ্চারিত হবে···নিব্বাণং! আনন্দ যেথানে আনন্দিত হয়ে উথলে উঠবে আবেগে—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সজ্ঘং শরণং গচ্ছামি!

বাঙালী তান্ত্রিকের শব-সাধনা বীরের সাধনা; এই বীর প্রেমিক হয়ে দেখা দিল শ্রীচৈতন্যে, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে প্রেম বিলালেন নদীয়ার ঠাকুর; পাষণ্ড প্রেমিকরাজ হয়ে উঠলো। বাঙালী সেই সুবিশাল সংস্কৃতির পরিবাহক। সুদূর দাক্ষিণাত্যে, শ্রীক্ষেত্রে, ত্রিবন্দ্রমে, ত্রিবাঙ্কুরে উনি শুনে এসেছেন, বাঙালী কবি জয়দেবের অমৃতময়ী কাব্য—'নামসমেতং কৃত সংকেতং'···বরবদুর—সিংহল, মালয় পর্য্যন্ত যে সংস্কৃতিধারাকে বিস্তার করেছিল বাঙালী, তিব্বত, চীন, কম্বোডিয়ায় যার সংস্কৃতিগরিমা আজো অনির্ব্বাণ, সেই বাঙালী আজ মরতে বসেছে জাতিগত বৈশিষ্ট্যে।

কিন্তু এখনো আশা আছে, এখনো বাঙালীর ছেলে বিপ্লবী অরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে তপস্যারত, তাঁর ধ্যানশান্ত মুখে জ্বলছে প্রভাত-কিরণের মত জ্যোতি, যে জ্যোতিতে বিশ্ব আবার আলোকিত হবে, পুলকিত হবে, পরিপূর্ণ হয়ে যাবে গৌরবে। মানুষকে মনুষ্যত্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সাধনা করে তিনি মহামানবের আবির্ভাব ঘটাবেন। এই যে অন্ধকার—এ-বুঝি সেই ভাবী সন্তানের জন্য জননী ধরিত্রীর প্রসব বেদনা-রাত্রি…।

ভোর হয়ে গেল। মেয়েগুলি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠে বসলো একজন ধড়মড়িয়ে। ওরা সকলেই বিশেষ সুন্দরী—বাছাই করেই ধরেছিল নিশ্চয় ওদের। সন্ন্যাসী বললেন,

—কেঁদো না মা, যাও, হাত মুখ ধোও! তোমাদের আমি বাড়ী পৌঁছে দেব।

—বাড়ীতে কি আর নেবে বাবা আমাদের?

—নেবে! যদি না নেয় তো তারও ব্যবস্থা আমি করবো। ভেবো না।

কিন্তু কি ব্যবস্থা করবেন, সন্ন্যাসী নিজেই জানেন না। শুধু সান্ত্বনা দিলেন। ওরা উঠে কাছের পুকুরটায় গেল। সন্ন্যাসীও অন্য দিকে গেলেন প্রাতঃকৃত্য করবার জন্য। ফিরে এসে দেখলেন, রাবণমাঝি এবং আরো কয়েকজন বসে আছে তাঁর অপেক্ষায়।

—আয় সাধুবাবা, আমাদিগে কি করতে হবেক, বল দেখি—রাবণ শুধুলো।

—কিসের কি? সাধু ব্যাপারটা বুঝেও প্রশ্ন করলেন।

—এই যে গো, সব লুক আসছে, বলছে, চাষ আবাদের কথা, ভাগ-

ভৃত্যের কথা, মহাজনী, দেড়েবাড়ী সুদ-উশুলের কথা সব। আমরা সব "আসামী" হয়ে থাকি যে।

হাসলো রাবণ কথাটা বলতে বলতে। এখানে আসামী অর্থে দেনদার অর্থাৎ চাল বা ধান কারো কাছে ধার নিলে আসামী হতে হয় এবং যথাকালে শোধ করতে হয় দেড়া। লেখাপড়া বা আইন আদালতের কোনো প্রশ্ন নেই এখানে; এরা এমনি ধর্ম্মভীরু যে সুযোগ পাবামাত্র মহাজনের দেনা শোধ করে আসে।

শুনলেন সন্ন্যাসী সবই। একদল স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি এই নিতান্ত নিরীহ নির্ব্বিরোধ জাতিটার অশিক্ষার এবং অনগ্রসরতার সুযোগ নিয়ে কিছু একটা বখেড়া বাধাতে চায়। কিন্তু এরা আজো কেন অনগ্রসর? কেন এরা বর্ণজ্ঞান পেলনা? সন্ন্যাসী বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না রাবণ মাঝিকে। শুধু বললেন যে, আগামী সপ্তাহে তিনি সদরমহকুমায় গিয়ে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবেন এবং পরে রাবণকে সব জানাবেন। আজ শুধু খবরটা জেনেই গেলেন।

মেয়েগুলি স্নান করে ফিরে এল। তাদের সঙ্গে আছে কাপড়-জামা। তাই পরলো সব। রাবণ গরম দুধ চিড়ে গুড় খাওয়ালো ওদের। তারপর সবাই যাত্রা করলো সন্ন্যাসীর সঙ্গে। রাস্তায় যাতে আর কোনো বিপদ না হয়, তার জন্য রাবণ আট দশজন যোয়ান লোক দিল সঙ্গে ওদের—খানিকটা পথ এগিয়ে দিয়ে আসবে তারা।

সন্ন্যাসী পথে মেয়েগুলিকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে এই রকম কারবার অতি গোপনে চলছে। এর আগেও হয়েছে ইংরাজ-আমলে। কোথায় যে তাদের নিয়ে যাচ্ছিল আর কার কাছে বিক্রী করতো, সে সব খবর ওদের কিছুমাত্র জানা নেই। যে লোকটি একশ টাকা নিয়ে পথ থেকে চলে গেল, সে গোয়েন্দা বা অন্যকিছু নয়, এদেরই লোক,

জিপ্ গাড়ী আর তার মালিককে আনতে গিয়েছিল। এই মেয়েগুলিকে প্রায় চার মাস আগে অপহরণ করেছে ওরা। নানা জায়গায় এতদিন নানা অবস্থায় ঘুরিয়েছে আর অত্যাচার করেছে। তিনটির মধ্যে একটি বিবাহিতা, বাকী দুটি কুমারী।

ওদের উপর কি ভয়ানক অত্যাচার করা হয়েছে, শুনতে শুনতে সন্ন্যাসীর চোখ ফেটে জল আসছে। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে শুনে বললেন,

—নারীর উপর এই অত্যাচারই মহাশক্তিকে জাগ্রত করবে মা, ভয় নাই, যুগে যুগে এমন হয়েছে, আর যুগে যুগে তিনি এসেছেন।

ওরা কিছু বললো না, বলবার মত নাইও কিছু। আশ্রমগুহার পানে আসতে লাগলো সব। দীর্ঘ পথ। মাঝে এক জায়গায় একটা বড় পুকুরের ধারে দুপুরবেলা একটু বিশ্রাম করলেন। এইখান থেকে রাবণ মাঝির লোকরা ফিরে গেল। সন্ন্যাসী আসতে লাগলেন মেয়েগুলিকে সঙ্গে নিয়ে।

আশ্রমগুহার উঁচু পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে। অনেক দূর থেকেই দেখা যায় ওটা। সন্ধ্যা হতেও আর দেরী নাই। সন্ন্যাসীর দৃষ্টিশক্তি এখনো যথেষ্ট সতেজ। দেখতে পেলেন, কে একজন তাঁর আশ্রমের নীচের পাহাড়টায় বসে রয়েছে। মানুষই মনে হলো। সে অবশ্য এদের দেখতে পাবে না, কারণ এরা রয়েছেন বনে, গাছের আড়ালে। কিন্তু কে ওখানে বসে? সন্ন্যাসী খুবই চিন্তিত হয়ে ধীরে ধীরে আসতে লাগলেন। সঙ্গের মেয়েগুলির জন্যই তাঁর ভয়। কিন্তু আরেকটু এসেই বুঝতে পারলেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই। যে বসে আছে, অন্য কেউ নয়— ইন্দ্রজিৎ।

—ইন্দ্রজিৎ! দূর থেকেই উনি আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করলেন। ইন্দ্রজিৎ ছুটে নেমে এসে প্রণাম করলো।

গুরু শিষ্যের আলিঙ্গন দেখলো পিছনের মেয়ে তিনটি। কিন্তু একজন ওকে চেনে, অতি বিস্ময়ে বললো—ইন্দ্রদা! তুমি এখানে?

—হ্যাঁ—ইনি আমার গুরুদেব।

সকলে গুহার দিকে চলতে লাগলেন।

অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত সুবোধ অনেক পরামর্শ করলো মোড়লের সঙ্গে। মোড়ল বর্তমানে তার ডান হাত। এ রকম সূক্ষ্মবুদ্ধিশালী ব্যক্তি কমই পাওয়া যায়। মোড়ল এবার নির্ব্বাচনে দাঁড়াতে চায়। সুবোধ তো দাঁড়াবেই। ভোটার সব ঠিকই আছে, তবু একবার তালিম দিয়ে রাখা দরকার—সেই কথাই হচ্ছিল।

—আমরা যে টিকিট নিযে দাঁড়াবো, তাতে আর কিছু লাগবে না খোকাবাবু, তবে কি জানেন, এই বাংলাদেশটা বড় খারাপ জায়গা। সেই সেপাইদের লড়াই থেকে আজ পর্য্যন্ত, তারও আগে চাঁদ-প্রতাপের আমল, তারাও আগের কথা, কত বছরের কথা কে জানে, এই বাংলা দেশেই আগুন জ্বলেছে। ইথানকার লুকগুলোন, জানেন কি খোকাবাবু, —চিরকাল আলাদা দিক পানে চাইতে জানে। ইথানে মানুষের মনের মধ্যে ঐ যাকে বলে, বিপ্লব, ওটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা।

—খুব ঠিক কথা মোড়লকাকা—সুবোধ এখন সম্মান করে ওকে 'কাকা' বলে ডাকে। মোড়ল একেবারে গদ গদ হয়ে গেছে তাতে। নিজের মহলটা ওর ঠিকই আছে, এখন একবার সুবোধবাবুর দিকটা অর্থাৎ নদ'র এপারের লোকগুলোকে তালিম দেওয়া দরকার। খুব কাছে হলেও মোড়ল অন্য জেলার অধিবাসী, কারণ ঐ নদীটাই এই জেলার সীমানা, মোড়লের বাড়ী ওপারে অন্য জেলায়।

কতকগুলো ইস্তাহার ছাপাতে হবে এবং প্রতি গ্রামে যেতে হবে। মোটরগাড়ী গ্রাম্য রাস্তায় চলে না, গোরুর গাড়ী এত ধীর মন্থর যে ওতে আর বর্ত্তমান যুগে ধান-চাল কাঠ-কয়লা নিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কিছু কাজ করা উচিত নয়। মোড়ল ভেবে বললো,

—একটা হাতী যদি থাকতো এ সময় খোকাবাবু, বড় কাজ দিত। আপনার ঠাকুরদার আমলে ছিল হাতী, মনে পড়ে আপনার ?

—হ্যাঁ, মনে পড়ে বৈকি—হাসলো সুবোধ—তা বেশতো, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি কেঁদুয়ার মোহান্ত মহারাজকে, হাতীটা দিনকতকের জন্য উনি দেবেন আমাদের। হাতী দ্রুতগামী, অথচ যে কোনো পথে অবাধে চলে যায়। চার পাঁচটা লোক অনায়াসে যেতে পারে তার পিঠে, কি বলো ?

—আজ্ঞে! অমন যান আর নাই খোকাবাবু, রাজার যান, রাজসিক যান।

—বেশ, আমি আজই চিঠি লিখে দিচ্ছি।

—কিন্তু আরো কয়েকটা কাজ করতে হবে খোকাবাবু। একবার কলকাতা যান—এই ইস্তাহারগুলো ভাল যায়গায় ছাপিয়ে নিয়ে আসুনগে। বড় করে পতাকা যেন আঁকা হয় আর যদি এক আধটা রঙিন ছবি, অবশ্য মেয়েমানুষের ছবি, ওতে কোনরকমে লাগিয়ে দিতে পারেন, তো বড় ভাল হয়—হাসলো মোড়ল।

—তা কি করে হবে মোড়লকাকা ? আমরা যে কত ভাল কাজ করছি, আর করবো, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, সেই সব এতে বলতে হচ্ছে; এতে মেয়ের ছবি কি করে দেওয়া যেতে পারে ?

—খুব পারে। পাশ করলে কি হবে খোকনবাবু, আপনি এখনো খুবই ছেলেমানুষ; দেশের লোকের বুদ্ধি-বিদ্যে আমার ভাল জানা আছে। ঐ ছবিগুলিই ওরা দেখবে আর কাগজটি ঘরে তুলে রাখবে বৈঠকখানায়।

ছবি হবে, যেমন—দুর্ভিক্ষে মেয়েরা সেবা করছে, বাস্তুহারাদের মেয়েরা আশ্রয় দিচ্ছে, মারামারির সময় মেয়েরা...

—থাক, আমি বুঝে নিয়েছি। তোমার মাথাখানা, মোড়লকাকা, আমি সোনা দিয়ে বাঁধাবো—সুবোধ বেশ একটু হাসলো, বললো,—কালই আমি লকুকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি কলকাতা। এগুলো তো ছাপাবোই, ড্রইং রুমটা আরো একটু আপ্-টু-ডেট্ করে সাজাবার জন্য কতকগুলো ভালো ছবি কিনে আনতে হবে।

—আমার জন্যও একখানা গান্ধীমহারাজের বড় ছবি আনবেন, যা দাম হোক।

—আর সুভাষচন্দ্রের? সুবোধ প্রশ্ন করলো।

—কোনো দরকার নেই! ও দিয়ে কী হবে? গান্ধী মহারাজের ছবিখানা সামনের ঘরে টাঙিয়ে রেখে দেব, রোজ ফুলের মালা পরাবো। অন্দরের ঘরে ছবি থাকবে না, থাকবে ছারপোকা, মানুষের রক্ত যারা ঘুমের সময় চুষে খায়।

—হাঃ হাঃ হাঃ! হাহাহাঃ! দুজনেই উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলো, কিন্তু দরজায় চেয়ে দেখলো লকু দাঁড়িয়ে। লজ্জিত হওয়ার আর কোনো প্রয়োজন নেই ওকে দেখে। ও-ও তো দলে এসে গেল। স্বাধীনতার শত্রু বলে যে একদিন সুবোধকে গাল দিয়ে গিয়েছিল, আজ সেই লোকাধীশ তার সহকারী।

—এসো লকু,—সুবোধ ডাক দিল মিষ্টকণ্ঠে,—এত রাত্রে?

—হ্যাঁ, আছে একটু দরকার—বলে এগিয়ে এসে বসলো লকু একটা চেয়ারে। একটু তফাতেই বসলো। মিনিট খানেক কেউ কথাই কইল না। বেশ একটা গম্ভীর পরিবেশ হয়ে উঠলো ঘরটায় সেই তরল হাসিটার পরে। লকুই বলল,

—তোমাদের কথায় হয়তো বাধা দিলাম, কিন্তু আমার কথাটাও দরকারী। দাদার 'টেলী' পেলাম—উনি এই ভোরের ট্রেণে নামবেন। দু'তিন দিন থাকবেন এখানে। মোড়লমশাই এবং তুমি দুজনেই ওঁর সঙ্গে দেখা করবে। তোমার মোটরখানা উনি পাঠাতে বলেছেন স্টেশনে। পাঁচটা চল্লিশে ট্রেণ আসে—অত ভোরে কি সুবিধে হবে মোটর পাঠানো?

—নিশ্চয় হবে, বড়দা কি তোমার একার দাদা নাকি? আমি যাব নিজে মোটর নিয়ে। গরুব গাড়ীতে আসতে ওঁর তিন ঘণ্টা লাগবে, আর ঝাঁকুনীর ব্যথা সারতে লাগবে তিন দিন। মোটর নিশ্চয় যাবে।

—টেলিগ্রামটা উনি তোমাকেই করতেন. কিন্তু তুমি লিখেছিলে যে কলকাতা যাবে—তাই আমাকে পাঠিয়েছেন। যদি তুমি না থাকতে, গরুব গাড়ীই পাঠাতে হতো—লকু 'তারটা' দিল সুবোধের হাতে। পড়লো সুবোধ,

"—সুবোধ বাড়ী থাকলে তাকে মোটর পাঠাতে বলো, নইলে গরুর গাড়ী পাঠাবে—দাদা"

তাইতো !!! সুবোধ এখন বড়দার কাছে লকুর থেকে আপনার হয়ে উঠেছে। আনন্দে সুবোধের চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগলো। হেসে বললো আবার,

—তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পার গিয়ে। বড়দাকে আনার ভার এখন আমার।

—আচ্ছা। লকু উঠে আসছে; সুবোধ বললে',

—তাহলে কাল আর কলকাতা যাওয়া হোল না, কেমন? বড়দার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে ওঁর সঙ্গেই যাওয়া যাবে। উনি নিশ্চয় দমদমে 'এয়ার সার্ভিস' ধরবেন।

—তা জানি না। উনি আসুন, তারপর যেমন বলবেন করা যাবে। বলে লকু বেরিয়ে এল। কি জানি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল ওর ওখানে থাকতে, অন্তরের কোন্ নিভৃত কোণায় যেন বিষাক্ত তীর একটা বিঁধে রয়েছে কিম্বা তারাও বেশী—কি যেন কীট অবিরাম কুরে কুরে খাচ্ছে অন্তরকে—চলে এল লকু। সুবোধ হাঁক ডাক সুরু করে দিল, ড্রাইভারকে ডাকলো, আর ডাকলো চাকর নীলমণিকে, বড় রকম একটা মালা এখনি গেঁথে ফেলতে হবে। রাতে যে ফুল ফুটে আছে গাছে, এখনি তোলা হোক, আর গ্রামে এখনি জানিয়ে দেওয়া হোক, প্রতি বাড়ীতে যেন মঙ্গলঘট স্থাপন করা হয় ভোরে!

সমারোহ করতে শিখেছে সুবোধ; বড়দাকে আনবার যে আয়োজনটা ও করলো ঐটুকু সময়ের মধ্যে, তা সত্যি বিস্ময়কর। অবশ্য সবই ওর অনায়াসলভ্য এখানে, কিন্তু এভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে ব্যাপারটাকে এতখানি ঘোরালো করে তোলা এত অল্প সময়ে সহজ কথা নয়।

ট্রেণ লেট ছিল, আজকাল প্রায়ই লেট হয় সব গাড়ী, এবং স্বাধীন দেশের সরকারী গাড়ী, তার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত সবই আলাদা রকম। কিন্তু গাড়ীর কথা যাক্, বড়দা নামলেন প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে। এরোপ্লেনে নামবার মত মাঠ বিস্তর আছে, তবু কেন যে উনি প্লেনে এলেন না, কে জানে। এলে খুব ভাল হোত। আকাশে উড়ে-যাওয়া পাখীর মত প্লেনগুলো এদেশের লোক উর্দ্ধপানে চেয়ে চেয়ে দেখে আর বলে, পুষ্পক রথ যাচ্ছে। ওটা এদেশের লোকের কাছে অপূর্ব্বতম বিস্ময় এখনো। বড়দা এরোপ্লেনে এলে শুধু ঐ প্লেন দেখতেই হয়তো লক্ষ লোকের সমাগম হোত। তবু লোক বড় কম হোল না, প্রায় হাজার।

গ্রামে ঢুকবার মুখেই একটা গেট তৈরী করা হয়েছে। রাতারাতি ওটা তৈরী করিয়েছে সুবোধ, নাম "রুদ্রাধীশ তোরণ।" লতা-পাতা-ফুল

দিয়ে সাজানো গেট—পলাশ ফুল এখন অসংখ্য এদেশে, তাই ভেঙে এনে গেটের সর্ব্বাঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রভাত-সূর্য্যের আলোতে লাল ফুল গুলো জ্বলছে যেন—রুদ্রাধীশের মতই সেগুলো রুদ্র, রক্তাক্ত।

রণাধীশ—অর্থাৎ বড়দা প্রায় আঠারো মাস পরে বাড়ী ফিরছেন। এই সময়টা তিনি দিল্লী, বোম্বাই, কলকাতা এবং আরো অনেক স্থানে ঘুরেছেন সরকারী কাজে, বাড়ী আসবার সময় পান নি। সময় তাঁর এখন নিতান্ত কম—রাষ্ট্রচক্রের অসংখ্য চক্রের তিনি একখানা বিশেষ চক্র—সময় কোথায়!

"রুদ্রাধীশ-তোরণের" কাছে প্রায় ডজন খানেক মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে বড়দাকে বরণ করবার জন্য; প্রত্যেকের হাতে শাঁখ, পুষ্পমাল্য এবং কারো কারো হাতে ঝারি। এই ঝারির জলধারা দিয়ে ওঁকে নিয়ে যাওয়া হবে সুবোধের বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপ অবধি। ওদের মধ্যে সেঁজুতিও আছে। সুবোধ ভোরে লোক পাঠিয়ে তাকে আনিয়েছে এবং তারই উপর ভার দিয়ে গেছে, বড়দাব অভ্যর্থনা ব্যাপারটা ভাল ভাবে করবার জন্য। সেঁজুতি জানে—ইদানিং সুবোধের সঙ্গে বড়দার চিঠিপত্র আদান প্রদান হয় এবং আরো কি-সব যেন হয়, কিন্তু সবিশেষ কিছু জানে না ও। বড়দা আসছেন, অতএব তাঁকে অভ্যর্থনা করাই উচিৎ ভেবে সে সকালেই এসেছে এবং যথাযোগ্য আয়োজনও করে ফেলেছে।

বড়দার গাড়ী তোরণের কাছে আসতেই 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত আরম্ভ হোল এবং মেয়েরা সেটা গাইতে গাইতে শাঁখ বাজিয়ে জলধারা দিতে দিতে এগিয়ে আসতে লাগলো; মোটর এইখান থেকে খুব ধীরে চলছে। বহুলোক দেখছে এই অভ্যর্থনা। বড়দা গাড়ীতে বসে, ফুলের মালায় গলা থেকে গাল পর্য্যন্ত ঢেকে গেছে তাঁর, মোটা সেলুলয়েডের ফ্রেমের চশমার মধ্যে তাঁর আয়ত চোখদুটি বেশ দেখা যাচ্ছে উজ্জ্বল এবং সুন্দর;

এ বংশের সকলেই সুন্দর। পাশে সুবোধ বসে। অগণ্য দেশবাসী পথের দুধারে দাঁড়িয়ে দেখছে "রাজার দুলাল আসে চলি ঐ ঘরের সমুখ পথে"—বড়দাও যেন এই রকম কিছু ভাবছিলেন। জিনিষপত্র নিয়ে লকু পিছনে আসছে, গরুর গাড়ীতে, অনেক পিছনে; তাকে দেখা গেল না।

—খুব এলাহি কাণ্ড করে ফেলেছ তো সুবোধ! বড়দা হেসে বললেন।

—দরকার একটু, সুবোধ নিম্ন স্বরে বলল হেসেই।

—ঐটা সেঁজুতি না? ঐ যে আগে আগে?

—হ্যাঁ—ঐ তো এসব করেছে। এই জলধারা, আলপনা, শাঁখ বাজানো...

—ও কাব্যতীর্থ পরীক্ষাটা দিয়েছে নাকি?

—হ্যাঁ—সে তো প্রায় দেড় বছরের কথা। পাশ করেছে।

—ইংরাজি?

—পরীক্ষা দেয় নি, বাড়ীতে পড়ে। ওর দাদার খবর শুনলাব খুব খারাপ।

—কোথায় শুনলে?

—লকুর কাছে। তাদের জানানো উচিৎ হবে না ভেবে কিছু বলিনি আমরা।

—ও রোগ তো আর সারে না সুবোধ; মেয়েটার কি যে গতি হবে!

—গতি আমাদেরই করতে হবে। সুবোধ বলে একটু হাসলো।

গাড়ী এসে পড়লো চণ্ডীমণ্ডপে। অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছেন, মেয়ে এবং পুরুষ। বড়দাকে মাতব্বর ব্যক্তিগণ নামালেন গাড়ী থেকে, তাঁদের মধ্যে সুবোধের বৃদ্ধ বাবা প্রধান। আজ বড়দা গ্রামের গৌরব, দেশের গৌরব—ভারতের গৌরব—কৃতজ্ঞ দেশবাসী সকলেই এই সব

স্বাধীনতা-যুদ্ধের সৈনিকদের কাছে। কারো ত্রুটি যেন না হয় এদের সম্মান জানাতে, শ্রদ্ধা করতে, স্বজন বলে গ্রহণ করতে।

সুবোধের বাবাই উপরোক্ত কথা কযটা বললেন। বৃদ্ধ মানুষ, দেহখানাও ভারী, ঐ কয়েকটি কথা বলেই বসলেন। গ্রামের প্রাণকৃষ্ণ চট্টরাজ আর নিখিল বাজপেয়ী এবং সর্ব্বেশ্বর জানা বেশ বড় বড় বক্তৃতা দিলেন। আজকাল সকলেই বক্তা, দাঁড়ালেই দু-চার কথা বলা যায়। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে থেকে এক আধজন কেউ কিছু না বললে খবরের কাগজের রিপোর্টটা জলো হয়ে যাবে। সুবোধ এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকেই দেখতে না পেয়ে শেষে সেঁজুতিকেই বলল—এই গ্রামের গৌরব স্বরূপিণী, আমাদের সকলের স্নেহভাজনীয়া শ্রীমতী সেঁজুতি দেবী এবার কিছু বলুন।

সেজুতি চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল একধারে, হাতে তার পঞ্চমুখী শাঁখ। ওকে বক্তৃতা দিতে হবে, তা ও জানতো না। কিন্তু কি বলবে? অথচ কিছু না বললেও চলে না; সবাই ওর মুখের পানে তাকাচ্ছে।

—"আজ ভেঙেছে দুয়ার, এসেছে জ্যোতির্ম্ময়"—তিমির বিদীর্ণ করে তাঁর উদার অভ্যুদয় আমরা দেখতে পাচ্ছি—সেজুতি আরম্ভ করলো—স্বাধীনতা-সূর্য্য উদিত হয়েছেন। দীর্ঘ দুর্য্যোগময়ী রাত্রির সুকঠোর তপস্যাকে যাঁরা সিদ্ধির সুপ্রভাতে এনে দিয়েছেন,এই মহামান্য ভারতসন্তান তাঁদেরই অন্যতম। কিন্তু যাঁরা এই তপস্যার শব-সাধনায় শব, যাঁরা দধীচির মত দেহত্যাগ করে বজ্র নির্ম্মাণ করে দিয়ে গেলেন, আজকার বজ্রধর ইন্দ্রকে পেয়ে আমরা যেন তাঁদের না ভুলি। তাঁরা আমাদের পিতৃগণ! আমাদের এই সব লোকপাল, দেশপাল, রাষ্ট্রপাল ইন্দ্রদের হাতে তাঁরাই শক্তিবজ্ররূপে আজ সুশোভি। এই শক্তি ন্যায়ের শক্তি, নীতির শক্তি, নৈতিক শক্তি। যে শক্তিবলে নেতা নেতৃত্ব করেন, নিয়ন্ত্রিত করেন

রাষ্ট্র, নিয়ে আসেন নবযুগের সম্ভাবনাকে, নব যৌবন জাগিয়ে তোলেন জাতির জীবনে, যে যৌবন উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদনা নয়, শ্রেণীবদ্ধ সৈনিকদলের মত শৃঙ্খলায় সুন্দর, ত্যাগে আর তপস্যায় শান্ত-সমাহিত, মনুষত্বের মহিমোজ্জ্বল মন্দিরে ধূপ-গন্ধের মত সুরভি। কিন্তু নীতি আর নৈতিকতার তফাৎটা যেন আমরা না ভুলি! সাধারণ মানুষ অসাধারণ হয়ে ওঠে নীতির প্রভাবে, কোনো বিশেষ দেশে, বিশেষ কালে বিশেষ কোনো নীতি পরিচালন করে কেউ হয়তো অসাধারণত্ব অর্জ্জন করেন কিন্তু রাজনীতি বা সমাজনীতি বা ধর্ম্মনীতি পরিবর্ত্তনশীল। হয়তো পরবর্তী যুগে পূর্ব্ববর্ত্তী সেই নেতার নীতি বাতিল বলে গণ্য হয়, এমন কি তার ভুলভ্রান্তির জন্য উত্তরকালের বংশধরকে যথেষ্ট যন্ত্রণাভোগও করতে হতে পারে—তাই নীতিগত অসাধারণত্ব অচিরস্থায়ী—কিন্তু…

সেঁজুতি একবার এদিক ওদিক তাকালো,—দেখলো, সবাই শুনছে তার কথাগুলো,—বড়দা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুনছেন যেন। আবার আরম্ভ করলো,—কিন্তু নৈতিক শক্তি অক্ষয়, অব্যয়, সনাতন। মানুষের আদর্শবাদী অন্তর সাধারণ জীবনে হয়তো দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে—হয়তো মহাপাপী বলে পরিগণিত হতে পারে, তথাপি তার অন্তশ্চেতনা থেকে নৈতিক আদর্শের প্রতি সম্মানবোধ বিলুপ্ত হয় না। নৈতিক শক্তিই তাই শ্রেষ্ঠ শক্তি, যে শক্তির সঙ্গে আমরা মহাত্মাজীর জীবনের প্রতি পদক্ষেপে পরিচিত হই। আজ যে রাষ্ট্রপালগণ তাঁর উদার মহান নৈতিক চরিত্রাদর্শ অবলম্বন করে আমাদের পথ নির্দ্দেশ করছেন, আমাদের পরিচালন করছেন—আমাদের বড়দা তাঁদেরই অন্যতম। তিনি আজ আর শুধু আমাদের বড়দা নন—সারা দেশের সম্পদ তিনি আজ। তবু আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য এই যে, এই গ্রামের আলোতে, হাওয়াতে, ধুলোতে, বালিতে স্নেহভালবাসায়, দুঃখে-সুখে তিনি বড়ো হয়েছেন—আমাদের

বড়দা আজ সর্ব্বজনের।—তিনি সর্ব্বকালের হয়ে লোকোত্তর আসনে সমাসীন হোন—বিশ্বরাজের চরণে আমরা এই প্রার্থনা করি।

বক্তৃতাটা বড় না হলেও মন্দ হোল না খুব। গলার স্বর খুব মিষ্টি, আর পরিষ্কার উচ্চারণ। কিন্তু বড়দা ভাবছিলেন, নীতি আর নৈতিকতা নিয়ে এতো বেশি কথা কেন বললো সেঁজুতি! মেয়েটা অসাধারণ বুদ্ধিমতি—জানেন তিনি। বাবার ইচ্ছা ছিল, ওর সঙ্গে লকুর বিয়ে দিয়ে ওকে পুত্রবধূ করবেন,—এখনো হতে পারে। কিন্তু···বড়দাকে এবার কিছু বলতে হবে অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে। ভাবনাটা থামিয়ে উনি বলে চললেন; বলা ওঁদের এত বেশি অভ্যাস যে ভাববার কিছু নাই। দাঁড়ালেই বলতে পারবেন এবং খুব মনোজ্ঞ হৃদয়গ্রাহী করে বলে যাবেন। ভাষা বা ভাব সবই যেন কণ্ঠে বসে আছে বেরুবার জন্য। রোজ সকালে বা বিকালে রেডিওর চাবি খুলে দিলেই আপনারা এরকম বক্তৃতা শুনতে পাবেন,—দেশকে ওঁরা অনতিবিলম্বে পৃথিবীর সেরা দেশে পরিণত করবেন; মাতৃভূমিই মানুষের সর্ব্বাগ্রে পূজ্য—এবং মাতৃভূমির শ্রেষ্ঠ সেবকগণই আজ ভ্রাতাদের ইহ-পরকাল দেখবার ভার নিয়েছেন। অন্নেবস্ত্রে-আবাসে, সুখে-সৌভাগ্যে—শান্তিতে—ধনে—জনে—যৌবনে ভারত আজ উল্কাবেগে এগিয়ে চলেছে সমৃদ্ধির পথে। অজস্র বিশেষজ্ঞ আর অফুরন্ত পরিকল্পনায় রাষ্ট্রদপ্তর পরিকীর্ণ। ফসল-ফলাও থেকে ফোক-আর্ট সংরক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই বাদ যায় নি তাঁদের স্কিমে—কোনোটাই নজর এড়ায় নি চোখে। শিল্প-সংগঠন, বেকারত্ব বিলোপ, কৃষক-মজদুর-প্রজার পরিপালন—এসব তো সাধারণ কর্ত্তব্য, করতেই হবে, অসাধারণ যথা, প্রাচ্যের গণজাগরণকে কেন্দ্রীভূত করা, এশিয়ায় শ্বেতপ্রভাব হ্রাস, মানুষের মন-কেন্দ্রে সৌভ্রাত্যের বীজরোপণ—পৃথিবীর মানুষকে একীকরণ ইত্যাদি মহা মহা সমস্যায় আজ ভারাক্রান্ত ভারতরাষ্ট্র-কর্ণধারগণ। এসব তো হচ্ছেই, হবেই।

উপস্থিত এই গ্রামকে কেন্দ্র করে, গ্রাম-সংগঠন এবং বুনিয়াদী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আরম্ভ করা যাক,—তার সঙ্গে ফসল ফলাও আন্দোলন চলুক।

এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে যিনি বিঘে প্রতি সব থেকে বেশি ধান ফলাতে পারবেন। আখের চাষ যাঁর সব থেকে ভাল হবে তাকে পাঁচশ টাকা আর কপি, আলু, পটল প্রত্যেকটির জন্য একশ টাকা করে পুরস্কার। এই রকম কার্য্যকরী ঘোষণা না করলে শুধু মুখে চোঙা নিয়ে 'গ্রো মোর ফুড্'—বলায় কাজ হবে না। ফসলটা আগে দরকার নইলে কি খেয়ে আমরা "ফোক আর্ট এণ্ড ড্যান্স এণ্ড সঙ"—বাঁচিয়ে রাখতে পারি!

এরপর সুবোধ ধন্যবাদ জানাতে উঠে বললো, যে বড়দার বিঘোষিত আঠারো শো টাকার সঙ্গে আরো আঠারো শো টাকা সে যোগ করে দেবে, যে টাকাটা বীজ কিনবার জন্য বা সার সংগ্রহ করবার জন্য দেওয়া হবে দরিদ্র চাষীদের। অবশ্য অমরপুর ইউনিয়নের লোকরাই এই সুযোগটুকু পাবে—অপর কেউ নয়।

ধন্য ধন্য করতে লাগলো চাষীগুলো, লাঙ্গল ফেলে যারা এই বিরাট সমারোহ দেখতে এসেছিল। বড়দা বললেন একজন ব্যক্তিকে,

—রাখাল, পুকুরগুলো তো প্রায় বুজে গেছে, সরকার থেকে কিছু মোটা সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা করছি আমি—তোমরা সব ওগুলো পরিষ্কার করিয়ে মাছের চাষটা এবার ভাল করে কর দেখি।

সবিনয়ে রাখাল জানালো—আজ্ঞে দাদাবাবু, টাকা পেলে কাজ করাবার ভাবনাটা কোথায়। এই সব পুকুরেই আমার বাবার আমলে আড়াই আনা সের মাছ ছিল—পুকুর তো মাথায় করে নিয়ে যায় নি তারা।

—ঠিক কথা, সবই আছে—ছিল না স্বাধীনতা, সেটা যখন এসেছে, তখন ভাবনার কিছু নেই—সবই আমরা ঠিক করে ফেলবো অবিলম্বে।

অতঃপর সভা ভঙ্গ হোল এবং বড়দা বাড়ীর দিকে যাত্রা করলেন, অবশ্য গাড়ীতেই এবং সুবোধও অনুগমন করলো—উপরন্তু গণাধীশ এই-খান থেকে গাড়ীতে উঠে বসেছে। মোটর গাড়ীতে জীবনে ও এই প্রথম চড়লো ; কে জানে, ওর জীবনটা মোটরগাড়ী চড়েই চলবে কিনা ?

স্বাহা জানালা পথে দেখছিল, স্বামী আসছেন, যেন রাজাধীরাজ আসছেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ্যদান করে চণ্ডাল সেজেছিলেন, শিবাজী গুরু রামদাসকে সব দিয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে বেরিয়েছিলেন প্রজার দরজায়—বর্ত্তমান যুগের রাজা-রাজকুমারগণ···না, স্বাহা আর ভাবতে চায় না। শাঁখ বাজালো সেঁজুতি এবং আর কয়েকটি মেয়ে। সুবোধ বড়দাকে এনে উঠোনে দাঁড় করালো। বৃদ্ধা মা দাঁড়িয়েছিলেন—রণাধীশ প্রণাম করলেন তাঁকে। কি আশীর্ব্বাদ করলেন বৃদ্ধা, বোঝা গেল না, হয়তো বললেন বেঁচে থাক—না হয় বললেন, রাজা হও, না হয় তো বললেন, সোনার দোয়াত কলম হোক—বাংলামায়ের এই সবই তো আশীর্ব্বাদ। কিন্তু উনি নিশ্চয় ওরকম কিছু বলেন নি—সেঁজুতি আর স্বাহা ওপরে দাঁড়িয়ে ভাবছিল। রুদ্রাধীশের সহধর্ম্মিণী কি আশীর্ব্বাদ করতে পারেন রাজবেশধারী পুত্রকে আজ ?

লকু জিনিষপত্রগুলো নিয়ে এসে পড়লো। ওগুলো গোছাতে লাগলো সেঁজুতি। স্বাহা রান্নাঘরেই রয়েছে। এতবড় বিরাট ঘটনায় ওকে কি কিছুমাত্র বিচলিত করলো না ? আশ্চর্য্য তো !

বড়দাকে বিশ্রাম করবার অবসর দিয়ে সুবোধ চলে গেল, শুধু যাওযার আগে একবার দেখে গেল সেজুতির মুখখানা। ক্লান্ত হয়ে রয়েছে সেঁজুতি। ছেঁড়া শাড়ীটা আর পরা চলে না। কিন্তু কি করতে পারে সুবোধ !

দিতে গেলে শুধু নেবে না নয়, সুবোধের সঙ্গে চিরজন্মের মত ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে হয়তো। নিরুপায় সুবোধ ভাবলো, ওর বাবার কাছে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাবটাই করবে এবার সে, কিম্বা বড়দাকে দিয়ে করাবে।

উৎপলার ওখান থেকে ইন্দ্রজিৎ চলে এলো গুরুদেবের চরণ দর্শনে। তাঁর অনুমতি ছাড়া কাবেরীকে গ্রহণ করতে পারে না ইন্দ্রজিৎ; কিন্তু গুরুদেবকে সেকথা জানাবার সময়ই পাচ্ছে না সে। যে-মেয়ে তিনটিকে তিনি এনেছেন, তাদের জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে। কী ব্যবস্থা যে করবেন, ঠিক করতে পারছেন না, কারণ ওরা বাড়ী ফিরতে চায় না শুধু এইজন্য যে হয়তো, তাদের গ্রহণ করবে না আর বাড়ীর লোক। যুগ-যুগান্তরের অন্ধ সংস্কার, দেশাচারের কঠিন শাসন আর বর্ত্তমান যুগের মানুষের ভীরু নীতি হয়তো ওদেরকে পরিত্যাগ করতেই বাধ্য করবে তাদের। বিবাহিতা মেয়েটি জানালো যে স্বামী তার খুবই ভাল এবং যথেষ্ট শিক্ষিত, কিন্তু তাঁর বাড়ীতে বাবা-মা-বোন ইত্যাদি আছে। সেখানে ওর আর যায়গা হবে না—শেষ পর্য্যন্ত হয়তো তাকে অসদবৃত্তি অবলম্বন করতে হবে। অবিবাহিতা দুজনও ঐ রকম কথাই বললো। ইন্দ্রজিতের চেনা মেয়েটি বললো—উৎপলাদি না কার যেন আশ্রম আছে ইন্দ্রদা, সেখানে ঠাঁই হয় না আমাদের ?

—ঠাঁই হয়তো হতে পারে, কিন্তু সেটা তো সংসারক্ষেত্র নয়, সেবিকা-কেন্দ্র।

—হোক; আমরা সেবিকাই হয়ে যাব; সে তো কিছু খারাপ কাজ নয় ইন্দ্রদা!

—না, কিন্তু সেবিকা হবার জন্য যে ত্যাগব্রত সাধন দরকার, তা সাধনা-সাপেক্ষ।

—আমাদের নিয়ে চলুন, আমরা সাধনা করবো।

গুরুদেব প্রশ্ন করে জেনে নিলেন উৎপলার আশ্রমের কথা। পরে বললেন—সেখানে এদের রেখে প্রত্যেকের বাড়ীতে খবর দাও, এবং জিজ্ঞাসা কর যে তারা এদের পুনর্গ্রহণ করতে রাজি আছেন কি না। যদি না থাকেন তখন অগত্যা সেবিকা বা প্রচারিকা করে নিতে হবে ওদের।

ঐ কথাই ঠিক রইল। এই নির্জ্জন বনে এদের বেশিদিন রাখা চলে না। নানান অসুবিধা, তাছাড়া বিপদের ভয়ও যথেষ্ট রয়েছে। মেয়ে কয়টিকে শীগ্রি সরানো দরকার। তার আরও বিশেষ কারণ, যাদের কাছ থেকে ওদের ছিনিয়ে আনা হয়েছে, তারা হয়তো চুপচাপ বসে নেই। তারা এখানে যেকোনো দিন হানা দিয়ে আবার ওদের কেড়ে নিয়ে যেতে পারে। সন্ন্যাসী ইন্দ্রজিৎকে বললেন যে, আজই সন্ধ্যার ট্রেণে ওদের নিয়ে সে কলকাতায় চলে যাক এবং উৎপলার আশ্রমে রেখে দিক।

আজ তিনদিন হোল ওরা এসেছে এবং ইন্দ্রজিৎও এসেছে। অকারণ এখানে বসে সময় কাটাবার মানুষ নয় ইন্দ্রজিৎ। গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো সংকর্ষণের ভিটাটা একবার দেখে আসবার জন্য। ফেরবার পথে স্বাহাবৌদি আর সেঁজুতির সঙ্গে দেখা করে আসবে। গুরুদেব মৃদু হেসে অনুমতি দিলেন, কিন্তু বললেন যে আজ অতখানা পথ গিয়ে ফিরে এসে আবার ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরা সম্ভব হবে না; অতএব কলকাতা যাওয়া হবে আগামী কাল সন্ধ্যায়।

চলতে চলতে ইন্দ্রজিৎ ভাবলো, কাবেরীর কথা কিছুই বলা হয় নি শ্রীগুরুদেবকে। বলতে যেন কোথায় সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে ওর। যে জীবনকে ও সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছে, তাকে আবার ফিরিয়ে নেবে কোন মুখে, এই

চিন্তাটাই ওকে সঙ্কুচিত করে তুলেছে। সময় না পাওয়াটা যথেষ্ট কারণ নয়; সময় হয়তো করে নিতে পারতো সে। ভাবতে ভাবতে অনেকখানা পথ পার হয়ে এল। সেই ধ্বসে যাওয়া ব্রীজটা দেখা যাচ্ছে—আবার দিব্যি নতুন করে বেঁধেছে ওটা। ঝম্‌ঝম্ শব্দে একখানা ট্রেণ চলে গেল ওর ওপর দিয়ে। দেখলো ইন্দ্রজিৎ—বিপ্লব থেমে গেছে, বিদ্রোহ দমিত হয়েছে—বিশাল ভারতভূমিতে আজ চক্রলাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ পতাকা উড়ছে, ঐ উড়ন্ত পতাকার দণ্ডটার শিকড়ে যারা রস সিঞ্চন করেছে···না, কি সব বাজে ভাবছে ইন্দ্রজিৎ! দণ্ডটা বাঁশের, ওর শেকড়ই নেই মোটে, ওটা মাটিতে গর্ত্ত করে পুঁতে দেওয়া হয়েছে—ওতো মহীরুহ নয়······

কথাটা আর ভাবলো না ইন্দ্রজিৎ, ভাবনার মোড় ঘোরালো; সিপাহী বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ করে বিয়াল্লিশের বিপ্লব পর্য্যন্ত ইতিহাসকে ভারতের ইতিহাসের "রক্তচন্দন অধ্যায়" বলা চলে। ইন্দ্রজিতের গুরুদেব এই অধ্যায়ের একজন বিশেষ নায়ক। আরও অনেকে হয়তো আজো জীবিত আছেন, কে তাঁদের খোঁজ করছে আজ? কিম্বা খোঁজ হয়তো করছেন সরকার। কিন্তু গুরুদেব তো তাঁর জীবনের কোনো কথা কাউকে জানান না। কে জানে কে তিনি, কোথায় ওঁর বাড়ী ছিল—বাড়ীতে কেউ আছেন কি না—কিছুই জানে না তাঁর শিষ্যগণ। জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেন না, যদি বা দেন তো বলেন, 'আমি ভারতমাতার পুত্র'।

হয়তো চিরকুমার—হয়তো যাঁরা ছিলেন, রাজরোষে বা অন্য কারণে তাঁরা কেউ নাই আজ আর; উনি কি বুঝবেন, ইন্দ্রজিৎ কেন কাবেরীকে চায় তার জীবনের সঙ্গিনী করতে? যদি অনুমতি না পায় ইন্দ্রজিৎ?

দূরে অমরপুর গ্রামটা দেখা যাচ্ছে। ঐখানে গিয়ে স্বাহা বৌদির খবরটা নিলে কেমন হয়? বড় ভাল মেয়ে স্বাহা বৌদি। ইন্দ্রজিতকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। অনেকদিন খবর নেওয়া হয় নি—আগে ওখানে

যাবে ইন্দ্রজিৎ। পথ পরিবর্ত্তন করলো সে—স্বাহার বাড়ীর পানেই আসতে লাগলো।

গ্রামে ঢুকতেই মনে হোল যেন বিশেষ কোনো সমারোহ চলছে। হয়তো পাল-পার্ব্বণ আছে কিছু। ইন্দ্রজিৎ অগ্রসর হয়ে চললো। ওর পরণে সন্ন্যাসীর পোষাক, গেরুয়া বস্ত্র, মাথায় পাগড়ী, হাতে মোটা লাঠি। যে দু'চারজন লোকের সঙ্গে দেখা হোল রাস্তায়, সবাই ওর মুখ পানে তাকাতে লাগলো, কিন্তু কেউ কিছু প্রশ্ন করলো না। কত লোক কত কাজে আসে আজকাল এদিকে, প্রশ্ন অনাবশ্যক। ভালই হোল ইন্দ্রজিতের ; নির্ব্বিবাদে সে চলে এল স্বাহার বাড়ীর কাছাকাছি। কিন্তু এখানেই যেন সমারোহটা শেষ হয়েছে। পত্র-পল্লব সমন্বিত দরজাটা জানিয়ে দিচ্ছে কোনো বিশেষ অতিথির শুভাগমন।

পুরোণো ভাঙা বাড়ী—আগে দেখেছিল ইন্দ্রজিৎ, এখনো ঠিক তেমনই আছে,—অতএব বাড়ী ভুল হবার কোনো আশঙ্কা নেই। তবু ইন্দ্রজিৎ বাইরে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করছে—কাউকে ডাকবে কি না। মোটরের চাকার দাগ রয়েছে রাস্তায়—কেউ বিশেষ ব্যক্তি নিশ্চয় এসেছেন। কে এলেন ? হয়তো স্বাহার স্বামী...ইন্দ্রজিৎ ভেবে নিল। তাহলে থাক—ওদের এখন আর বিরক্ত না করাই উচিৎ—নদীপার হয়ে নেতা সংকর্ষণের ভিটাটা দেখে আসবে ইন্দ্রজিৎ। স্বাহা বৌদির সঙ্গে দরকার তেমন কিছু নেই তো তার। ফিরছে ইন্দ্রজিৎ।

—আসুন, চলে যাচ্ছেন যে ?

থতমত খেয়ে গেল ইন্দ্রজিৎ। তাকিয়েই চিনতে পারলো, সেঁজুতি।

—চলে যাচ্ছিলাম, কি জানি কে এসেছেন এখানে !

—বড়দা এলেন, এইমাত্র এলেন। আসুন, বসবেন।

সেঁজুতি ওকে ডেকে বৈঠকখানার দিকে নিয়ে গেল। ইতিমধ্যে লকু এসে উপস্থিত হোল। দেখেই বললো—এ পথে কোথায় স্বামীজী?

—সম্মানটা সাহিত্যিকের ভাষায় হলেও সত্যি হচ্ছে না, স্বামী আমি নই।

—এমন কি, কোনো মেয়েরও না—সেঁজুতি বলতে বলতে হেসে উঠলো।

—হবার চেষ্টায় আছি, তাহলে স্বামীজী না হই, শুধু স্বামী অন্তত হতে পারবো।

—শুধু স্বামী হলে তখন হবেন স্বামীমহারাজ। —সেঁজুতি বলল। সবাই হেসে উঠলো। লকু সাদরে ওকে বসিয়ে পুন প্রশ্ন করলো,

—কোথায় এসেছেন? আমাদেরই এখানে কিম্বা আর কোথাও?

—আপাততঃ এখানেই, তবে তিনদিন পূর্ব্বে এসেছি ঐ পাহাড়ে আমার গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে। আপনাদের খবর কি? খোকা কেমন আছে?

—ভালই। দাদা আজ দিল্লী থেকে এলেন এই কিছুক্ষণ। আপনাকে পেয়ে খুবই আনন্দিত হচ্ছি। দাদার সঙ্গে আলাপ করবেন। উনি এখন দিল্লীতেই রয়েছেন, তবে আগামী সপ্তাহে যাবেন ভারতের বাইরে।

—খুবই আনন্দের কথা।

—আপনাদের মিশন চলছে কেমন? কাজ কিছু হচ্ছে কি? লকু প্রশ্ন করলো।

—কাজ—নাঃ, মানুষ এখন কোনো ভাল কথা শুনতে চায় না; তবে আমাদের কাজ আমরা করে যাচ্ছি। হ্যাঁ, ভালকথা, সেই শুক্লা মেয়েটি কোথায় জানেন?

—হ্যাঁ, সে ভালই আছে, তার স্বামীর কাছেই আছে। সনতের মন যথেষ্টই উদার এ বিষয়ে। কিন্তু কেন বলুন তো ?

ইন্দ্রজিৎ তার গুরুদেবের আনা মেয়ে তিনটির ছুর্ভাগ্যের ইতিহাস বললো। ইতিমধ্যে সেঁজুতি ওর জন্য হাত মুখ ধোবার জল ঠিক করেছে, স্বাহাও এসে দাঁড়িয়েছে। ইন্দ্রজিৎ উঠে প্রণাম করতে গেল।

—থাক ভাই, ভাল আছেন তো ?

—আছি বৌদি—শারীরিক ভাল চিরকালই থাকি আমি।

—মানসিক ?

—না—তার নানা কারণ। আপাততঃ খোকাকে আনুন, দেখি কতবড় হোল।

—বয়সটাই বড়ত্বের নিরীখ হলে অনেক বড়ই হয়েছে সে, কিন্তু সত্যি বড় কিছু হয় নি। ওকে বড় করবার ভার আমি আপনার হাতে আর লকুর হাতেই দেব।

—কেন বৌদি, কেন এরকম কথা বলছেন ? ও নিশ্চয় বড় হবে, নিশ্চয়ই হবে।

—হবে—হওয়া ওর চাই-ই, কিন্তু—থাক, পরে এসব কথা হবে, যান মুখহাত ধোন।

ইন্দ্রজিৎ উঠে হাত মুখ ধুতে গেল। লকু প্রশ্ন করলো স্বাহাকে,

—দাদা কোথায় বৌদি, আবার সুবোধের বাড়ী গেলেন নাকি ?

—না—স্নান করছেন কুয়োতলায়। স্বাহার উত্তরে আশ্চর্য্য মসৃণ মালিন্য।

—তুমি সীতার মত সহ্যই করে চলো বৌদি, আমি লক্ষণের মত তোমাকে নির্ব্বাসনেই দিয়ে আসবো—সেখানেই মানুষ হবে লবকুশ।

—তার পর রামায়ণ গাইবে, না হয় অযোধ্যায় এসে রাজা হবে; এই তো?

—না, রামায়ণের ঐ অংশটা আমাদের লবকুশের জীবনে বাদ যাবে। আমাদের লবকুশ শুধু চিনবে জননী আর জন্মভূমিকে—সে জন্মভূমি অযোধ্যা নয়—তমসাতীরের তপোবন।

ইন্দ্রজিৎ এসে পড়লো হাতমুখ ধুয়ে। স্বাহা ওকে জলখাবার দিল। প্রচুর ফল মিষ্টি এসেছে বাড়ীতে—স্বাহা ওগুলো স্পর্শ করে নি এ পর্য্যন্ত। ইন্দ্রজিতকে পেয়ে ওর মনে হোল, এখন ওগুলো এই সত্য দেশসেবকের মুখে দিয়ে সে অসত্যের অপমানটার কিছু স্খালন করতে পারবে।

সমস্ত মনটা কি যেন অগ্নিজ্বালায় জ্বলছিল স্বাহার। নেতা সঙ্কর্ষণের কন্যার রক্তে আগুন কখনো নেবে নি—কোনো দিন নিববে না।

সে অগ্নি আহিতাগ্নি, বজ্রাগ্নি—দীপ্ত বিবস্বানের হিরণ্যগর্ভ অগ্নি!

কিন্তু এখনো স্বামীর সঙ্গে কোনো কথাই হয়নি স্বাহার। কথা হয়তো আর হবে না—হবার মত কথা কিছু নাইও আর। আজ যদি বাবা বেঁচে থাকতেন, স্বাহা হয়তো তাঁর পদাশ্রয়ে পালিয়ে বাঁচতো, যদি শ্বশুর থাকতেন, স্বাহা হয়তো তাঁকে অবলম্বন করে···কিন্তু থাক। একটা ছেলে জন্মেছে, কিন্তু সে তো ঐ ভোগলিপ্সু লোভীর রক্তের কণিকা, কী-ই বা আশা করা যায় তার কাছ থেকে!—স্বাহা ইন্দ্রজিতের খাওয়া বাসনগুলো ধুতে ধুতে ভাবছিল। চোখের দৃষ্টিতে ওর জ্বলতো আগুন, আজ সেখানে গলছে অন্তর।

প্রচুর জিনিষপত্র নানারকমের। প্রকাণ্ড হোল্ডঅল্, বড় বড় ট্রাঙ্ক আর স্যুটকেশ,—টিফিন ক্যারিয়ার, ফলের চুবড়ি, ফ্লাস্ক, ফাউনটেনপেন গোটা তিনেক—উঃ! রাজাবাদশার মত ব্যাপার! বিছানাগুলো খুলে রোদে ফেলে দিল সেঁজুতি! দেখবার মত বস্তু সেগুলো! মনে পড়ে গেল

পিতা সংকর্ষণের শেষ শয্যা। ছিন্ন কন্থা, মলিন উপাধান, মূর্ত্তিমান দারিদ্র্য যেন। শ্বশুরকে খুব বেশি দেখে নি স্বাহা, যে সামান্য স্মৃতি আছে তা' ঐ দারিদ্র্য আর দুঃখে ভারাক্রান্ত—কিন্তু অশ্রুভারাক্রান্ত নয়। আপন কর্ত্তব্য পালনের আত্মপ্রসাদে ভারাক্রান্ত। দারিদ্র্য এবং দুঃখ সেদিন ছিল সত্যি কিন্তু তাকে বিন্ধ্যগিরির মত আড়াল করে ছিল অন্তরের ঐশ্বর্য্য। আজ অন্তর শূন্য, বাহিরের ঐশ্বর্য্য যতই বিপুল হোক, —আনন্দ চলে গেছে।

কিন্তু ভেবে কোনো লোভ নেই, স্বাহা এখানে নিতান্ত অসহায়া। স্বামীর স্নান হোল। খেতে দিতে হবে—ক্লান্ত স্বামীর বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে; পত্নিত্বের ত্রুটি স্বাহা ঘটতে দেবে না—স্বামীর ধর্ম্মই তার ধর্ম্ম; তিনি যদি চোর হন—স্বাহাকেও চোর হতে হবে, তিনি সাধু হলে স্বাহাও সাধু থাকবে। কিন্তু এখনো স্বাহা বিশেষ ভাবে জানে না, স্বামী তার কি ভাবে অর্থ উপার্জ্জন করেন। বড় চাকরী করছেন—মোটা টাকা মাইনে পান—নিশ্চয় সংসার স্বচ্ছল হবার কথা। দেবরও ভাল রোজগার করছে—অতএব স্বাহার এতখানি ক্ষুণ্ণ হবার তো কোনো কারণ নেই। বহু দুঃখ তারা পেয়েছে ইংরাজ আমলে; আজ যদি যৎকিঞ্চিৎ সুখ লাভ ঘটে…ঘটাইতো উচিৎ। স্বাহা কেন অকারণ স্বামী-সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করছে! খুবই অন্যায় করছে স্বাহা; এ চিন্তা তার পত্নিত্বের এবং সতীত্বের পরিপন্থী। স্বাহা মনকে ঠিক কোরে নিল। হাসলো একটু। আসন পেতে জল গড়িয়ে দিয়েছে সেঁজুতি। চুলটা চিরুনী দিয়ে আঁচড়ে নিয়ে বড়দা এসে বসলেন আসনে। সেঁজুতি পাখা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওকে প্রশ্ন করলেন,

—ওখানে গিয়েছিলি তোরা কোনো দিন? তুই বা তোর বৌদি?

—কোথায়? ঐ নতুন গ্রামটায়? না বড়দা, আমরা জানিই না, কোথায় কি হচ্ছে।

—জানোই না! তোমরা তো খুব খবর রাখ দেশের!—বড়দা অনুযোগ করলেন।

সেঁজুতি চুপ করে রইল। স্বাহা ভাতের থালাটা এনে ধরে দিল সামনে। বড়দা বললেন—আজ বিকালে তোমাদের সবাইকে নিয়ে যাব আমি ওখানে, তৈরী থেকো!

—কোথায়? স্বাহা প্রশ্ন করলো।

—ঐ সেঁজুতিগ্রাম। ওটা তোমাদের দেখা দরকার, আর ওদের সঙ্গে আলাপ রাখা দরকার।

স্বাহা কিছু বললো না—ছেলেটা ওখানেই খেতে বসেছিল, ডাল দিয়ে তার ভাতগুলো মেখে দিতে লাগলো। সেঁজুতি হাওয়া করে মাছি তাড়িয়ে চললো নীরবে।

কেমন যেন অস্বস্তিকর পরিস্থিতি, বড়দা খুব সুখী হতে পারছেন না; বললেন,

—ইন্দ্রজিতের সঙ্গে আলাপ আমার আগে থেকেই আছে। আমি যখন জেল থেকে ফিরি তখন ও আমায় আনতে গিয়েছিল তোদের সঙ্গে, নয়?

—হ্যাঁ,—সেজুতি জবাব দিল।

—ওকি সন্ন্যাসী হয়ে গেছে নাকি! ওরকম গেরুয়া পরে রয়েছে?

—জানি না ঠিক, তবে ওঁর কে গুরুদেব আছেন, তিনি সন্ন্যাসী।

—কোথায় থাকেন গুরুদেব?

—ঐ পাহাড়ে। আমরা কেউ দেখেনি তাঁকে কখনো!

—চলনা, কাল দেখে আসা যাক।

কেউ জবাব দিল না ওরা।

কাবেরী টেলিফোন করে জানলো কৃষ্ণার কাছে যে ইন্দ্রজিৎ চলে গেছে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে। তিন চার দিনের মধ্যে ফিরবে। একটা ভার কিন্তু ইন্দ্রজিৎ দিয়ে গেছে কাবেরীকে; তার কোন যোগী বন্ধুর একটি শিল্প-সংগ্রহশালা আছে। অতি কষ্টে বহু দূর দূর দেশ থেকে বহুরকমের দারু এবং কারুশিল্প তিনি সংগ্রহ করে রেখেছেন; সেই বস্তুগুলি দিয়ে তিনি একটি ভাল মিউজিয়াম করতে চান। টাকা কড়ি কিছু তাঁর নাই। যদি কোন ধনী জমি এবং বাড়ী দিয়ে জনসাধারণের জন্য কোনো সংগ্রহশালা খোলেন, তাহলে তিনি জিনিষগুলি সব দান করবেন। সরকারকে দেবার তাঁর ইচ্ছা নেই এই জন্য যে, সরকার ইচ্ছা করলে ওরকম শিল্পদ্রব্য এখনো অনেক সংগ্রহ করতে পারেন, তাছাড়া সরকারী ব্যবস্থায় নানা ত্রুটি ওঁর চোখে পড়ে। কোন ধনীর ব্যক্তিগত বদান্যতার উপর নির্ভর করেন তাই তিনি! ইন্দ্রজিৎ বলেছিল কাবেরীকে যে যদি সায়ন্তনীতে এরকম একটা বাড়ী পাওয়া যায়, তাহলে সেখানে ঐ সংগ্রহশালা করা যেতে পারে।

যে ঐতিহাসিক বন্ধুটির কথা ইন্দ্রজিৎ বলেছিল, তিনি নাকি আসবেন না—কৃষ্ণা ফোন-এ বললো—কারণ সে ইতিহাস কোনো ধনী ব্যবসায়ী ছাববেন, এটা বিশ্বাস করেন না লেখক! তাঁর লেখার সত্যতা এত তীক্ষ্ণ এবং উষ্ণ যে, বর্ত্তমান তোষণ-নীতি পরিপূর্ণ মহলে তার কদর হবার সম্ভাবনা নিতান্ত কম। ব্যবসার খাতিরে সে-বই ছাপা চলে না—শুধু সত্যনিষ্ঠার জন্য, লোকসান স্বীকার করে যদি কেউ ছাপতে চায় তো তিনি তাকেই দেবেন বইখানি। হয়তো লোকসান না হতে পারে কিন্তু হবার আশঙ্কাই বেশি। কাবেরীর খুবই ইচ্ছা ছিল সেই ঐতিহাসিকের সঙ্গে আলাপ করবার, এবং বইখানি দেখবার—কিন্তু তাঁর আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান হয়তো কিছু বেশি; প্রত্যাখ্যাত হবার আশঙ্কায় তিনি এলেনই না।

যাক, কাবেরী যাদুঘরটা যদি করতে পারে, তার চেষ্টা করা উচিত। নীচে নেমে এল কাবেরী।

—তোমাদের সায়ন্তনীতে আমাকে বিঘেখানেক যায়গার উপর একটা বাড়ী করে দেবে বাবা?—কাবেরী বাবার পিঠের পিছনে দাঁড়িয়ে বলল এসে।

—তোর বাড়ী তো হবেই, মাঝে মাঝে গিয়ে থাকবি সেখানে; কান্ট্রি হোম!

—না, আমি হোম চাইছি না, আমি ওখানে একটা যাদুঘর করবো, মিউজিয়াম।

—তাই নাকি! কী রাখবি সেখানে?

—মিউজিয়ামে যা থাকে বাবা, মৃত, যা মূল্যবান, যা মৃত্যুঞ্জয়, যা অ-মৃত!

—মৃত আবার অ-মৃত হয় কি করে মা? ওতে কী হবে? অনর্থক খানিকটা জমি নষ্ট।

—যা না দেওয়া যায় তাই নষ্ট হয় বাবা, আমি ওটা দান করে দেব। তোমাদের সায়ন্তনীতে শিক্ষনীয় যে-সব বস্তু থাকবে, ওটা তারই অন্তর্গত হবে।

প্রস্তাবটা সমীচীন শুধু নয়, সায়ন্তনীকে সাজাবার জন্য প্রয়োজনীয়; কিন্তু মোহিতবাবু বললেন—জিনিষপত্র সংগ্রহ করা খুব কষ্টসাধ্য মা, ওসব করবেন গভর্ণমেণ্ট। ব্যক্তিগত টাকাকড়ি দিয়ে কি যাদুঘর, জু'গার্ডেন করা যায়! অত সংগ্রহ কোথায় তোর?

—কিছু আমার আছে বাবা, আরও আসবে। আস্তে আস্তে গড়ে উঠবে। রেকারিং এক্সপেন্স খুবই কম ওর। খাবার তো দিতে হবে না

মৃতদের; অথচ তারা দেবে আমাদেরকে আনন্দ, শিক্ষা, প্রচার করবে আমাদের সভ্যতা, আর আমাদের সৌন্দর্য্যপ্রীতি।

—ভাল কথা। আমি অজিতকে বলে দিচ্ছি, শহরের মাঝখানে বিঘে-খানেক জমিতে যেন ওটা করা হয়। কি নাম দিবি—স্বরাজ-মিউজিয়ম।

—না বাবা, স্বরাজ বা রাজারাজড়াকে জড়াতে চাইনে। আমার যাদুঘর হবে গরীবের তৈরী, গরীবদের জন্য। নাম দেব গরীবখানা। হাসলো কাবেরী।

—কিন্তু 'গরীবখানা' কথাটা গৌরবে ব্যবহৃত হয়—বড়লোকদের বাড়ী সম্বন্ধেই।

—হ্যাঁ—নাম দেব—কাবেরী একটু ভাবলো, বললে,—নাম হবে 'রূপ-ভারতী'।

—বেশ নাম। আচ্ছা, আমি ওটা লিখে নিচ্ছি। মোহিতবাবু দৈনিক ডায়রীর পাতায় লিখে নিলেন কথাটুকু। অজিত এখুনি আসবে, তাকে বলবেন সব।

—ইন্দ্রজিৎ আসবে নাকি আজ? প্রশ্ন করলেন।

—না বাবা, তিনি তাঁর গুরুদেবের কাছে গেছেন, সেই যিনি বিহারী-নাথ পাহাড়ে থাকেন।

—ও, আসবে কবে?

—কি জানি! কাবেরী বাবার পাশ থেকে সরে এলো, জানালাটা ভাল করে খুলে দিল—শাড়ীর আঁচলটা গুটিয়ে নিল ভাল করে—বাইরে তাকালো একবার, তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে! মুখে ওর রবীন্দ্রনাথের এক লাইন কবিতা—

—অত চুপি চুপি কেন কথা কও,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ

মিঃ চাটার্জি মেয়ের ভাবগতিক লক্ষ্য করছিলেন, যদিও বাহ্যিক তিনি কাজে-নিবিষ্ট-ভাবটাই বজায় রেখেছেন। কবিতার লাইনটাও শুনলেন উনি। এই বিশেষ কথাটার পর কবির ঐ বিশেষ কবিতাটি কেন মনে এলো কাবেরীর, ভাবতে লাগলেন। কাবেরী ওপাশের ঘরে গুণ গুণ করে আবৃত্তি করছে :—

যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তুমি ভেঙে দিও মোর সব কাজ—
কোরো সব লাজ অপহরণ।
যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখ-শয়নে,
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাধ
থাকি আধোজাগরূক নয়নে,
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয় শ্বাস ভরণ—
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ…

—কাবেরী! বাবা ডাকলেন ওকে। কাবেরী তৎক্ষণাৎ এসে দাঁড়ালো কাছে।

—বাবা!

—ও কবিতাটা কেন আবৃত্তি করছিস মা?—পিতার শঙ্কাকুল কণ্ঠস্বর।

—প্রেজুডিস আছে নাকি বাবা তোমার? কাবেরী হেসে বলল, কবিতাটা বড় সুন্দর বাবা,—

আমি যাব যেথা তব তরী বয়

ওগো মরণ, হে মোর মরণ—

যেথা অকূল হইতে বায়ু বয়—

করি আঁধারের অনুসরণ,

—থাক, তোর মুখে ওটা আমি শুনতে চাইছি না। বাবা বাধা দিলেন। সুশিক্ষিত মার্জ্জিত মোহিত বাবুর মন যেন অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে মরণের কথায়। একমাত্র সন্তানের মঙ্গল কামনাতুর পিতার মন—মিঃ চাটার্জি ভাবতে লাগলেন, এইমাত্র যাদুঘর করবার কথাতেই কাবেরী মৃত্যু কথাটা বারম্বার বলছিল, মৃত, অমৃত, মৃত্যুঞ্জয়—যা উনি শুনতে ভালবাসেন না।

—মহাকবির কাব্যে আনন্দ রসের তো অভাব নেই মা কাবেরী, সেই গুলো তুমি যত ইচ্ছে আবৃত্তি কর, ওটা বাদ দাও। মরণের কথা আমরা ভাববো, তুমি কেন ?

কাবেরী খিল খিল করে হেসে উঠলো, হাসি থামলে দেখলো, বাবা ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন। নিতান্ত অপরাধিনীর মত বললো,

—আচ্ছা বাবা, আচ্ছা,—ওটা আবৃত্তি করবো না তোমার কাছে। শোনো তা'হলে,

'কে চাহে সঙ্কীর্ণ অন্ধ অমরতা কূপে

এক ধরাতল মাঝে শুধু একরূপে

বাঁচিয়া থাকিতে,—নব নব মৃত্যুপথে

—থাম্—মোহিতবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন।

—তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে'—কাবেরী শেষ করলো।

চুপ করে আছেন মোহিতবাবু। কাবেরী হেসে দিল, বলল, —রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বিস্তর মরণের কথা আছে বাবা—উনি মৃত্যুঞ্জয়,

তাই মরণকে বার বার ডেকেছেন। তুমি কিছু ভেবো না, তোমার মেয়েও আশীবছর বাঁচবে।

কাবেরী চলে গেল আস্তে। মোহিতবাবু কাবেরীর জীবনের আশঙ্কা অবশ্য করছিলেন না। মরণের কবিতা আওড়ালেই মরণ হয় না, কিন্তু তিনি ভাবতেই লাগলেন—কেন কাবেরীর মুখে ঐ কবিতাগুলিই ঝঙ্কৃত হচ্ছে? ইন্দ্রজিতের সঙ্গে কি কথা তার হয়েছে, কাউকে বলেনি সে—তার মাকেও না। ইন্দ্রজিৎকে সে ভালবাসে—এটা তাঁদের ভালই জানা। কিন্তু ইন্দ্রজিতকে স্বামী-রূপে লাভ করার পথে আজ দুস্তর বাধা দেখা দিয়েছে। কাবেরী অবশ্য তাঁকে একদিন জানিয়েছিল—ইন্দ্রজিতকে ভালবাসলেও বিয়ে তাকে করতে চায় না—কিন্তু সে কথাটা তার অন্তরের কথা নয়—মুখের কথা মাত্র। কাবেরী একমাত্র মেয়ে তাঁদের—তাকে সুখী করবার জন্য মোহিতবাবু সবই করতে পারেন, কিন্তু ইন্দ্রজিৎ যদি রাজি না হয় বিয়ে করতে! অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তিনি ঠোঁট কামড়ালেন—কোথাকার কে একটা নামগোত্র হীন ছেলে, তার জন্য তাঁর মেয়ের জীবনে এমন একটা বিপর্যয় ঘটতে যাচ্ছে, যেন সহ্য হচ্ছে না ওঁর। যত দোষ কাবেরীর মায়ের—তিনিই প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে…নাঃ—মোহিতবাবু দৃঢ় হবেন—ইন্দ্রজিতকে একেবারে বাদ দিয়ে অবিলম্বে মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলবেন…

মোটর দাঁড়াবার শব্দ হোল, চেয়ে দেখলেন বাইরে!

—এসো অজিত!—অজিতের এই আগমনটাকে ঈশ্বরের অভিপ্রায় বলে মনে হোল তাঁর। ঠিক সময়ই সে এসেছে। ঐ কাবেরীর বর… অনর্থক তিনি আর সময় নষ্ট করবেন না। আগামী মাসেই বিয়ে দেবেন। স্ত্রীর কথা এবার অগ্রাহ্য করবেন তিনি। 'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী' কথাটা ঠিক, অনর্থক এই দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করেছেন তিনি। কিন্তু অপেক্ষা করে

ভালই হয়েছে, নইলে অজিতের মত এমন সুপাত্র পেতেন কোথায়? আরো একজনের নাম এই সঙ্গে মনে পড়লো তাঁর—মলয় কিন্তু কাবেরী তাকে একেবারে পছন্দ করলো না। অজিৎ-সম্বন্ধে সে তেমন কিছু অভিমত দেয় নি—যতদুর বোঝা যায়—কয়েকদিন পূর্ব্বের সেই রেডিওর সঙ্গে গান গাওয়া মনে পড়ে গেল—কাবেরী পছন্দই করে অজিতকে। না করে উপায় কি! ছেলেটা ভাল।

অজিত প্লান আর ফাইলটা রেখে বসলো এবং ফাইলখানা খুলতে লাগলো। ইতিমধ্যে মোহিতবাবু অতখানা ভেবে নিলেন এবং ঠিক করলেন ঐ যাদুঘর তৈরীর ব্যাপারটা নিয়ে কাবেরীর সঙ্গে অজিতের আলোচনা হোক, তিনি লক্ষ্য করবেন মেয়ের মনের গতি। বেয়ারাকে ডেকে বললেন,—তোর দিদিমনিকে ডাক এখানে, অজিতকে বললেন, তুমি কি আজই যাবে সায়ন্তনী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে; এখন যাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয়, করতে হবে।

—তা বেশ, আমি আসছে মাসে যাব একদিনের জন্য। কাবেরী আর তার মাও যেতে পারে। ওখানে কি তোমরা এখন তাঁবুতে থাকবে?

—না, ঠিক তাঁবু নয়, বাঁশের ঘর—খড়ের ছাদন—প্রায় তাঁবুরই মত!

—খাওয়া-দাওয়া?

—ঠাকুর-চাকর রয়েছে। মাছ-ডিম-মুরগী এখনও কিছু সুবিধা ওদিকটায়।

কাবেরী এসে দাঁড়ালো বাবার কাছ ঘেঁসে। মোহিতবাবু বললেন, —অজিত আজই যাচ্ছে সায়ন্তনীতে। তোর প্রস্তাবটা ওকে বল এবার!

—কোন্ প্রস্তাব বাবা?—কাবেরী হাত তুলে প্রতি নমস্কার করলো অজিতকে।

—ঐ যে যাদুঘর না কি বলছিলি।

—ও, আমি বিঘে খানেক জমির উপর তিনতলা বাড়ী চাইছি একটা। বাকী যা কিছু—সে আমি করে নেব। বাড়ীখানা যেন ভারতীয় স্থাপত্যের অনুসরণে হয়।

—অনুসরণে! অনুকরণে নয় তো?

—না, অনুকরণ আমি ভালোবাসি ন', ধ্বনিকে অনুকরণ করতে গিয়ে প্রতিধ্বনি তাকে ব্যঙ্গই করে—কাবেরী জবাব দিল। মোহিতবাবু কথা শুনছিলেন মেয়ের, বললেন,—ভারতীয় স্থাপত্যের অলঙ্করণ, বা আভিজাত্য কি আধুনিক শিল্পীরা দিতে পারবে?

—অনুকরণ তো করতে বলছি না বাবা, তাঁদের ধারা অনুসরণ করে যতটা পারেন করবেন। যে প্রশান্তি এবং গাম্ভীর্য্য ছিল এদেশের স্থাপত্যে আর ভাস্কর্য্যে, সেইটারই অনুসরণ করতে বলছি আমি। বলছি না যে রাশি রাশি মূর্ত্তি আর মুণ্ডু আঁকবেন তাঁরা।

—কি হবে সে বাড়ীতে? মিউজিয়াম? কিন্তু মিউজিয়াম সাজাবার মত মেটিরিয়েল কৈ?

—আছে—সে-সব আমি জোগাড় করবো। ওর মধ্যে আর্টগ্যালারীও থাকবে আমার। মানুষের সভ্যতার মাপকাঠি সাহিত্য-শিল্প-সংগ্রহশালা। সায়ন্তনীতে সেটা থাকবে না কেন?

—থাকবে নিশ্চয়ই। খুব ভাল প্রস্তাব। তবে বাড়ীর ডিজাইনটা সম্বন্ধে একটু আইডিয়ার...

—কোনো বড় শিল্পীকে ডেকে সেটা করিয়ে নেবেন।

—আমার তো কেউ জানা নেই তেমন—অজিত আস্তে বললো।

—আচ্ছা, আমার জানা আছে। খবর দিচ্ছি, তিনি এক্ষুণি এসে যাবেন।

কাবেরী চলে যাচ্ছিল, মোহিতবাবু বললেন,—অজিত আজ এখানেই খাবে—তোর মাকে বল। কাবেরী ফিরে দাঁড়ালো, বাবার মুখপানে চাইল, তারপর মাথা নীচু করে চলে গেল। মোহিতবাবু ঠিকমত বুঝে উঠতে পারলেন না তার ভাবটা। কি যেন একটা নিরাশার ছায়া ওর চোখে। ঠোঁটের কোণায় বিষাদের কালিমা। মানুষের মেয়ে একটা হয় কেন? হলে দুটো-চারটে হতে হয়, নইলে না-হওয়াই ভাল। এই বিড়ম্বনায় কতকাল ভুগবেন তিনি। ঐ আদরের দুলালী যদি অসুখী হয়! না, কিছুই ঠিক করতে তিনি পারছেন না। ওর মার উপর নির্ভর করাই ভাল। অত ঝামেলা পোহাবার সাধ্য নেই তাঁর। অজিত কাগজপত্র বের করে বৈষয়িক কথাবার্ত্তার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছে এর মধ্যে। কাজের মানুষ সে—সময় অনর্থক নষ্ট করে না। সত্যি! তিলমাত্র স্বপ্ন নেই ছেলেটার মধ্যে। মোহিতবাবু দুঃখিত হলেন অজিতের জন্য। যখন যেটার বয়স! মনে পড়ে গেল, কাবেরীর মাকে নিয়ে বোটানিক বাগানে এক সন্ধ্যায় কবিতা পাঠ করেছিলেন তিনি—রবীন্দ্রনাথের "রাত্রে ও প্রভাতে" লাইন দু-একটা মনে আছে,

'আমি শিথিল করিয়া পাশ,
খুলে দিয়েছিনু কেশরাশ,
তব আনমিত মুখখানি
সুখে থুয়েছিনু বুকে আনি
তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে সখি হাসি-মুকুলিত মুখে—'

সে কি আজকার কথা! মোহিতবাবুর বয়স তখন পঁচিশ, কাবেরীর মার মাত্র উনিশ। তারপর কত দিন গেল, কাবেরী জন্মাল, কচি আঙুল দিয়ে টেনে নিত বাবার মুখখানা, মার মুখের কাছ থেকে। ওর মা বলতো—'আর কি! এবার আমাকে ভুলে যেতে পার'।

—এই যে তিনকোণা প্লটটা দেখছেন—এখানে একটা পার্ক করতে

চাইছি—অজিত প্ল্যান খুলে বোঝাতে আরম্ভ করলো—ওরই কাছে এই প্লটে ভালই হবে মিউজিয়ম—আমার তো মনে হয়, খুব বড় বাড়ী করবার দরকার নেই, কারণ মিউজিয়াম সাজানো তো মুখের কথা নয়—জিনিষ চাই। ওঁর খেয়াল জেগেছে, নইলে অত ছোট শহরে এসব অনাবশ্যক···

—জগতে অনাবশ্যকটাই বেশি আবশ্যকীয় অজিত—মোহিতবাবু ধীরে ধীরে বললেন,—গাছে মুকুল আসে অনাবশ্যক প্রাচুর্য্যে, ফল তার সিকিও ফলে না। মানুষের মনেও অনাবশ্যক খেয়ালের অন্ত নেই। এই খেয়াল-গুলো কিন্তু মানুষের জীবনে কম আবশ্যকীয় নয়—এমন কি ওগুলো না থাকলে মানুষ মানুষই হোতো না! সাড়ে তিনহাত মাত্র দৈর্ঘের তিনটে প্রাণী এই বিরাট বাড়ীটায় থাকি আমরা। অন্ততঃ ত্রিশখানা ঘর অনাবশ্যক পড়ে আছে।

অজিত একেবারে নিবে গেছে যেন। মোহিতবাবুর খেয়াল হোল ওর মুখ পানে চেয়ে। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললেন,—তাছাড়া অনাবশ্যক ঠিক নয় ওটা! যেখানে এতগুলি শিক্ষিত ভদ্রলোক থাকবেন, সেখানে সভ্যভব্যতার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা দরকার। সংগ্রহ একদিনে না হোক, ধীরে ধীরে হবে—বাড়ীটা বড় করেই করা হোক···।

অজিত কিছু বললো না মুখে, ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। কয়েক মিনিট কাটলো। বেয়ারা এসে একটুকরো ছেঁড়া কাগজ—খবরের কাগজ থেকে ছেঁড়া, হাতে দিয়ে জানালো যে এই লোকটি দেখা করতে চান। নামটা অপরিচিত। মোহিতবাবু তাকে আসতে আদেশ করলেন। একমিনিট পরে তিনি এসে দাঁড়ালেন। অদ্ভুত মূর্ত্তি! পরণে ছেঁড়া পাৎলুন, সদ্যধোয়া, পায়ে চটি, সেটাও ছেঁড়া, গায়ে অনেক দিনের পুরাণো টুইলের সার্ট, কিন্তু পরিষ্কার ইস্ত্রি করা। লোকটির বয়স হয়তো চল্লিশ পার হবে—লম্বা, রোগা, গাল তোবড়ানো কদাকার চেহারা—মাথায়

লম্বা চুল—গোঁফদাড়ী কামানো। কিন্তু সমস্ত অতিক্রম করে চোখে পড়ে তার উঁচু কপালের নীচে টানা উজ্জ্বল দুটো চোখ—এবং তার তলায় ঠোঁটের যে মৃদু মিষ্টি হাসিটি, তাকে কিছুতেই অ-সুন্দর বলা যায় না।

—কি চান আপনি? মোহিতবাবু ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন করলেন।

—আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এই বাড়ী থেকে কাবেরী দেবী—, হয়তো আপনার কেউ হবেন।

—আমার মেয়ে। বসুন, তাকে খবর দিচ্ছি। আলাপ আছে কি আপনার সঙ্গে তার?

—হ্যাঁ—গতবার নিখিল-ভারত-কলাশিল্প-প্রদর্শনীতে আলাপ হয়েছিল।

মোহিতবাবু এতক্ষণে বুঝলেন, লোকটি শিল্পী। নামটা আবার দেখে নিলেন ছেঁড়া কাগজটায়। খবরের কাগজখানির বাকী অংশ ওর বগলে রয়েছে। পেনসিলটা কানে গোঁজা। এই নিতান্ত দরিদ্র শিল্পীকে দিয়ে কি কাজ হবে—বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি। যতদূর দেখা যাচ্ছে, অর্থাভাবে ইনি জুতো-জামা-কাপড়ও কিনতে পারেন না। কাবেরী হয়তো অনুকম্পা বশে একে ডেকেছে কিছু সাহায্য করবার জন্য। মোহিতবাবু এতক্ষণে বললেন,—আমাদের একটা বাড়ী তৈরী করা দরকার ভারতীয় স্থাপত্যের অনুসরণে। আপনি কি তার ডিজাইন সম্বন্ধে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—শিল্পী বিড়ি বের করে ধরালেন একটা—কতকগুলো ডিজাইন আমার আঁকাই আছে, কিন্তু আমি তো জানতাম না, কি জন্য ডেকেছেন—সঙ্গে আনি নি।

বিড়িটা টেনে ধোঁয়া ছাড়লেন শিল্পী। অজিত চুপ করে বসে দেখছিল ওকে। ওর কিছুতে বিশ্বাস হচ্ছে না যে, এই শিল্পী সত্যিকার ভাল

জিনিষ কিছু দিতে পারবে। কিন্তু কাবেরী ডেকেছে, এবং ইনি কাবেরীর চেনা। অজিত কিছু বলতে সাহস করছে না।

—বাড়ীটা পাথরের নাকি ইটের করবেন ?

—আপনি কি ইঞ্জিনীয়ার ?—অজিত এতক্ষণে প্রশ্ন করলো।

—আজ্ঞে না—শিল্পী জবাব দিলেন—তবে ছেনী-হাতুড়ি ধরতে পারি। পাথর কেটে কেটে ফুল ফোটানো আমার কাজ, যে-ফুল পৃথিবীর ফুলের সব লাবণ্য অক্ষয় করে রাখবে।

—শুধু গন্ধটুকু ছাড়া—অজিত যেন বিদ্রূপ মেশানো গলায় বললো।

—গন্ধ!—শিল্পী জোরে টান দিলেন বিড়িটায়—পার্থিব গন্ধ তো আমরা দিতে চাইনে। পুষ্পের যে অপার্থিব সত্ত্বা, তাকেই সৃষ্টি করা আমাদের কাজ—যার গন্ধ, রূপ, সুষমা, সৌন্দর্য্য শুধু রসিকের জন্য—অরসিক ইঞ্জিনীয়াররা দরজা খোলা পায় না সেখানে—বিড়িটায় আরেকটা টান দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন,—কাবেরী দেবীর সঙ্গে কি দেখা হতে পারবে একমিনিট ?

—হ্যাঁ—খবর দিয়েছি—বসুন একটু। মোহিতবাবু বললেন।

কাবেরী এসে পড়লো এবং নমস্কার করলো শিল্পীকে। বাবাকে বললো,—ইনি বিখ্যাত ভাস্কর আর তৈলচিত্রশিল্পী মন্দার চৌধুরী—বাবা, আলাপ হোল ?

—হ্যাঁ—তোর সব কথা এবার বল ওঁকে ?

—তোমরা বুঝি বলো নি কিছু ? শুনুন মিঃ চৌধুরী, আমাদের একটা যাদুঘর করবার ইচ্ছে, তার জন্য যে বাড়ী তৈরী করতে হবে, তার ডিজাইনটা আপনাকে করে দিতে হবে।

অজিত বললো—কিন্তু ওটা ইঞ্জিনীয়ারিংএর ব্যাপার। তার ডেকরেসন, সাজসজ্জায় শিল্পীর প্রয়োজন।

—শিল্পীর সঙ্গে ইঞ্জিনীয়ারকে মেলাতে চাইছি—অজিতের কথার উত্তরে কাবেরী বললো।—তাজমহল কি শুধু ইঞ্জিনীয়ারেই গড়েছিল? তার পিছনে ছিলনা শিল্পী, ছিল না সাজাহানের শিল্পী-মন? 'কালের কপোলতলে ঐ একবিন্দু অশ্রু'...কথাটা চেপে গেল কাবেরী। শিল্পীকে বলল—আপনি ডিজাইনটা করে দিলে অমি সত্যি কৃতার্থ হব। ভারতীয় রীতির স্থাপত্য চাইছি আমি।

—কিন্তু যে ইঞ্জিনীয়ার সেটায় বাস্তব রূপ দেবেন—ইটে-কাঠে-পাথরে, তিনি পাথরের ফুলে ফুলের গন্ধ চান—তাজমহলে বসোরাই গোলাপের গন্ধ আছে কি না, আগে ওঁকে দেখে আসতে বলুন। কালের কপোলতলে ঐ একবিন্দু অশ্রুর সীমাহীন বেদনা অনুভব করবার শক্তি যার নেই, তার জন্য ডিজাইন করে সময় অপব্যয় আমি করতে চাইনে! উনিই তো ইঞ্জিনীয়ার আপনাদের?

অজিতকে রূঢ় আঘাত! কাবেরী বুঝলো, কথা কিছু আগেই হয়ে গেছে এদের। এবং এখন সেই সংঘাতের আবর্ত্তে তাকে এসে পড়তে হয়েছে। হেসে বললো,—ইঞ্জিনীয়ারের বাস্তবতায় শিল্পীর স্বপ্ন আমি যোগ করবো। আমিই এখানে শাজাহানের অন্তর-মহিমা নিয়ে দেখবো, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য হোল কি না!

শিল্পী অকস্মাৎ অতিমাত্রায় খুসী হয়ে উঠলেন। মুখের হাসিটা আরো বিকশিত হয়ে উঠলো তাঁর; বললেন—সত্যি দেখবেন? পারবেন দেখতে?

—ভুল হলে আপনি সংশোধন করে দেবেন—কাবেরী মৃদু হেসে জবাব দিল।

—আচ্ছা—আমি করে দেব একখানা ডিজাইন—আট-দশ কাঠা জমির উপর হয় যেন বাড়ী।

বিড়ি আরেকটা ধরিয়ে নিয়ে তিনি উঠবেন। মোহিতবাবু বললেন, —আপনার পারিশ্রমিকটা কত হবে? আমি কিছু আগাম দিয়ে দিতাম।

শিল্পীর চোখে নিষ্ঠুর একটা জ্বালা জ্বলে উঠলো যেন। বিড়িটা ফেলে দিয়ে বললেন—এমনিই দিয়ে যাব—বাড়ীখানা যদি তৈরী করতে পারেন আমার পরিকল্পনামত, তো সেইটাই হবে আমার পারিশ্রমিক—হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে উনি চলে গেলেন।

—ওর দ্বারা কি কিছু কাজ হবে রে মা?—মোহিতবাবু প্রায় মিনিট-খানেক পরে শুধুলেন মেয়েকে।

—ডিজাইন উনি ঠিকই করে দেবেন বাবা, তোমরা তৈরী করতে না পারলে উনি কি করবেন!

—তৈরী করা সম্ভব হবে না। আজকালকার যুগে পাথর কেটে মাদুরার মীনাক্ষী মন্দির বা কোণারকের সূর্য্য মন্দির করা সম্ভব নয়—, অজিত বললো—যখনকার যা—সেদিন ছিল নিরবচ্ছিন্ন শান্তি, ছিল দক্ষ শিল্পীর পটুত্ব, ছিল খাওয়া-পরা-থাকার নিশ্চিন্ত আরাম—সেযুগে জন্মেছিল পিরামিড বা ঐ রকম সব বিরাট বস্তু। আজকার তড়িতগতির যুগে মন্দাক্রান্তা ছন্দ অচল, এখন সোজা-সরলরেখার ব্যাপার সব…

—কিন্তু তড়িতগতির তড়িৎটা কোন সময়ই সোজা রেখায় চলে না—কাবেরী বলল।

—চলছে বৈকী। সোজা তারের মধ্যে তাকে হাজার হাজার মাইল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

—সেটা মেকী তড়িৎ, ডাইনামো ঘুরিয়ে তৈরী করা—না থাকে বজ্র, না থাকে বৈভব। ঘরের কোণে কয়েকটা বাতি জ্বালা আর কলের কয়েকটা চাকা ঘুরানোতেই সমাপ্তি তার। আতসি কাচ দিয়ে সূর্য্যরশ্মিকে ধরে আগুন জ্বালার মতন শুধু প্রয়োজন মেটে তাতে দৈনন্দিন জীবনের।

দিনকে অতিক্রম করে যে মহাদিন, জীবনকে অতিক্রম করে যে মহাজীবন, সরলরেখায় তাকে ধরা যায় না—বিশ্বের অনন্ত গ্রহ-উপগ্রহের পথ তাই বৃত্তাকার—বক্র।

মোহিতবাবু নিশ্চুপে শুনছিলেন ওদের কথা। একটা ব্যাপার তিনি অজিত সম্বন্ধে লক্ষ্য করছেন, সে কোনো সময়ই 'সারেণ্ডার' করে না। সারেণ্ডার কথাটার ঠিকমত বাংলা প্রতিশব্দ মনে এলো না মোহিতবাবুর অর্থাৎ কাবেরীর মতে মত মিলিয়ে কিছু স্বীকার সে করতে চায় না। কিছুক্ষণ আগে মোহিতবাবুই কয়েকটা কথা বলেছিলেন অজিতকে—'অনাবশ্যকটাই বেশি আবশ্যক'—কিন্তু ওকথা বস্তু-জগতের কথা নয়। মেয়ে তাঁর অর্দ্ধেক বস্তু—অর্দ্ধেক স্বপ্ন—কিন্তু লক্ষ্য করছেন, অজিত তাকে কঠোর বাস্তব দিয়েই জয় করতে চায়। অজিতের মনের এই ভাবটা বড়ই অনমনীয়। মেয়েদের সম্বন্ধে কোনো স্নেহদৌর্ব্বল্য ও মোটে পোষণ করে কি না, ভাবতে লাগলেন মোহিতবাবু। হয়তো এটা ওর বাইরের 'পোজ', ভেতরে ও নিশ্চয় কাবেরীকে 'উইন' করবার চেষ্টাই করছে। এ পথ অসাধারণ-কিছু হতে পারে, কিন্তু এটাও একটা পথ। কথাগুলো ইংরাজি-বাংলায় মিশিয়ে ভাবছিলেন মিঃ চ্যাটার্জি।

কাবেরীর কথায় শুধুই যুক্তি থাকে না, থাকে আন্তরিকতার অনিবার্য্য শক্তি। অজিত আর যেন কিছু কথা খুঁজে পাচ্ছেনা! একটুক্ষণ ভেবে বলল,

—বেশ, উনি ডিজাইনটা তৈরী করুন, তখন দেখা যাবে সেরকম স্থপতি যদি পাওয়া যায়, বাড়ী তৈরী করা যেতে পারে, তবে সময় লাগবে অনেক।

—লাগুক, তাড়াতাড়ি কোন ভাল কাজ করা যায় না।—কাবেরী বলল। অজিতকে আঘাত করেছে সে কিঞ্চিৎ, এটা যে পিতার মনঃপুত

হয়নি তা যেন ও বুঝতে পারছে। বাবা চান, কাবেরী আর সব ছেড়ে আগে বিয়ে করুক, আর বিয়ে করুক এই অজিতকেই। বেশ, তাই না হয় করবে কাবেরী ; এ আর এমন বেশি কি ? স্বপ্নকে স্বপ্নই থাকতে দেওয়া ভাল—বাস্তব কঠিন, কঠোর—নরম বিছানা ছেড়ে তাকে পথের কাঁটা-কাঁকর-কদর্য্যতায় নামতে হয়। সেখানে ইন্দ্রজিতকে না টানাই ভাল। মনে পড়ে গেল শেষের কবিতার লাবণ্যকে—

মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃত মূরতি,
যদি সৃষ্টি করে থাক—

দূর ছাই ! রান্নাঘরে গিয়ে কিছু খাবার তৈরী করলে কাজ দেবে ; অজিত আজ খাবে এখানে।

বললো—মিউজিয়াম সম্বন্ধে আমার আরো কিছু বলবার আছে. বাবার সঙ্গে কাজ সারা হলে বলবো !

—বেশ, বলবেন ! অজিত মৃদু হেসে বললো জবাবে।

কাবেরী উঠেছে, যেতে যেতে বাবাকে বলে গেল যে ওদের কথা শেষ হলে তাকে যেন আবার ডেকে পাঠান হয়। কাবেরী চলে গেল। গেল হয়তো মার কাছে, না হয় নিজের ঘরে, না হয় রান্নাঘরে। মোহিতবাবু ভাবতে লাগলেন, কাবেরী হয়তো মেনে নেবে অজিতকে। মেনে নেবে, কিন্তু মনে-প্রাণে, নাকি মোহিতবাবুকে খুশী করবার জন্য ? অজিত প্ল্যানখানা দেখিয়ে বলল,,

—স্কুল আর কলেজের জন্য এই চারখানা প্লট রিজার্ভ রাখলাম ! শিক্ষার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করা দরকার—হাট-বাজারের থেকে ওটা কম প্রয়োজনীয় নয়।

—হ্যাঁ, নিশ্চয় ! মোহিতবাবু জবাব দিলেন আনমনে, কারণ তিনি অন্য

কথা ভাবছিলেন, ভাবছিলেন কাবেরী সত্যি কি চায় অজিতকে জীবনসাথী রূপে ?

—শিক্ষার ব্যাপারটা আমাদের একটু নতুন ধরণে করতে হবে। অজিত বলতে লাগলো, এতকাল তো ভারতীয়রা গোলামী করার জন্য ডিগ্রীর মোহে ছুটেছে, এখন আর তো তার প্রয়োজন নেই। ভারতের ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এখন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলন করা উচিৎ— যে ভাবধারা ভারতের প্রাণকেন্দ্রকে আজও স্পন্দিত করে।

কথাগুলো বেশ বড় বড় আর ভারী ভারী, মোহিতবাবুর আনমনা মন যেন গ্রামোফোন রেকর্ডে পিন ছোঁয়ানোর মতই সবাক হয়ে উঠলো, কিন্তু তার আওযাজ মেটালিক, তাই মেকী—শিক্ষাকে ধর্ম্মনিরপেক্ষ করার মূলে থাকে তাকে ধারণ করবার শক্তির অভাব—ভারতের ভাবধারায় শিক্ষা তো ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ ছিল না, ধর্ম্মই ছিল সেখানে মূল কথা।

—হ্যাঁ, কিন্তু শিক্ষাকে ধর্ম্মনিরপেক্ষ কেন করবো আমরা ? রাষ্ট্র অবশ্যই ধর্ম্মনিরপেক্ষ হবে, তাতে তো বুদ্ধ, খৃষ্ট, কনফুসিয়াস্ বা জরাথুষ্ট্রের জীবনী জানবার বাধা নেই, বাইবেল বা কোরাণ বা গীতা অথবা বৌদ্ধ সুত্ত থেকে শিক্ষা লাভ করা তো নিষিদ্ধ নয়!—অজিত কতকটা বিস্ময় মাখানো স্বরে বললো।

মোহিতবাবু এতক্ষণে বুঝতে পারলেন যে তিনি অন্যমনস্ক ছিলেন, তবুও তিনি যেন কিছুই বোঝেন নি—এই রকম ভান করে বললেন,

—শিক্ষা থেকেই রাষ্ট্র বা সমাজ গঠনের বনিয়াদ সুরু হয়, এমন কি গোটা জীবনই গঠিত করে শিক্ষা। ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্ম্মশিক্ষা বা ধর্ম্ম-গুরুর জীবনাদর্শ শিক্ষা কথাটা "সোনার পাথর বাটীর" মত শোনায় না কি ?

অজিত কিঞ্চিত ভাবলো, তার পর বললো,—রাষ্ট্রকে ধর্ম্মনিরপেক্ষ যাঁরা করছেন, তাঁরা যথেষ্ট ভেবেই সে কাজ করছেন—কিন্তু শিক্ষাকে

ধর্ম্ম-সম্পৃক্ত না করলে জীবনগঠনে যে বড় ফাঁক থেকে যাবে, তা পূরণ করা যাবে না—এই আমার মত। আমি অবশ্য কোনো বিশেষ ধর্ম্মের কথা বলছি না—এই ধর্ম্ম মহৎধর্ম, মানুষের ধর্ম্ম—ঐ সব ধর্ম্মগ্রন্থে যার ইতিহাস আছে, ঐতিহ্য আছে—অনুশীলন করবার পথ নির্দ্দিষ্ট করা আছে…

—কথাটা খুবই খাঁটি তোমার অজিত! কিন্তু আমি ভাবছি গোড়ায় গলদের আশঙ্কা! ধর্ম্মানুগ, বা ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ যেমনই হোক আমাদের রাষ্ট্র, তার একটা ধর্ম্ম থাকবেই। সে ধর্ম্ম বুদ্ধ-খৃষ্ট বা হিন্দু-ধর্ম্ম না হতে পারে, সে ধর্ম্ম হয়তো আগামী যুগের অনাগত কেউ সৃষ্টি করবে, কিন্তু সেটা চাই-ই! যতক্ষণ সেই সম্ভাবনা দেখা না দিচ্ছে, ততক্ষণ মানুষের ব্যষ্টি বা সমষ্টিগত জীবনে শান্তি এবং আনন্দ আসবে না। রাষ্ট্র বা সমাজ বা পরিবার একান্তভাবেই পার্থিব বস্তু, কিন্তু মানুষের অন্তর-সত্ত্বায় অন্য একটা জিনিষ আছে যা অপার্থিব, একে অস্বীকার করা মূঢ়তা। ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বললে এই অস্বীকৃতির উপর জোর পড়ে এবং রাষ্ট্র অর্থে যখন ব্যষ্টিরই সমষ্টি, তখন ব্যক্তির উপরও জোর পড়ে। এই গলদটা আগামী যুগের পৃথিবীতে ধরা পড়বে, যখন মানুষ পার্থিবতার উপর উঠতে পারবে—রাষ্ট্র, সমাজ এবং পরিবারে তার মন ভরবে না!

—সে ধর্ম্ম যদি দরকার হয়, তা হলে সেটা মানবধর্ম্ম হোক…

—হ্যাঁ, মানবধর্ম্ম—ইন্দ্রজিত যা বলেছিল। আগামী পৃথিবীতে এই মানবধর্ম্মই বিস্তৃত হবে, প্রচারিত হবে। কিন্তু সে ধর্ম্মের মূল সূত্র কি হবে, তা আজও হয়তো আমরা জানি না—সে অবতার হয়তো অবতীর্ণ হননি।

কথাটা কোথায় চলে গেল কোথা থেকে। শিক্ষার কথা হতে হতে কোন এক অনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন এবং প্রবর্ত্তকের আগমন-সম্ভাবনায়।

অজিত ওকথা থামাবার জন্য বললো—তা যখন হয় হবে, আপাততঃ আমাদের সায়ন্তনীতে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কিছু কারিগরী শিক্ষা আর মানুষ হবার জন্য কিছু সৎশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য শান্তিনিকেতন আর শ্রীনিকেতন আমাদের আদর্শ হবে…

—তাই কর। শিক্ষার ব্যাপারটা মস্ত বড় সমস্যা দেশের, তাই অত কথা এসে পড়েছিল। ঐটাই আমাদের গোড়ার সমস্যা। খাদ্যের ঘাটতির জন্য যত চিন্তা করা উচিৎ, শিক্ষার ঘাটতির জন্য তার থেকে কম চিন্তা করা উচিত নয় রাষ্ট্রপালদের।

—তাঁরা চিন্তা করছেন—অজিত বললো—এর মধ্যে আমাদেরও এগিয়ে যাওয়া উচিৎ সহযোগিতার অন্তর নিয়ে।

—হ্যাঁ, রাষ্ট্রব্যাপারে জনমতের সমর্থন এবং সহযোগিতা দুটোই দরকার।

কাবেরী এসে দাঁড়ালো হঠাৎ, বললো—তোমাদের হোল বাবা?

—হ্যাঁ—কেন মা?

—ওঁকে আমার একটু দরকার আছে। মারকেটে যাব—উনি সঙ্গে গেলে ভাল হয়।

—তা বেশ তো, যা!—অজিত উঠে গেল অনুমতি নিয়ে। মোহিতবাবু বসে বসে ভাবতে লাগলেন, অকস্মাৎ কাবেরী কেন অজিতকে ডেকে নিয়ে গেল; নিশ্চয় ওকে বুঝে নিতে চায় ভাল করে। বেশ—বোঝাবুঝি হয়ে যাক ওদের। মেয়ের অমতে নিশ্চয় তিনি তাকে অর্পণ করবেন না অজিতের হাতে।

ভেতরে গেলেন স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবার জন্য। জানালা পথে দেখতে পেলেন—কাবেরী নিজেই গাড়ী চালাচ্ছে, অজিত পাশে বসে। মনটা আশান্বিত হয়ে উঠলো তাঁর।

ইন্দ্রজিত আটকে গেল ওখানে সেদিনের মত; বড়দার সঙ্গে নানান কথা হোল, কিন্তু খুসী হতে পারলো না সে। বিশেষ করে স্বাহার সঙ্গে পূর্ব্বে যে-কয়েকটি কথা তার হয়েছে, তাতেই বেশ বোঝা গেছে যে, আজন্ম বিপ্লবী, আদর্শ-চরিত্র রণাধীশ আর সেই রণাধীশ নেই, কয়েক বছর আগে তাঁকে যেমন দেখেছিল ইন্দ্রজিত; খুবই দুঃখের কথা, কিন্তু স্বাহা এবং লকুর মত সেও অসহায় একান্তভাবে।

—নেতা সঙ্কর্ষণের লেখা সেই দিনলিপিটা কোথায় আছে বৌদি?

—আছে আমারই কাছে। মাটির হাঁড়ির মধ্যে ভরে ঘরের মেঝেতে পুতে রেখেছি। ওতে আর কি কাজ দেবে ঠাকুরপো?

স্বাহার নিরাশ কণ্ঠস্বর বেদনাতুর করে তুলেছিল ইন্দ্রজিতকে। ঐ অগ্নিরূপা নারী কী অসীম নিষ্ঠাভরে ভারতের স্বাধীনতাযজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়েছেন। কত দুঃখ, নির্য্যাতন, নিপীড়ন অবহেলা সহ্য করেছেন—শুধু তাঁর আদর্শ রক্ষার জন্য। আজ তিনি ক্ষুব্ধ, ক্ষুণ্ণ, অথচ আজ ভারত স্বাধীন, আর সেই স্বাধীন ভারতে স্বামী তাঁর গৌরবময় আসনে সুপ্রতিষ্ঠ। কিন্তু তাঁর আদর্শের মৃত্যু হয়েছে—মৃত্যু হয়েছে তাঁর মহিমোজ্জল বংশ-গরিমার—না, মৃত্যু হয়না কোনোদিন আদর্শের। আদর্শই মৃত্যুঞ্জয়। মনে পড়লো নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথা—

"এই নশ্বর জগতে সব কিছুই ধ্বংস হয়, হয় না শুধু ভাবধারা, আদর্শ, স্বপ্ন। আদর্শের জন্য ব্যক্তি জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারে কিন্তু তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আদর্শের মৃত্যু হয় না—বরং তার মৃত্যুর পর সেই আদর্শ সহস্রের জীবনে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এমনি করেই গতি-বাদের চক্র আবর্ত্তিত হয়, এমনি করেই এক যুগের ভাবধারা, আদর্শ, স্বপ্ন—পরবর্ত্তী যুগে বাস্তব মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে ওঠে…।"

আদর্শের মৃত্যু ঘটতে দেওয়া চলবে না—রণাধীশকে ফেরাতে হবে। কিন্তু কি উপায়ে? ইন্দ্রজিত অনেক ভেবেও কিছু ঠিক করতে পারলো না। সেইদিনই বিকালে সুবোধের গাড়ী চড়ে বড়দা গেলেন সেজুতিগ্রাম দেখতে, সঙ্গে গেল রুকু, বৌদি, গণাধীশ আর ইন্দ্রজিত; অকস্মাৎ সেজুতির বাবার শরীর খারাপ হওয়ায় সে যেতে পারলো না; বয়স্ক মানুষ, কখন কি হয়, ভেবে বড়দা বা স্বাহাও কিছু বললেন না। সে বাড়ীতেই রইল; বাবার শরীরটা ক'দিন থেকেই ভাল যাচ্ছিল না, আজ যেন বিশেষ রকম খারাপ হয়ে পড়েছে। সেজুতি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে বসে রইল বাবার পদপ্রান্তে। তমালও রইল আর সাহায্য করবার জন্য অসিত থেকে গেল। সম্পর্কে সেজুতির ভাই হয় আর সেজুতিকে অত্যন্ত স্নেহ করে অসিত।

মোটর গাড়ী যাবার রাস্তাটা এখনও পাকা হয় নি, তবে গাড়ী চালানো যায়, এইরকম করে নিয়েছে সুবোধ, নইলে অসুবিধা হয় ওর। সুবোধ আগেই গিয়েছিল ওখানে,—বিরাট সভা করা হয়েছে, সেই মণ্ডপে বড়দাকে এনে বসানো হোল। শ্যামলিমা উদ্বোধন সঙ্গীত গাইল, আর মাল্য দান করলো অন্য একটি ছোট মেয়ে। বক্তৃতা, বাণী ইত্যাদি প্রচুর হোল, অভাব-অভিযোগ অনেকে জানালো, এবং যথাসাধ্য প্রতিকারের প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গেল বাণীমারফৎ—কাজে কি হবে, তা ভগবান জানেন। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হোল, বড়দার হাতে ওরা একহাজার আট টাকার একটা তোড়া দিলেন। টাকাটা কোথা থেকে কি ভাবে সংগৃহীত হয়েছে, সে রহস্য অবশ্য বড়দা ভালই জানেন—সুবোধই দিয়েছে ওটা গোপনে—সর্ব্বসাধারণ্যে বড়দাকে সম্মানিত করতে হবে তো—ঐ টাকাটা এখানকার উদ্বাস্তুদের মঙ্গলকার্য্যে ব্যয়িত হবে। বড়দা

টাকার তোড়াটা হাতে নিয়ে সজল স্বরে বললেন—

আশ্রয়হীন, আর্ত্ত, অসহায় যাঁরা গায়ের রক্তবিন্দুর মত অর্থ সংগ্রহ করে আজ আমার হাতে এনেছেন, তাঁদের উদার মনোবৃত্তির প্রশংসা না করে পারছিনা; এই অর্থ জনকল্যাণে ব্যয়িত হোক—ব্যয়িত হোক মানব-কল্যাণে, গঠনমূলক কোনো কাজে—যে-কাজের সুফল সারা গ্রাম ভোগ করবে। আমি প্রস্তাব করি, এই অর্থ দিয়ে এখানে একটা লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত করা হোক, জনশিক্ষার জন্য যা কাজ করবে।

প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ গৃহীত হোল ; শ্যামলিমা হবে গ্রন্থাগারিকা,—স্কুলের জন্য অন্য হেড্ মিষ্ট্রেস আসছেন—শ্যামলিমার বয়স অল্প বলে সে-কাজে তাকে স্থায়ী করা সম্ভব নয়। লকুর উপর ভার পড়লো লাইব্রেরীর জন্য পুস্তক নির্ব্বাচনের তালিকা প্রস্তুত করে দেবার এবং কলকাতায় গিয়ে বই কিনে আনবার ভার নিল স্বয়ং সুবোধ। এরপর ইন্দ্রজিতকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করা হোল। ইন্দ্রজিত বললো যে,—দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন আশ্রয় গৃহ, অন্ন এবং বস্ত্র—কিন্তু সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিবেচনা করলে মনের খাদ্য, শিক্ষা এবং সদ্ধর্মাচরণকে উপেক্ষা করা চলে না। লাইব্রেরী একাজে উপযুক্ত। কিন্তু দেশের এই দুর্দ্দিনে আরো অনেক জটিল সমস্যা রয়েছে, যেগুলো সর্ব্বাগ্রে আমাদের দেশবাসীর লক্ষ্য করা উচিৎ—যেমন উদ্বাস্তু সমস্যা, তেমনি অপহৃতা নারী-সমস্যা, তার থেকে বড় সমস্যা হোল উদ্ধৃতা নারীদের জন্য সমাজে স্থান করার সমস্যা, বা তাদের স্বাধীনভাবে উপার্জ্জনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেশের কাজে লাগাবার সমস্যা। নৈতিক পুনর্গঠন, মানবতার মুক্তি, আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ইত্যাদি খুবই ভালো কথা, কিন্তু জাতি-সমাজ-রাষ্ট্র সর্ব্বাগ্রে নীরোগ সুস্থ হওয়া দরকার। সমাজ থেকে অপহৃতা নারী তো চলে যাচ্ছেই, উদ্ধৃতা নারীকেও যদি সমাজ পুনর্গ্রহণ না করে,তাহলে এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ক'দিন টিকবে? নারীই

জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ—যে দেশে উদ্গীত হয়েছে বিশ্বজননীর মুখে, 'স্ত্রীয়াঃ সমস্তা সকলা জগৎসু—" সেই দেশের মানুষের বর্ত্তমান মনোবৃত্তি নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হচ্ছে না,—অসহায়া অবলাকে অবহেলায় ত্যাগ করতে তাদের বাধছে না আজ···ইন্দ্রজিত আবেগময় কণ্ঠে বর্ণনা করে গেল, কী সীমাহীন দুঃখ সহ্য করে তিনটি মেয়ে তার গুরুদেবের আশ্রমে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কী নির্ম্মম অত্যাচার আর অবহেলা চলেছে তাদের উপর। অথচ উদ্ধার লাভ করেও তারা বাড়ী ফিরতে চায় না সমাজের ভয়ে—এর প্রতিকার কি কোনোদিনই হবে না? নারীর উপর পুরুষের এই অত্যাচার চিরযুগের—দম্ভী রাবণের হাতে সীতা, দুর্য্যোধনের হাতে দ্রৌপদী লাঞ্ছিতা অপমানিতা হয়েছে,—আজও হচ্ছে। সন্তানপ্রসূ জননীকে জাতীয়তার পুরোভাগে কখন স্থাপন করতে পারবো আমরা? কানীন পুত্র কখন ঋষি দ্বৈপায়ন হবেন—জবালাতনয় কবে সত্যকাম হয়ে উঠবেন, কর্ণ কখন কুন্তীদেবীকে বলবেন,

···রাজমাতঃ অয়ি,
সত্য হোক, স্বপ্ন হোক, এসো স্নেহময়ী,
তোমার দক্ষিণ হস্ত ললাটে চিবুকে
রাখো ক্ষণকাল···"

ইন্দ্রজিতের বলা শেষ হলে সুবোধ উঠে দাঁড়ালো সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতে। ইন্দ্রজিত বিশেষ অতিথি কি না, ঠিক বোঝা যায় নি—এখন সুবোধ সেটা উল্লেখ করলো এবং বললো যে ইন্দ্রজিতের কথিত সমস্যাগুলো সত্যিই বড় সমস্যা। এখানকার সামান্য শক্তি, তবুও ওর জন্য যেটুকু করা সম্ভব তা করতে সকলেই প্রস্তুত আছেন। সুবোধ এর জন্য কিছু টাকা আর একখানা ঘর দিতে প্রস্তুত। আপাততঃ ঐ মেয়ে তিনটিকে এনে কাজ আরম্ভ করা হোক; কুটীরশিল্প এবং গৃহস্থালীর কাজ শেখাবেন তাঁরা

এখানকার মেয়েদের। স্কুলেও কাজ দেওয়া যেতে পারে, যদি তাঁরা উপযুক্ত হন। কিন্তু, ইন্দ্রজিত আবার দাঁড়িয়ে বললো যে, তাদের জীবিকার্জ্জনের উপায় করে দেওয়া নিশ্চয় ভাল কথা, কিন্তু সমাজে বা পরিবারে তারা ঠাঁই যতক্ষণ না পাবে, ততক্ষণ যে-জীবন তাদেরকে বহন করতে হবে, তা একান্তভাবেই দুর্বহ। অন্ন বস্ত্র আশ্রয় এইখানে যথেষ্ট নয়—মানুষের মনের যে আত্মসম্ভ্রম, অপবিত্রতার গ্লানিমুক্ত না হলে সেটা ক্রমাগত ধিক্কৃত হতে থাকে অন্তরের গোপনে—সে যন্ত্রণা মৃত্যুর থেকে ভয়াবহ।

এ কথার উত্তরে সভার সকলেই চুপ করে রইলেন, দেখা গেল; অর্থাৎ সমাজ-জীবনে সেই মেয়েগুলির স্থান করে দেবার মত মনোবল কারো আছে কি না, জানা গেল না। সুবোধ একটু থেমে তার বক্তব্য বললো আবার, আপাততঃ তাদের এখানে এনে রাখা যাক, পরে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হবে!

ইন্দ্রজিত জানে, গুরুদেব যথেষ্ট বিপন্ন হয়েছেন মেয়ে তিনটিকে নিয়ে। কাজেই বলল যে, এখানে সে তাদের আনবে, এবং যদি তারা একান্তই স্থান না পায় তাদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে, তাহলে তাদের জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থাটাই যথেষ্ট বলে মনে করা হবে, কিন্তু সেই জীবনটা যে পশুজীবন থেকেও গ্লানিকর দুঃখের জীবন, অপমানের জীবন, একথাও সে আর একবার বললো! মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসার এটা লক্ষণ নয়, নারীর প্রতি পুরুষের শ্রদ্ধার এটা নিদর্শন নয়, সমাজের সুবিচারের এটা দৃষ্টান্ত নয়—।

বড়দা সামঞ্জস্য বিধান করলেন—তাদের আনা হোক এবং রাখা হোক; যদি দেখা যায় যে, তারা সমাজে পুনর্গ্রহণের যোগ্যা, তাহলে নিশ্চয় এমন উদার মনোবৃত্তি সম্পন্ন যুবক পাওয়া যাবে, যারা তাদের বিয়ে

করে সমাজে ঠাঁই করে দেবে! এখানকার সমাজ তাদের গ্রহণ করবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে!—বড়দার কথাটা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হোল।

সভা শেষ হচ্ছে; এরপর জলযোগের ব্যবস্থা আছে, ঠিক সেই সময় অসিত এসে খবর দিল যে, সেজুতির বাবার অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না। অসিত এসেছে সাইকেলে। খবরটা দিয়েই সে আবার চলে গেল তখুনি। এদেরও যাওয়া দরকার, অন্ততঃ লকুর, কিন্তু বড়দার মতন মহামান্য অতিথির জন্য প্রচুর জলযোগের আয়োজন হয়েছে এবং লকুও সেখানে কম মাননীয় নয়। সুবোধ বললো,—বৃদ্ধ মানুষ, শরীর তো খারাপই আছে। টিকে যাবেন দু'এক বছর। চলুন, একটু চা জলখাবার খেয়ে সকলেই একসঙ্গে মোটরে যাব—কতক্ষণ আর লাগবে!

লকু খুবই অস্থির হয়ে উঠেছে যাবার জন্য কিন্তু বড়দা বললেন যে, সকলেই একসঙ্গে মোটরে যাবেন। হেঁটে যেতে অনেক সময় লাগবে। লকু নিরুপায় হয়ে রয়ে গেল—স্বাহার পক্ষে পায়ে হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয় অত শীগ্রি কিন্তু ইন্দ্রজিৎ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলো সুবোধের নিমন্ত্রণ - সে শুধু বললো,

—ঐ বাড়ীতে তার ঋণ অগাধ হয়ে আছে, তাকে যেতেই হবে, এবং এই মুহূর্ত্তে।

মোটা লাঠিগাছটা হাতে তুলে সে তখুনি বেরিয়ে পড়লো। মেঠো পথে সোজা রাস্তা আছে, মানুষ চলা পথ, ইন্দ্রজিৎ অতি দ্রুত হেঁটে চলতে লাগলো সেঁজুতিদের বাড়ীর দিকে।—দুর্ভাগিনী সেঁজুতি! ভাবছিল ইন্দ্রজিৎ—কি ওর পরিণাম ঘটবে, যদি বাবা তার দেহ রক্ষাই করেন আজ! কিন্তু ইন্দ্রজিৎ ঈশ্বর বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। যিনি এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালাচ্ছেন, তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন! ভাবনাটা তাঁর হাতে ছেড়ে দিলেই ভাবনা ঘোচে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, রাত্রি-জননী আবির্ভূতা হচ্ছেন। মৃত্যুঞ্জয় মহাকালেরও জননী তিনি—তিনিই আদি, অনাদি, অনন্ত, তিনিই ছিলেন, তিনিই আছেন এবং তিনিই থাকবেন যখন নিবে যাবে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা-রূপী আলোক-দীপ। নিবে একদিন যাবেই, সেদিন 'দিন' শব্দটা আর থাকবে না, থাকবে শুধু রাত্রি, অনন্ত তিমিরময়ী রাত্রি—অথা নঃ সুতরা ভব॥ সেই রাত্রি যেন প্রসন্না হন।

ভাবতে ভাবতে চলছিল ইন্দ্রজিৎ। মনে পড়ছে, বিপন্ন ইন্দ্রজিৎকে আশ্রয় দিয়ে সেজুতি যেদিন আশ্চর্য্য সাহস দেখিয়েছিল, সেদিনের কথা। সেদিন সেজুতি ওভাবে তাকে না রক্ষা করলে হয়তো ইংরাজের কারাগারে আবার যেতে হোত ইন্দ্রজিতকে। কারাগারকে ভয় সে করে না, কিন্তু অকারণ সময় নষ্ট হয় তাতে বিস্তর।

সেজুতির দাদার খবর জেনেছে ইন্দ্রজিৎ, কিঞ্চিৎ ভাল আছেন, শুনেছে। নতুন কি ওষুদ বেরিয়েছে, তাই দেওয়া হচ্ছে ইনজেকশ্যন; হয়তো কিছু দিন বেঁচেও যেতে পারেন। ইতিমধ্যে সেজুতিকে দেখবে কে? সুবোধবাবু অথবা লোকাধীশ?

এসে পড়লো ইন্দ্রজিৎ গ্রামে। পুরুষেরা প্রায় সকলেই সভায় চলে গেছেন। এমন হুযুগে দেশ তো আর নেই বাংলাদেশের মতন—অনেক মেয়েও গেছেন—বিশেষ করে যাদের হেঁটে যাওয়ার অভ্যাস আর স্বাধীনতা আছে। গ্রামটা যেন শূন্য মনে হচ্ছে! হ্যাঁ, শূন্যই তো! অতবড় নেতা চলে যাচ্ছেন, রইল কি গ্রামে আর! রাত্রি নামলো—সূর্য্য অস্ত গেলেন, চন্দ্রদেব উঠলেন না—অমবস্যা।

সত্যি আজ অমাবস্যা নাকি? অন্ততঃ কৃষ্ণ পক্ষ, হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে ইন্দ্রজিতের—অন্ধকার পথ, হোঁচট খাচ্ছে! কিন্তু সব বাধা অতিক্রম করে সে এসে পৌছালো—অসিত দরজায় দাঁড়িয়ে, ঘরের ভেতর বৃদ্ধের

চরণযুগল কোলে নিয়ে সেঁজুতি—তার চোখে জল নাই, আছে উদাস, অসহায়তার আর্ত্ততা শুধু। তমাল একটু একটু করে গঙ্গাজল দিচ্ছে মুখে। বৃদ্ধ এখনো জীবিত—কিন্তু জীবন-দীপের তেল আর নাই, এখন সলতে পুড়ছে। ওঁর হাতে চিরজীবনের সঙ্গী 'গীতা'—যেন পাঞ্চজন্য শঙ্খবৎ প্রতিভাত হচ্ছে।

ইন্দ্রজিত ধীরে এসে দাঁড়ালো কাছে। কথা উনি আর বলতে পারছেন না—ইন্দ্রজিত অবস্থা দেখেই বুঝতে পারলো, সময় হয়েছে ওঁর যাবার। আস্তে উচ্চারণ করলো,

—নমো নমস্তেঽস্তু সহস্র কৃত্য, পুনশ্চ ভূয়োপি নমো নমস্তে।

ইন্দ্রজিতের স্তোত্রের সঙ্গেই হয়তো ওঁর নয়নযুগল চির নিমীলিত হোল—নির্ব্বাণ লাভ করলেন।

—বাবা! বাবা! বাবা!—তমাল চীৎকার করে উঠলো।

—বাবা!...সেজুতি লুটিয়ে পড়লো পায়ে।

ইন্দ্রজিত আর অসিত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঘরের মেঝেতে—, নির্ব্বাক স্থাণুবৎ। বাইরে মোটর গাড়ীর আওয়াজ; ওঁরা এলেন হয়তো —হ্যাঁ, ওরাই এলেন। বড়দা, সুবোধ লকু, স্বাহা, এবং আরো দু তিন জন ভদ্রলোক গ্রামেরই। স্বাহার খোকা গণাধীশও ওদের সঙ্গে। মৃত্যু কোনদিন দেখেনি ছেলেটা এ পর্য্যন্ত। ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। হাঁ করে চেয়ে রয়েছে সেজুতির দিকে! কি হোল—ও বুঝতে পারছে না। শেষে সেও কেঁদে উঠলো; ইন্দ্রজিৎ তাকে কোলে তুলে নিয়ে বললো, —কাঁদিসনে, বল—

তোমার এ প্রাণোৎসর্গ স্বদেশ-লক্ষীর পূজাঘরে
এ সত্য-সাধন,
জানি মোরা, হয়ে গেছে চির যুগযুগান্তর তরে
ভারতের ধন।

এর পর প্রণাম কর—

শিখরে শিখরে কেতন তোমার
রেখে যাবে নব নব,
দুর্গম মাঝে পথ করে নেবে জীবনের ব্রত তব।

বিস্তর লোক এসে গেল কান্না শুনে। উঠোন ভর্ত্তি লোক, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয় অনাত্মীয়; অগ্নিযুগের উপাসক এই বৃদ্ধ সর্ব্বজনেরই শ্রদ্ধাভাজন, রণাধীশের বাবা রুদ্রাধীশের আজন্মবান্ধব এবং স্বাহার পিতা সঙ্কর্ষণের সহকর্ম্মী। আজ স্বাধীন ভারতে মৃত্যু তাঁর শ্লাঘনীয় এবং সগৌরবে শবানুগমনের যোগ্য। ব্যবস্থা সবই ঠিকমত হোল বড়দা আর সুবোধের তদ্বিরে। মাল্যভূষিত মৃতদেহের আলোকচিত্র তুললো স্বয়ং সুবোধ তার 'লাইকা ক্যামেরায়'। চন্দন কাঠও জোগাড় হোল কিছু। নদীতীরে শ্মশান-শয্যায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হোল। তমালই মুখাগ্নি করবে, কিন্তু সেঁজুতিকে সঙ্গে যেতে হবে, কারণ তমাল ছেলে মানুষ। ঘরটা আগলে থাকবে কে? ইন্দ্রজিৎ বললো—অমৃতের ঐ সন্তানের দেহখানা নিয়ে আপনারা চিতায় তুলে দিয়ে আসুন—আমি একা এই ঘরে বসে ওঁর মৃত্যুহীন প্রাণের উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দেব।

চলে গেল শববাহকগণ। সুবোধও যাচ্ছে সঙ্গে; কিন্তু যেতে যেতে সে শুধু ভাবছে, বড়দাকে দিয়ে বিয়ের প্রস্তাবটা সে আজই করাবে ভেবেছিল আর আজই এই কাণ্ড। এখন তো আর সেজুতির সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করা চলে না। কিন্তু এ ভালই হোল—সেজুতি আরো নিরুপায় হয়ে সুবোধের সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। মনটা খুসীই হয়ে উঠছিল তার। অকস্মাৎ শুনতে পেল, লকুকে বলছেন বড়দা,

—বাবার ইচ্ছে ছিলো, তোরও অনিচ্ছা নেই—অরক্ষণীয়া কন্যার বিয়ে হতে পারে—আসছে মাসেই ওটা হয়ে যাক।

সুবোধের চোখ জ্বলে উঠলো।

উৎপলা তার আশ্রম এবং তার কার্য্যক্রম নিয়ে কয়েকদিন থেকে চিন্তা করছে। যে-কাজটা যুদ্ধের সময় সে করবে বলে ঠিক করেছিল এবং যুদ্ধের পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ও যে-মাতৃত্ব উদ্বোধনের কাজ সে করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল নিজের কাছে—বর্ত্তমান দিনের ভাঙনের বিপর্য্যয়ে তা করা কেমন করে সম্ভব—তাই ওর চিন্তার বিষয়। একটা আশ্রম করে কয়েকটা মেয়েকে কিছু লেখা-পড়া আর শিল্প শিক্ষা দেওয়া, আর কয়েকটি বাস্তুহারা বিপন্না মেয়েকে আশ্রয় দান এমন কিছু কাজ বলে ওর মনে হয় না। এটা ভাল কাজ হতে পারে কিন্তু উৎপলার কাজ সূর্য্যের উপাসনা করা—সূর্য্যালোককে আনয়ন করা, যে-সূর্য্যালোক সর্ব্বত্র সমদর্শী, সর্ব্বভূতে স্নেহপ্রবণ, সর্ব্বজনের মঙ্গলকর।

উৎপলা গভীর ভাবে চিন্তা করছে কয়েকদিন ধরে; অবশ্য কৃষ্ণা ছাড়া অপর কাউকে তার চিন্তার অংশ ও দিতে চায় না—কারণ তারা ঠিকমত বোঝে না। লোকাধীশকে পেলে সুবিধে হোত, অতন্তঃ ইন্দ্রজিতকে; কিন্তু ইন্দ্রজিত কোনো কিছু সমাধান না করেই চলে গেল গুরুদর্শনে। হয়তো ফিরবে শিগ্রী, কিন্তু ক বে, তা জানা নেই।

কৃষ্ণা এসে বলল—কি অত ভাবছো পলাদি?

—আয়; ভাবছি অনেক। যে কাজ করবার জন্য এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা, তা হচ্ছে না; যা হচ্ছে, তা হয়তো ভালই কাজ, কিন্তু আমার আদর্শের শেষ নয়।—বলল উৎপলা।

—তোমার আদর্শটা এত বড় যে সাধারণ মানুষের তা বুঝতেই গোল লাগে, পলাদি।

—গোল কিছুই লাগে না কৃষ্ণা, মানুষ বুঝতে চায় না। যুগ যুগ ধরে কত ঋষি, মহাঋষি কত ভাবে, কত ভাষায় বলে গেছেন, মানুষের জীবন-

সাধনায় চারটি এষণা রয়েছে—প্রাণধর্মের স্বাভাবিক প্রেরণায় জীব বাঁচতে চায়—তাকে বলে প্রাণৈষণা, নিজকে পুষ্ট করতে চায়, তাকে বলে অন্নৈষণা. এর পর নিজকে সে চায় প্রবর্দ্ধিত করতে বা সৃষ্টি করতে, তার নাম যৌন-এষণা, আমাদের উপনিষদের ভাষায় তাকে বলা হয় পুত্র-এষণা ; এবং সেই পুত্রদের জন্য যে মমত্ববোধ তাকেই বলে মাতৃ-এষণা—আমাদের দেশে তাকে পরলোক পর্য্যন্ত প্রসারিত করে আধ্যাত্মিক এষণা বলা হয়েছে। এই মাতৃ-এষণাই মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এষণা। এই এষণার জন্যই মানুষ সঞ্চয় করে পুত্রের জন্য বিত্ত, জাতির জন্য ঐতিহ্য। ইতর জীবেরও হয়তো কিছু-কিঞ্চিৎ আছে এবস্তু কিন্তু তার প্রকাশ অতিশয় কম। মানুষের জীবনে এই এষণা শুধু প্রয়োজনীয়ই নয়—অনিবার্য্য। এর প্রভাব তাই মানুষগঠিত সমাজেও ওতঃপ্রোত! সমাজ জীবনেও ঐ চারটি এষণা কাজ করছে আর তারই তাগিদে মানুষের সমাজে যা-কিছু উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ঘটছে। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, মানুষ তার মাতৃ-এষণাকে এড়িয়ে যেতে চায় অপরের বেলায়। এই আপন-পর অনুভূতিটাই যত কিছু নষ্টের জড়!

—এ তো থাকবেই, পলাদি! আপন আছে এবং পরও আছে।

—থাকা উচিৎ নয়, কিন্তু আছে, অতি প্রবল ভাবেই আছে। বস্তু-তন্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় সকল মানুষ সমান হতে পারে না—সে-ব্যবস্থায় এক শ্রেণীর দুর্ব্বল মানুষকে বঞ্চনা করা—আর অন্য শ্রেণীর সবল সক্ষমকে অতিরিক্ত সুবিধা দান করা হয়েছে। এগুলো সব প্রাণৈষণা, অন্নৈষণা আর যৌন-এষণার ব্যাপার—কিন্তু মাতৃ-এষণার চোখে সবাই সমান; সেখানে বঞ্চনার চিন্তা আসে না,—সেখানে সকল মানুষের মানুষটাই বড়, মানুষটাই সত্য—মানুষের মহৎ বৃত্তির উন্মেষ করাই বড় কথা—ধনতন্ত্র বা গণতন্ত্র বা অন্য যে-কোনো তন্ত্র তার কাছে বড় নয়,—তার কাছে সত্য শুধু মানবতন্ত্র বা মানবিকতা।

—কিন্তু সেটা মানুষের গ্রহণীয় হবে কি করে?—কৃষ্ণা শুধুলো।

—হতে পারে; হয়েছিল এই ভারতেই। ঋষিকথিত সাম্যবাদ ত্যাগের ভিত্তিতে ছিল প্রতিষ্ঠিত; এমনকি, তাঁরা পরদিনের জন্যও সঞ্চয় করতে নিষেধ করেছেন। সর্ব্বভূতে স্রষ্টাকে স্বীকার করে সাম্যবাদকে তাঁরা আধ্যাত্মিকতার রাজ্যে এনেছিলেন।—তারই পরিপূর্ণ রূপ হোল মানব-বাদ!—উৎপলা কিছুক্ষণ থেমে বললো, –ধর্ম্মহীন যে বাদ বা Ism তা পুরোপুরি বস্তুতন্ত্রে বিধৃত,—জ্বরাক্রান্ত রোগীর মত সে জ্বালা আর যন্ত্রণায় হতজ্ঞান থাকে,—ওষুধ আর ইনজেকসনের মত সে লোভ আর হিংসাকে আশ্রয় করে—স্বভাব চিকিৎসার শরণাপন্ন হয় না—অর্থাৎ মাতৃ-এষণাকে অথবা আধ্যাত্মিকতাকে করে অগ্রাহ্য—এই স্ববিরোধী এবং স্বভাব-বিরোধী ভাব তাকে ধ্বংসের পথেই টানে। ঋষিকথিত মানববাদ কিন্তু কোন সময়ই বস্তুতন্ত্রকে অগ্রাহ্য করে না। বস্তুতন্ত্র শুধুমাত্র জড়বাদ—কিন্তু মানুষের জীবন জড় আর চৈতন্যের মিলিত রূপ। মানবিকতা চৈতন্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে জড় বা যন্ত্র হতে চায় না—এখানেই তফাৎ। আত্মাকে সে জাগ্রত রাখতে চায়। মানবিকতা তাই বস্তুতন্ত্র এবং আত্মিক-বিজ্ঞানকে একই সঙ্গে মিলিয়ে মানুষের জীবন এবং সমাজ-জীবন গঠনের উপদেশ দেয়। একেই বলা হয় মাতৃ-এষণার বিকাশ।

—এসব কথা সাধারণকে বোঝানো খুব কঠিন পলাদি—কাজে করানো আরো কঠিন, হয়তো অসম্ভব।

—অসম্ভব নয়, সম্ভব হয়েছিল এই ভারতেই; যুগব্যাপী অন্ধকারে আমরা সে ইতিহাস ভুলে গেছি—; উৎপলা দম নিয়ে বললো—আজ যে দাবী পৃথিবীকে তারস্বরে জানাচ্ছে সব ভেঙে গলিয়ে এক ছাঁচে গড়ে তোলার কথা, তা নিতান্ত বস্তুতন্ত্র—মানব-প্রকৃতির কথা তা নয়,—নয়। অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, ইত্যাদিই যথেষ্ট নয় মানবজীবনের প্রয়োজন

মেটাবার পক্ষে—আজ এইগুলোর অভাব খুব বেশী ঘটেছে বলেই ওদের কথাই বেশি বলা হচ্ছে—অর্থ নৈতিক দিক থেকে ওগুলো নিশ্চয় সত্য; কিন্তু জীবন-তত্ত্বের দিকটা অগ্রাহ্য করলে যে অপরাধ আমরা করবো আমাদের আত্মার কাছে,তার ক্ষমা নেই। আমাদের মনের যে অধ্যাত্মক্ষুধা, আত্মজিজ্ঞাসা বা অধ্যাত্মবাদ, বস্তুতান্ত্রিক অভাব মিটলেই তা জেগে ওঠে, এবং সেইটেই আমাদের মানবত্বের পরিচায়ক। এই বৃত্তিগুলোকে ধ্বংস করে, আহার-বিহার আশ্রয়-আরাম দিয়ে গড়া যে জীবন, সেটা জড় জীবন, যন্ত্র-জীবন। কিন্তু মানুষের আকৃতিগত পার্থক্যের মত মনোগত, বুদ্ধিগত, আবেগগত পার্থক্য কিছু কম নয়—প্রতি মানুষের সঙ্গে প্রতি মানুষের প্রচুর পার্থক্য রয়েছে; এই পার্থক্য আর স্বাতন্ত্র্যকে একটি বৃহত্তর ঐক্যে ধারণ করা যায়, তারই নাম দেওয়া যেতে পারে মানবতন্ত্র বা হিউমেনিজম। সামাজিক বা অর্থ নৈতিক সাম্য করতে গিয়ে যদি মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করি, তাহলে আমরা জড়পিণ্ড হয়ে যাব, আর যারা সেই যান্ত্রিক মানুষদলকে চালাবে, তারা কি হবে, কল্পনা করতেও কষ্ট হয়।

—কোনো কোনো দেশে কিন্তু এই রকম চেষ্টা চলছে—যেখানে সকল মানুষ সমান সুযোগ লাভের অধিকারী হবে—সর্ব্বত্র সাম্য থাকবে, অবশ্য সামাজিক, রাষ্ট্রীক আর অর্থ-নৈতিক সাম্য।

—এটাই কিন্তু শেষ কথা নয়; ওর অভাববোধটা তীব্র হয়েছে, তাই ঐ কথাই আজ সকলের মুখে, কিন্তু আমাদের এই ঋষি-পরিচালিত আর পরীক্ষিত ভারতে বহুবার পরীক্ষা হয়ে গেছে বহু রূপে যে সামাজিক, রাষ্ট্রীক আর অর্থ-নৈতিক সাম্য নিশ্চয়ই থাকা প্রয়োজন কিন্তু সেটা হলেও সকল মানুষ সমান হয় না। হলে তারা খুব উচ্চশ্রেণীর মানুষ হবে না—কারণ সকল মানুষ বুদ্ধিতে, বিদ্যাতে, প্রতিভাতে এবং হৃদয়ানুভূতিতে সমান নয়। সকলকে সমান করতে হলে উচ্চবৃত্তিসম্পন্ন মানুষকে নীচের

পৈঠায় নামিয়ে এনে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত করতে হবে—এটা আত্মার বিরোধী অতএব আত্মধ্বংসী, এবং অকল্যাণকর।

—কি জানি, পলাদি, আমার মাথায় অতসব ঢুকছে না!

—না ঢোকার কারণটা আমি জানি কৃষ্ণা, তুই বর্ত্তমান পৃথিবীর কয়েকজন ক্ষমতাশালী লেখকের বই পড়েছিস—যাদের রচনাশক্তি মানুষের মস্তিষ্কে মিথ্যাকেও সত্য বলে প্রতিভাত করায়। কিন্তু ওটা সাময়িক;—সাম্য খুবই ভাল কথা—সামাজিক, রাষ্ট্রীক, বা অর্থ নৈতিক ব্যাপার-গুলোতে সাম্যবাদ অবশ্য স্বীকার্য্য—কিন্তু মানবতার ভিত্তিতে তাকে প্রতিষ্ঠিত না করলে মানুষের চলিষ্ণু জীবনে জড়ত্ব আসবে—আসবে ধ্বংস। জীবন চির প্রগতিশীল, সে তার নিজের পথ কেটে চলবেই—।

কার গাড়ী যেন বাইরে এসে দাঁড়ালো। মিনিটখানেক পরে এসে ঢুকলো কাবেরী। এরকম করে সে এখানে কোনোদিন আসেনা। উৎপলা বিস্মিত এবং উৎকণ্ঠিত হয়ে শুধুলো—কাবেরী, কি ব্যাপার? এসো!

—ব্যাপার অন্য কিছু নয়—বাড়ীতে মন লাগছিলো না, তাই বেড়াতে এলাম। আপনাদের যে কথা চলছিল, চলুক—আমি শুধু শ্রোতা থাকবো। ও বসলো।

—বেশ তো, শোনাবার জন্যই কথা।—উৎপলা আবার আরম্ভ করবে তার বক্তব্য, কিন্তু কৃষ্ণা মৃদু হেসে বললো—বাড়ীতে মন না লাগলে এখানেও লাগবে না; যেখানে লাগবে সে যায়গাটা অনেক দূরে…

—ওসব নয় কৃষ্ণাদি, আমার সমস্যাটা আলাদা; প্রেমঘটিত কিছু নয়, নিছক বস্তুগত!

—বেশ, বস্তুগত ব্যাপার নিয়েই আলোচনা করছি আমরা—উৎপলা বললো—কিন্তু বস্তু বা বাস্তবকে অতিক্রম করেছে বিবর্ত্তন, জড় থেকে যা জীবনে রূপ নিল, তাতে আরোপ করলো চৈতন্য। মানুষের চৈতন্য প্রাকৃতিক

বাস্তবতার চরম পরিণতি, কিন্তু এখনো তা পূর্ণ শক্তি লাভ করে নি।—উৎপলা থামলো একটু—আধুনিক দর্শন বলেন,বিশ্বপ্রকৃতি একটা নিরবছিন্ন অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে—এর নাম সৃষ্টি-বিবর্ত্তন বা Creative evolution। মানুষের মনশ্চৈতন্য অসীম শক্তিশালী কিন্তু বহু-সময়ই তা প্রাণের আবেগে অন্ধ হ'য়ে পড়ে—বিচারশক্তি হারায়—হারিয়ে ফেলে বিবেক-বুদ্ধি। প্রাণশক্তি তখন দানব হয়ে ওঠে এবং মনকে নিযুক্ত করে তার কাজে—ঈর্ষা-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব মানুষের সঙ্গে মানুষের, জাতির সঙ্গে জাতির সংঘর্ষ জাগায়—মানুষের মন আজও সেই প্রবৃত্তিকে জয় করতে পারে নি।

—জয় করা একান্ত অসম্ভব,—কাবেরী বললো—আমি এখানে অন্য কথা বলতে এসেছি পদ্মাদি—কিন্তু আপনাদের ঐ সব বড় বড় কথা শুনে রাগ হয়; ওগুলো শুধু স্বপ্ন, কাব্য, কল্পনা। মানুষ যা ছিল অনাদিযুগে, তাই থাকবে অনন্ত যুগ ধরে। কামকে সে প্রেম বলে ধাপ্পা দেয়, লোভকে প্রয়োজনের কোঠায় ফেলে কুলীন করে, হিংসাতে বীরত্বের ছাপ দিয়ে বাহদুরী নেয়—এই চলছে, চলবে।

—আমি আশাবাদী কাবেরী,—আর্য্যঋষির অমোঘ বাণীতে বিশ্বাস করি আমি; ঐ যে ক্রিয়েটিভ ইভলিউশন,—ওটা কোনোদিন থেমে থাকে নি—ও তার কাজ করে আসছে। মানুষের মনের অনেক পূর্ণতা সে এনে দিয়েছে পৃথিবীতে, যদিও এখনো তা পূর্ণ হয় নি, কিন্তু এই অপূর্ণ একদিন পূর্ণ হবে। একদিন মানুষের মনে জন্মাবে অতিমানস, যার শক্তিতে মানুষ জড় আর প্রাণসত্বার উপর অখণ্ড আধিপত্য করতে পারবে, সে মানুষ সব দীনতা, হীনতা, ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে উঠে হবে দিব্য জীবনের অধিকারী। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় এরই নাম *Supra mentel* আর এই জীবনের নামই *Life divine*। শ্রীঅরবিন্দ 'বলেন—'এই অতিমানসই একদিন মানুষের বুদ্ধির খণ্ডতাকে দূর করে তাকে সমগ্রের, ভূমার

সন্ধান দেবে—খণ্ডকে পূর্ণ অভ্রান্ত সত্য দেখাবে।" আমাদের সাধনা সেই অতিমানসকে অবতীর্ণ করাবার সাধনা—

—তা' হবে পলাদি—কাবেরী করুণ স্বরে বললো। ওর যেন কিছুমাত্র উৎসাহ নেই, যেন এমন কিছু ওর হয়েছে, যা ও বলতে পারছে না কাউকে। উৎপলা শুধুলো—তোমার হয়েছে কি কাবেরী? জীবনে যেন ঝড় আসবার সংকেত পাচ্ছি তোমার!

—ঝড় আসা ভালো পলাদি; অনেক ধূলো বালি আবর্জ্জনা পরিষ্কার হয়ে যায়।

—কিন্তু নবমঞ্জুরিত লতাবিতান নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

—যাক্—কি তাতে ক্ষতি হবে মহাকালের? একআধটা লতাগুল্ম গেলেই বা কি আর থাকলেই বা কি! কিন্তু শুনুন, আমি একটা কাজ নিয়েই এসেছি, নিছক বেড়াতে নয়—কাবেরী যেন কথাটা চাপা দিচ্ছে—কাজটা আমি করতে চাইছি, বাধা অনেক, তবু আমি করবো! বিশেষ কিছু নয়, একটা মিউজিয়াম—যাদুঘর!

—খুব তো ভাল কথা। কোথায় করবে? দিল্লীতে যে জাতীয় যাদুঘর নির্ম্মিত হচ্ছে, তাতে বাঙালী কাউকে ডাকা হয়েছে বলে শুনি নি—বাঙালীকে কতখানা অবজ্ঞার চোখে আজ দেখা হচ্ছে, এসব থেকে তার প্রমাণ মেলে। শিক্ষায়, সাহিত্যক্ষেত্রে তার স্থান হচ্ছে না, জাতীয় যাদুঘর নির্ম্মাণের কমিটিতে তাকে নেওয়া হোল না,—আঠারো মাসের উপর হোল ভারত স্বাধীন হয়েছে—কিন্তু কোনো বাঙালী রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন নি—মিলিটারীতে কয়েকজন আগে থেকে ছিলেন, তাঁরাই যা টিম্‌টিম্ করছেন। বাঙালী 'ইজম্'এর মোহে অন্ধ, তাই দেখেও দেখে না—বাঙলাকে বাঁচতে হলে নিজের সাংস্কৃতিক গরিমা সর্ব্বত্র তুলে ধরতে হবে'—পলা একনিশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল।

—কিছুক্ষণ আগে যে সাম্যবাদ, ঐক্য আর ভূমার কথা তুমি বলছিল পলাদি, এগুলো তার কিন্তু বিরুদ্ধে যাচ্ছে—কৃষ্ণা বললো।

—না—পলা দৃঢ়স্বরে জবাব দিল—ব্যক্তিগত স্বার্থ আর প্রদেশগত ঈর্ষার দ্বারা অপর একটা প্রদেশকে ধ্বংস করা হচ্ছে—এর প্রতিবাদ হওয়া একান্ত আবশ্যক! "এক গালে চড় মারিলে অপর গাল বাড়াইয়া দিবে" এই নীতির যতই জয়গান কর—চড়টা যে মারে, তাকে প্রশ্রয় দিয়ে চণ্ডাল করে তোলে এই নীতি! বাঙালী সয়েই যাচ্ছে, কারণ বাঙালীর অধিকাংশই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী আর মসিজীবী কেরাণী। যারা কিছু শক্তি অর্জ্জন করেছেন, তাঁদেরকেই হাত করে নিচ্ছেন অপর পক্ষ টাকায়, সম্মানে বা যেকোনো রকমে। আর নির্ব্বোধ বাঙালী নিজের দেশে হাজার দল করে, হাজার মতবাদ নিয়ে মেতে রয়েছে, যখন তার ঘরের সব সোনা চুরি হয়ে গেল। স্বাধীন ভারতে আজ বাঙালীর অবস্থা দেখ,—বাংলা আজ সমস্যা-সঙ্কুল প্রদেশ। তাকে কেটে ভাগ করা হোল,—তার উদ্বাস্তুদের স্থান দেবার জন্য জমি দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না—তার ভাষাভাষী প্রদেশগুলি দেবার কথা উঠলেই ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে,—কত বলবো—বলতে বিরক্তি বোধ হয়—উৎপলা থামলো।

—তা ঠিক পলাদি, সারা ভারতে আজ পুঁজিবাদের খেলা চলছে, মধ্যবিত্ত-প্রধান বাংলা মরতে বসেছে···

—মরবে না, বাঙালী মরলে ভারতকে কেউ বাঁচাতে পারবে না! যুগ-যুগ ধরে এই গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমিই জাতিকে, জাতিয়তাকে, ধর্ম্মকে আর কর্ম্মকে জীবন্ত রেখে এসেছে—এখনও রাখবে। বাঙালী মৃত্যুঞ্জয়, "মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে করি ঘর···

কবিতাটা শেষ না করে উৎপলা উঠে পড়লো। শান্ত হয়ে উঠলো ওর মুখ একটু পরেই। হেসে বললো—দুঃখ এতো বেশী যে উত্তেজিত হয়ে

পড়ি। এইটা দোষ আমার! যাক্—তোমার মিউজিয়ামের কি ব্যাপার, বলোতো!

—ব্যাপার অন্য কিছু নয়—আমাকে সকলে সাহায্য করবেন। বাবা যে নতুন নগর পত্তন করছেন 'সায়ন্তনী' সেখানেই করবো মিউজিয়াম। অবশ্য জাতীয় মিউজিয়াম বলতে কি বোঝায়, আমি জানি না—এতবড় কাজ একা করা সাধ্যও নয় কারো, আমার মিউজিয়াম হবে প্রধানতঃ কলাশালা।

—বেশ, দেখি তোমার চেষ্টাতে আমি কি সাহায্য করতে পারি। ইন্দ্রজিৎ কবে ফিরবে কৃষ্ণা?—উৎপলা শুধুলো কৃষ্ণাকে।

—পরশু বা তার পরদিন!—কৃষ্ণা জবাব দিল। কাবেরীর মুখপানে উভয়েই তাকিয়ে আছে, দেখলো, ওর মুখখানা অনেকটা যেন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে অকস্মাৎ।

—তোমার বাবার কি মত নেই তোমাকে ইন্দ্রজিতের হাতে দিতে? শুধুলো উৎপলা।

—বাবার মতে কি হবে! সন্ন্যাসীর তপস্যা নাই বা ভাঙলাম পলাদি! বিয়ে যাকে ইচ্ছে করা যাবে, কিম্বা না করা যাবে—উপস্থিত কিছু কাজ করতে চাই!

—তা বেশ, কাজ কর, কিন্তু বিয়েই বা না করবে কেন? যাকে ইচ্ছে তাকেই করবে বিয়ে? ইন্দ্রজিতকে তুমি ভালবাস...

—বিয়ের অর্থটা তো কতকগুলো ছেলেমেয়ের আইনসঙ্গত ভাবে জন্মদান—এছাড়া আমিতো আর কোনো অর্থ পাইনে প্রেম-ভালবাসার। সেখানে ইন্দ্রজিত বা অতিকায়, সবই সমান।

—কি সব বলছো কাবেরী? উৎপলা ধমকে দিল।

—বলছি, ভালোবাসলেই বিয়ে করে তার অসুবিধা ঘটাতে হবে কেন পলাদি ?···ভালবাসা কি বিয়ে ছাড়া টেকে না ? তা যদি হয় তো ভালবাসাটা হোল সন্তান-আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথ, কিন্তু সেটা কি সত্যি ভালবাসা, না কি প্রয়োজনের তাগিদ ? সে তাগিদ তো যাকে দিয়ে ইচ্ছে পুরণ করা যেতে পারে।

—ভুল করছো কাবেরী, ওটা বাস্তব-জীবনের, অথবা পশু-জীবনের ব্যাপার। সন্তানের জন্মদান যে কোনো পুরুষকে দিয়ে হতে পারে, কিন্তু মানব-জীবনের উদ্দেশ্য তাতে সফল হয় না। তাকে সফল করতে হলে প্রেম-জীবনে আসতে হবে, কারণ আগেই বলেছি, জীবনের উদ্দেশ্য মহাজীবন লাভ—যাকে বলে *Life divine* ; সন্তান সৃষ্টির জন্য স্বামী গ্রহণ পশুর কাজ, কিন্তু মানুষের জীবন পশুত্বকে অতিক্রম করারই সাধনা করে—করবে। নইলে পৃথিবীযোড়া এত প্রেম-কাব্যের কোনো অর্থ হয় না, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অনর্থক হয়, অর্থহীন হয়ে পড়ে নার্সিসাসের উপাখ্যান !

—জৈব প্রেরণার বলেই কিন্তু নারী পুরুষের ভালোবাসা জাগে।

—জাগে বস্তু জগতের প্রয়োজন মেটাবার জন্য ; আদিতে হয় তো ছিল এই রকম, যখন ভালবাসার প্রয়োজন হোত না—শুধু সন্তান-লাভটাই লক্ষ্য ছিল। শ্বেতকেতুর উপাখ্যানে এইরকম কথা আছে পুরাণে—কিন্তু মানুষ সে-যুগ ছাড়িয়ে এসেছে। নিয়তির বিবর্তন তাকে অগ্রগামী করেছে ; জৈব-প্রেরণাকে ছাড়িয়েও অজৈব অহেতুকী প্রেমের সে অধিকারী হয়েছে, অন্ততঃ তার কাব্যে, সাহিত্যে—অর্থাৎ তার মানসিক আদর্শ গেছে সেই দেবমন্দির-দ্বারে, যেখানে সৃষ্টিস্রোতের জন্য প্রজননটাই শেষ দেবতা নয়—প্রেমই সেখানে শেষ দেবমূর্ত্তি। এই প্রেম-জীবনই ঋষি কথিত Life Divine.

কাবেরী আর কিছু বললো না, বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরলো।

মোহিতবাবু স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেছেন যে ইন্দ্রজিতকে নিয়ে আর বেশি বাড়াবাড়ি করা হবে না; যদিও তাঁরা জানেন যে ইন্দ্রজিতই কাবেরীর অভিপ্রেত, তবুও মোহিতবাবুর খুব ইচ্ছা কোনোদিনই ছিল না তাকে জামাই করবার। গত কয়েকদিন পূর্ব্বে ইন্দ্রজিত এলো এবং কাবেরীর সঙ্গে তাকে মেলামেশার যথেষ্ট সুযোগও দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ইন্দ্রজিৎ তার পর বেভাতে বেরিয়ে সেই যে গেল, আর ফেরে নি; মেয়েও কিছু বলে না তার সম্বন্ধে; বরং তার আচার-ব্যবহারে বোঝা যায় যে, সে ইন্দ্রজিতকে ভুলবার চেষ্টা করে অজিতকেই আঁকড়ে ধরতে চাইছে! কাবেরীর মা অবশ্য প্রতিবাদ করে বললেন যে ওটা তার বাইরের রূপ, অন্তরে সে ইন্দ্রজিতকেই চায—কিন্তু ইন্দ্রজিত হয়তো অস্বীকার করেছে বিয়ে করতে, তাই আমাদের খুসী করবার জন্য কাবেরী ওরকম অভিনয় করছে; কিন্তু মোহিতবাবু তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন কিছুদিন পূর্ব্বে তাকে কাবেরী বলেছিল, "ইন্দ্রজিতকে সে ভালবাসলেও বিয়ে করতে চায় না—কারণ ইন্দ্রজিতের জীবন স্বপ্নময়—বাস্তব-জগতে তাকে নিয়ে ঘর বাঁধা চলে না—ইতিমধ্যে অজিতকে সে চিনেছে এবং বুঝেছে যে, অজিত সবরকমে তার যোগ্য পাত্র—সুন্দর, শিক্ষিত, সু-ব্যবসায়ী, সচ্চরিত্র—যে সব গুণ মেয়েরা পছন্দ করে, তার সবই আছে অজিতের। কাব্যময়ী কাবেরীর মনের ক্ষুধা সে মেটাতে পারবে, বাস্তব জগতেও সে পিছিয়ে থাকবে না কোনখানে, তাছাড়া মোহিতবাবুর বিপুল সম্পদ রক্ষার পক্ষে অজিত অত্যন্ত উপযুক্ত।

মেয়ের মনের ভাবগতিক কিছু বুঝতে না পারার জন্য মা নীরব থাকলেন। এতকাল পরে বাবার মতটাই প্রবল হয়ে উঠলো কাবেরীর বিয়ের ব্যাপারে—ইন্দ্রজিত বাতিল হয়ে গেল ওঁদের কাছে। কিন্তু

কাবেরীকে এখনো খোলাখুলিভাবে প্রশ্ন করা হয় নি অজিত সম্বন্ধে ; তার মতটা পেলেই মোহিতবাবু প্রস্তাবটা করবেন অজিতের কাছে। আর ভালই জানা আছে যে অজিতের দিক থেকে আপত্তির কিছুমাত্র কারণ নাই।

অজিত আজ ফিরবে সায়ন্তনী থেকে। ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাতে বললেন মোহিতবাবু। কিন্তু কাবেরী কোথায় ? সে সেই বিকাল বেলা বের হয়েছে, এখনো ফেরে নি। রাত প্রায় নটা বাজে, অজিত দশটার মধ্যে এসে পড়বে। অত রাত পর্য্যন্ত কাবেরী বাড়ী না ফিরলে ব্যাপারটা ভাল ঠেকবে না অজিতের কাছে।

—মেয়েটা গেছে কোথায় ? কোনো সিনেমা-টিনেমায় নাকি ?

—না, দিল্লী থেকে ওর বন্ধু রেবতী ফিরেছে, তার কাছে গেছে। বলেই গেছে, ফিরতে রাত হবে—ওর মা জানালেন।

—তুমি বললে না কেন যে অজিত আসবে, সে যেন সকাল সকাল ফেরে।

—অজিত তো এখনো তার বর হয় নি যে তার জন্য ওকে সকাল সকাল ফিরতে হবে—বা সেজেগুজে বসে থাকতে হবে। অজিত আসবে বলেই সে হয়তো পালিয়েছে।

—কেন ?

—কারণ অজিতকে বিয়ে সে করতে পারে তোমার মন আর মান রাখবার জন্য—অজিতকে সে ভালবাসে, আমার বিশ্বাস হয় না।

—তাহলে বিয়ে কেমন করে দেওয়া যায় ? কিন্তু তুমি ভুল করছো, অজিতকে ভালবাসে বলেই তার আসার সময় অন্যত্র গিয়ে লুকোচুরি খেলছে।

—এরকম করবার মত মেয়ে নয় আমার। অজিত সম্বন্ধে ওর কোনোরকম সেন্টিমেন্ট নেই—না ভাল, না মন্দ! তুমি-আমি যা করবো

তাই ও মেনে নেবে, কিন্তু ও যে সুখী হবে অজিতকে নিয়ে, এ আমি মনে করি না।

—তাহলে থাক—আরো কিছুদিন দেখি···মোহিতবাবু নিরাশকণ্ঠে বললেন।

—থাকলেই ভাল হয়—মা বললেন—ইন্দ্রজিতকে আমি শেষ কথা শুধিয়ে নিতে চাই।

—সে কি আবার ফিরবে ?

—হ্যাঁ, নিশ্চয় ফিরবে ! আসলে কথা হচ্ছে যে তুমিই ইন্দ্রজিতকে চাইছ না !

—না—কিন্তু মেয়ে সুখী হলে আমার চাওয়া-না-চাওয়ায় কিছু যায় আসে না। একটা মাত্র সন্তান—যাকে সে চাইবে, তাকেই নিক—কাকে চায়, সেইটা জেনে নাও।

বাইরে গেলেন মোহিতবাবু; ভাবতে ভাবতেই গেলেন—এসে বসলেন বারান্দায়, ইজিচেয়ারে। ইন্দ্রজিত ছেলে ভাল, সুন্দর, সুশিক্ষিত কর্ম্মঠ, চরিত্রবান, দৃঢ়চেতা,—সবগুণই তার আছে, কিন্তু এক সাংঘাতিক দোষ, নিরাসক্তি। আর ঐ নিরাসক্ত চরিত্রটাই কাবেরীকে আকর্ষণ করে তার। এ খবর অজ্ঞাত নয় মোহিতবাবুর। তিনি দেখেছেন, অজিতও কিছুটা নিরাসক্তির অভিনয় করে, কিন্তু সেটা অভিনয়, কাবেরীর মত বুদ্ধিমতী মেয়ের তা বুঝতে দেরী লাগে না। অজিতের আভিজাত্য আছে, অহঙ্কারও আছে—আত্মপ্রচারের চেষ্টাও আছে; মোহিতবাবুর এগুলো দরকার, কিন্তু মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিশ্চয় তিনি অজিতের হাতে তাকে দেবেন না। অন্য দিকে ইন্দ্রজিত আর যাই হোক—অসাধারণ দৃঢ়চেতা; এ গুণ কদাচিৎ মেলে আজকালকার যুগে; কিন্তু সে যদি বিয়েই করতে রাজি না হয়—মুখখানা কালো হয়ে উঠলো মোহিতবাবুর।

অন্ধকারে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু নিজেই বুঝতে পারছেন তিনি। মেয়েটার জীবনে এ বিপর্যয় কেন ঘটলো! কি তিনি করবেন? বড় মেয়ে, ধমক দিয়ে ভুল শুধরে দেবার বয়স পার হয়েছে তার! কি যে করবেন তিনি!

অজিতকে আজকার রাতটা এখানেই রাখবেন, কারণ বাড়িতে তার নিজের কেউ নেই বলে হঠাৎ এসে অনেক অসুবিধায় পড়ে সে। ঠাকুর চাকর দিয়ে কি তেমন যত্ন হয় কারো! অজিত নিতান্ত আপনার হবে আর দিন কতক পরে, এই জন্যই তিনি এ ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু এখন নিজের ভুল বুঝতে পারছেন। অজিতকে আপনার করা অত সহজ হবে না তাঁর পক্ষে, হয়তো মোটেই সম্ভব হবে না—নিশ্বাস ফেললেন একটা সুদীর্ঘ।

গাড়ী এসে দাঁড়ালো গাড়ী-বারান্দায়। অজিত নামলো—সুন্দর যুবক; কেন যে কাবেরী ওকে গ্রহণ করতে চায় না, কে জানে। স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্!
—এস, গাড়ীতে কোন অসুবিধা হয়নি তো?

—না—ভালই চলে এলাম। বললো অজিত। নিতান্ত মামুলি প্রশ্ন এগুলো। চাকর এসে ওর জুতোর ফিতে খুলে দিতে লাগলো। ওরাও যেন জেনে ফেলেছে, অজিত এবাড়ীর বিশেষ ব্যক্তি। মোহিতবাবুকে কিছু বলতে পর্য্যন্ত হোল না। অজিতের জিনিষপত্র সব উপরে তুলে নেওয়া হোল সেই ঘরটায় যে ঘরে ইন্দ্রজিত কয়েকদিন আগে ছিল একদিন।

কাবেরী এখনো ফেরেনি; নিজের ছোট গাড়ীটা নিয়ে বেরিয়েছে সে। রেবতীর বাড়ী বেশী দূর নয়, এই হিন্দুস্থান পার্কে। পাঁচ সাত মিনিটের পথ—কিন্তু রাত হোল, এখনো ফিরলো না কেন? মোহিতবাবু ভাবছিলেন, ফোন করবেন নাকি একটা?

কাপড় ছাড়বার জন্য অজিত গেল উপরে বাথরুমে। মোহিতবাবু একা বসে রইলেন। আর একখানা গাড়ী ঢুকলো গেটে। হ্যাঁ—, কাবেরীই এলো।

ইজিচেয়ারে বাবাকে বসে থাকতে দেখে কাছে এলো কাবেরী, আস্তে বলল,

—তুমি আমারই জন্যে ভাবছো বাবা, কেমন? কিন্তু কেন ভাবছো?

—তুই ছাড়া আর তো কিছু আমার ভাববার নেই মা। জীবনের যা কিছু করণীয় সবই করে ফেলেছি—তোর ব্যবস্থা হোলেই এখন পরকালের কথা ভাববো।

—মানুষ কিছুই করতে পারে না বাবা, শুধু চেষ্টা করে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখে। তোমার সে-দিকে ত্রুটি তো নেই, এখন তাঁর হাত। কাবেরী বসলো বাবার কাছে।

—অজিত এলো ফিরে। ইন্দ্রজিতের দেখা নেই আজও, তুই সত্যি করে আমাকে আজ বল মা—কার হাতে তোকে আমি দিই? বাবার কণ্ঠ অত্যন্ত মলিন।

—আমি এখনো তোমার কোলে আছি বাবা, তাড়াতাড়ি বিলিয়ে নাইবা দিলে!

—আমার মনে হচ্ছে, সময় অতীত হয়ে গেছে তোকে দান করবার।

—শোনো বাবা, আমাকে যথেষ্ট লেখা পড়া তুমি শিখিয়েছ, আর যতখানা ভাল ভাবে মেয়েকে মানুষ করা উচিৎ, তা তুমি করেছ। এ পর্য্যন্ত আমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কোথাও কখনো ক্ষুণ্ণ কর নি। এখন আমার ভাগ্যটাকে আমায় বেছে নিতে দাও।

—তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করছিনা আমরা। আমি শুধু সাবধান করছি যে, তোর যাতে ভুল না হয়। অজিত কোনো অংশে ইন্দ্রজিতের থেকে খারাপ ছেলে নয়।

—ও-বাড়ীর ঐ ওদের মেয়েটা তোমার মেয়ের থেকে কোনো অংশে খারাপ মেয়ে নয় বাবা, তাকে তুমি তোমার মেয়ের জায়গায় বসাতে পারবে?

আর কিছু প্রশ্ন করবার দরকার নেই; মোহিতবাবু দিব্যচক্ষে দেখতে পেলেন কন্যার অন্তর। কাবেরী আস্তে উঠে যাচ্ছে, কাপড় ছাড়বে।—শুধুলেন,—বেরতীর সঙ্গে দেখা হোল? সে এখানে আসবে কখন?

—কাল সকালেই আসবে। মীরাটে ও বাঙলা সাহিত্যের প্রচার-সভা নাকি যেন বসিয়ে এসেছে; ও খুব উদ্যোগী মেয়ে বাবা; আমার মিউজিয়ামের কাজে সাহায্য করবে—আর পলাদির কাজেও যোগ দেবে। বিয়ে করবে না। বলল, বিয়ে তো অনেকেই করে। দু একজন না করলে কি হয়! ভাল অনেক কাজ আছে, যা করলে বিয়ে না করার দুঃখ থাকে না! কৃষ্ণাদিরও তাই মত। উৎপলাদিও তো দিব্যি কাটিয়ে দিলেন তাঁর মিশন নিয়ে।

—কিন্তু তোর ব্যাপার আলাদা কাবেরী—মোহিতবাবু তাড়াতাড়ি বাধা দিলেন,—তুই আমাদের একমাত্র সন্তান; আমার জীবন এবং মরণ তোকে ঘিরেই ঘুরছে। বিয়ে তোকে করতেই হবে, তা সে যাকেই হোক……

—আচ্ছা বাবা, বিয়ে আমি করবো, তুমি যাকে পছন্দ করবে, তাকেই। কাবেরী ফিরে এসে বসলো বাবার কাছে। বললো—আমার মার বেলা, ঠাকুমার বেলা তাদের বাবারা ঠিক করেছিলেন পাত্র, আমার বেলাও তুমিই ঠিক কর। তোমরা যাকে দেবে তাকেই নেব আমি।

—তা আর হয় না মা,—তাদের সময় আর তোর সময় এক নয়! এটা আলাদা যুগ। সেকালের সতীত্ব আর পাতিব্রত্য একালের মনস্তাত্বিক জটিলতায় এসে পথ হারিয়ে ফেলেছে।

—সতীত্ব আর পাতিব্রত্য খুব জোরালো সার্চলাইট বাবা, পথ হারাণোর ভয় থাকে না ও দুটো থাকলে। তোমার মেয়েরও ওগুলো থাকবে।

—আচ্ছা মা, কাপড় চোপড় ছাড় গিয়ে।

কাবেরী চলে গেল। মোহিতবাবু ঠিক করলেন,—ইন্দ্রজিত ছাড়া আর কারো হাতে কন্যা দান করবার কথা কল্পনাও করবেন না তিনি! কিন্তু ইন্দ্রজিত যদি না ফেরে বা ফিরেও রাজী না হয় কাবেরীকে গ্রহণ করতে? ভগবান জানেন, মেয়েটার ভাগ্যে কি আছে! উপরে উঠে গেলেন মোহিতবাবু; রাত হয়েছে, খাবার ঘরে গেলেন—কাবেরীও রয়েছে ওখানে, আর আছে অজিত। কাবেরীর মা তাকে বসিয়ে কথা বলছেন। মোহিতবাবু এসে বসলেন খেতে। কাবেরী চুপচাপ বসে পেঁয়াজ কাটছিল।

—মানুষের জীবনে এখন দুঃখের অন্ত নেই, এর মধ্যেই যেটুকু সুখ আহরণ করা যায় তা ছাড়া বোকামী—অজিত বলছিল—ওখানে যাঁরা যাবেন, তাঁদের যতটা সম্ভব সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে—ষ্টেশন, পোষ্টাপিস, টেলিফোন, ইলেকট্রিক, যুগের য কিছু প্রয়োজনীয় সবই থাকবে। যায়গাটাও স্বাস্থ্যকর আর সুন্দর!

—তা যেন হোল, কিন্তু কলকাতা যাতায়াতের পক্ষে বড় অসুবিধা হবে যে!

—তার আর কি করা যাবে? ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেণ। অবশ্য মোটর থাকলে মেল লাইন ধরা যেতে পারে কিন্তু মোটর তো সকলের থাকবে না—তবে মোটর-বাস চালানো যেতে পারে এর পর।

—ওদিকটা বছর কতকের মধ্যেই ভর্ত্তি হয়ে যাবে মানুষে—, মোহিতবাবু বললেন।

—কয়লাখনি আছে নাকি ওদিকে ? মা শুধুলেন।

—হ্যাঁ আছে, তাছাড়া আরো হচ্ছে। অবশ্য কয়লা খুব ভাল কি না জানি না।

—ওগুলো সব ইন্‌ডাসট্রিয়াল এরিয়া—মোহিতবাবু বললেন—মানুষের খেটে খাবার ব্যবস্থা কাছাকাছি খনিতে বা ফ্যাক্টরীতেই হতে পারবে। কাছাকাছি কয়েকটা বড় কারখানা রয়েছে, আরও হচ্ছে……

— আমাদের কিছু কারখানা ওদিকে হচ্ছে নাকি বাবা ?—কাবেরী হঠাৎ শুধুলো বাবাকে।

—না—একটা গ্লাস ফ্যক্টরী খুলবার ইচ্ছে আছে আমার—বড় স্কেলেই খুলতে চাই।

—তাহলে তো ভালই হয়—অজিত বললো—নদীর ওপারে যে গ্রামটা হয়েছে, শুনলাম, তার কাছে কি যেন একটা ফ্যাক্টরীও করছেন তাঁরা, ওখানকার লোক কাজ পাবে। ওটা করছেন সুবোধবাবু নামে একজন জমিদার—গ্রামের নাম দিয়েছেন সেঁজুতি-গ্রাম।

—কি নাম ? কাবেরী প্রশ্ন করলো সোজা অজিত কে !

—সেজুতি গ্রাম—সায়ন্তনীর সঙ্গে যথেষ্ট ধ্বনিসাম্য আর অর্থ-সাম্য আছে।

—থাকবেই তো,—এটা সাম্যের যুগ—হাসলো কাবেরী—কিন্তু সায়ন্তনী সহর, সেঁজুতি গ্রাম—এটা অভিজাতদের, ওটা অনভিজাতের, সাম্য কি করে হবে ?

—আগামী দশকে অভিজাত আর অনভিজাততে ভেদ উঠে যাবে। অজিত বলল।

—না—রক্তের কৌলিন্য, অর্থের কৌলিন্য, বংশের কৌলিন্য, পদগৌরবের কৌলিন্য—এসব কি একেবারে উঠে যাবে, ভাবেন? আমার তো মনে হয় না। এভাবে না থাক, অন্য ভাবে থাকবেই ওগুলো। সোভিয়েট রাশ্যার কথা তুলবেন না, সেখানে কি হচ্ছে, তা আমরা সত্যিই জানি না—যা জানতে পারি, তা হয়তো প্রপাগেণ্ডা!

—না—ওর মধ্যে অনেকখানাই সত্য—অজিত দৃঢ় কণ্ঠে বলল।

—আমি বিশ্বাস করিনে—মানব-মুক্তির অতবড় সম্পদ সাম্যবাদকে সোভিয়েটের ক্ষমতা বিলাসী কয়েকজন রাষ্ট্রনেতা যেভাবে প্রয়োগ করছেন, তাতে কল্যাণ কতখানি, তা আমরা আজও জানি নে! কারণ, ঐ নীতি প্রয়োগ করতে হলে যে উদার অন্তর্দৃষ্টি আর নির্লোভ মনোবৃত্তির দরকার তা কৈ দেখা যাচ্ছে? পূর্ব্বের সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙেছে তারা, কিন্তু নতুন সমাজের পাশেই আবার আভিজাত্য আর কৌলিন্যও বেশ গজিয়ে উঠেছে। মুচির ছেলে লর্ড-পরিবারেই বিয়ে করতে চায় ক্ষমতা লাভ করার পর—জেনারেলের জীবনযাত্রার সঙ্গে সাধারণ সৈনিকের জীবনযাত্রা এক নয়,—সাম্য কোথায়? কারখানার ম্যানেজার আর মজুর কি একই রকম ঘরে থাকে? এসবের উত্তর কে দেবে আমাদের? সাম্রাজ্যবাদ হয়তো যাবে, ধনতন্ত্রও হয়তো টিকবে না—কিন্তু ঐ যে সাম্যবাদ, ওরই বা আয়ু কতকাল, কে জানে! সামাজিক সাম্য, অর্থনৈতিক সাম্য না হয় হোল, কিন্তু মানুষের জীবনের এই কি শেষ কথা? নীট্সে, অরবিন্দ বা রবীন্দ্রনাথের মানবত্ব কি শুধু এই—? জীবন-দেবতার মন্দির কি অত কাছে?

অজিত বুঝতে পারছে না, কাবেরী কি বলতে চায়, বা কি বললে সে খুশী হয়। তর্ক ওর সঙ্গে করতে চায় না সে; তাই হেসে বললো, জীবনদেবতা কবিকল্পনা, সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার!

—রাষ্ট্রও নৈর্ব্যক্তিক নয়, এমন কি, ব্যক্তির জন্যই রাষ্ট্র বা সমাজ। সমাজ-জীবনের অন্তহীন জটিলতাকে অত সহজে আর অস্বীকার করা যায় না, শুধু খাওয়া-পরা-শোবার ব্যবস্থা দিয়ে। মানুষ শুধুমাত্র জীব নয়,—জীবনদেবতার সে উপাসকও, তার অনন্ত ক্ষুধা মেটাতে পারেন তিনিই।

অজিত চুপ করে রইল।

উঁচু-পাহাড়ের উপর আশ্রম সন্ন্যাসীর ; অন্য সবরকম সুবিধাই আছে, শুধু জলের জন্য নীচে যেতে হয়। অনেকটা দূরে যে ক্ষীণকায়া নির্ঝরিণী, সেটাও এখান থেকে নীচে—কিন্তু মেয়েগুলি ঐখানে গিয়েই স্নানাদি সেরে আসে। অবশ্য সন্ন্যাসী ওদের সাবধান করে দিয়েছেন, বাঘ-ভালুকের জন্য নয়, মানুষের জন্য। মানুষ যে বাঘ-ভালুক-সাপের থেকে বেশি হিংস্র—মানুষের ইতিহাসের পাতায় তার অজস্র প্রমাণ মেলে।

ইন্দ্রজিৎ ফিরলো না কেন, ভাবছিলেন সন্ন্যাসী—কোনো বিপদে পড়লো না তো? কিন্তু বিপদ কি হতে পারে এখন আর? স্বাধীন দেশ, আর সেই স্বাধীন দেশে তারা মাত্র ধর্ম্মপ্রচারক—তবুও ভয় হয়, কারণ রাষ্ট্র নাকি ধর্ম্মনিরপেক্ষ। তবে এঁদের ধর্ম্মটা কোন বিশেষ ছাপমারা ধর্ম্ম নয়, জীবনকে মহনীয় করবার ধর্ম্ম, মহামানবের আবির্ভাব-তপস্যার ধর্ম্ম, লোকোত্তর অতিমানস সৃষ্টির ধর্ম্ম। তবুও বলা যায় না, মানুষের হিংস্র বৃত্তি কোথায় কি রূপ নেবে।

মেয়েগুলি স্নান করে ফিরে এলো। ওরাই রান্না চড়াবে। সন্ন্যাসী উঁচু ঢিবিতে বসে দেখতে লাগলেন, বনপথে বা পাহাড়ের গায়ে ইন্দ্রজিতের মূর্ত্তি চোখে পড়ে কি না। কে যেন একটা আসছে, বন্য জানোয়ার নয়, কারণ ঠিক পথে-পথেই আসছে সে। এত দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না, সে আসছে না যাচ্ছে। সন্ন্যাসী অপেক্ষা করতে লাগলেন।

মেয়েগুলির মধ্যে একজন বললো এসে—স্নান করতে গিয়ে দেখলাম বাবা, অনেক শিকারী ঐদিকে কি যেন খুঁজছে, তাড়াতাড়ি আমরা পালিয়ে এলাম !

—তোমাদের দেখেছে ? কতজন হবে তারা ?

—দেখেনি, আমরা পাহাড়ের আড়ালে ছিলাম। ওরা আট-দশজন হবে।

—ওরা শিকারী, না আর কিছু মনে হোল মা ?

—দূর থেকে দেখলেও আমার মনে হোল, হয়তো ওরাই সেই শয়তানরা।

মেয়েটির ঠোঁট কাঁপছে ভয়ে। অন্য মেয়েদুটিও দাঁড়িয়ে আছে। মুখ শুকিয়ে গেছে ওদের। সন্ন্যাসী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে অন্য একটা উঁচু পাহাড়ে উঠে দেখতে লাগলেন ; ঠিক দেখা যায় না, কিন্তু বিজন অরণ্যভূমি যেন কয়েকটা প্রমত্ত জানোয়ারের পদবিক্ষেপে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মানুষ দেখতে পেলেন না উনি ; তবু দীর্ঘ দিন এই বিজনতায় বাস করার জন্য সামান্য চাঞ্চল্য উনি বুঝতে পারেন ; অতি গোপনে কারা যেন শিকার খুঁজে ফিরছে মনে হোল ; অথচ শিকারী তারা নয়, হলে গুলি-বন্দুকের আওয়াজ পাওয়া যেত। তাহলে ওরা কি সেই দস্যুদল, যাদের হাত থেকে মেয়ে তিনটীকে তিনি ছিনিয়ে এনেছেন ! মেয়েগুলিকে কোথায় তিনি লুকোবেন ভেবে অস্থির হয়ে পড়লেন। এখানে যে গুপ্তগুহা আছে, সেখানে ওদের রাখা নিরাপদ হবে না কারণ ওরা নিশ্চয় এদেশের কোনো লোককে সঙ্গে এনেছে, যে এই অরণ্যভূমির সব খবরই রাখে। নইলে ওরা এখানে আসতে সাহস করতো না। সন্ন্যাসী মুহূর্ত্ত কয়েক চিন্তা করেই ঠিক করে ফেললেন মতলব। বললেন,

—আগুনটা নিবিয়ে দে মা—তাড়াতাড়ি তিনজনে চলে আয় আমার সঙ্গে।

—কোথায় বাবা?

—ঐ নীচে সাঁওতাল পাড়ায়। শিগ্‌গী, দেরী না হয়।

ওরা তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এল। সন্ন্যাসী ওদের নিয়ে বিপরীত পথে হাঁটতে লাগলেন পাহাড়ে পাহাড়ে। যতখানি দ্রুত চলা সম্ভব এই বয়সে, উনি চলছেন, কিন্তু মেয়েগুলি হাঁটতে পারছে না। সন্ন্যাসী বিব্রত হয়ে পড়েছেন খুবই, কিন্তু ওদের অনভ্যাস, তাছাড়া ওদেব শরীরও দুর্ব্বল আছে এখনো। চলতে লাগলেন সাঁওতাল পাড়ার উদ্দেশ্যে

সেঁজুতির বাবার ঔর্দ্ধদৈহিক কৃত্য শেষ করে ওদের ফিরতে প্রায় ভোর হয়ে গেল। ইন্দ্রজিত বসে ছিল বাড়ী আগলে। ওরা ফিরলেই সে বড়দাকে বললো, তাকে শ্রীগুরুদেবের কাছে যেতে হবে। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত থাকবেন। বড়দা সম্মতি দিলেন এবং অনুরোধ করলেন, মেয়ে তিনটিকে নিয়ে যেন ইন্দ্রজিৎ পরশুই ফিরে আসে। ওদের ব্যবস্থা করে বড়দা লকু, সুবোধ আর ইন্দ্রজিতকে নিয়ে কলকাতা যাবেন। ইন্দ্রজিত দেরী না করে বেরিয়ে পড়লো তখনই। ভোর ঠিক হয় নি, কিন্তু পথ অনেকখানা, তাই সে আর দেরী করলো না। আসার সময় সেঁজুতিকে বলল,—দাদা তার কিঞ্চিৎ ভাল আছে, তবুও এই সাংঘাতিক খবরটা যেন সাবধানে তাকে জানানো হয়। কারণ, ভাল থাকলেও তিনি এখনোও সুস্থ হননি।

—আপনি ফিরে আসুন।—বড় বড় ফোটায় অশ্রু গড়িয়ে পড়লো চোখ দিয়ে।

—কাঁদবেন না। অমৃতলোকের যাত্রী যে বীরের দল, আমাদের শোক যেন তাঁদের অমর আত্মাকে আবিষ্ট না করে। তিনি আছেন আমাদের জীবনের আহিতাগ্নিতে. যে অগ্নি তিনিই আহরণ করে দিয়ে গেছেন আমাদের।

ইন্দ্রজিৎ বেরিয়ে পড়লো। দ্রুত হাঁটতে পারে সে। নির্জ্জন নিস্তব্ধ পথ—বাসন্তী কুসুমের গন্ধভারাতুর। গান গাইতে ইচ্ছে হয় এই জনবিরল অরণ্যপথে। অন্ধকার তরল হয়ে আসছে, ঊষার উদয়-ক্ষণ সমাগত! ইন্দ্রজিৎ আপনার মনে আবৃত্তি করছে কবিতা,

> তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা,
> এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণ-সজ্জা।
> ব্যাঘাত আসুক নব নব, আঘাত খেয়ে অচল রব,
> বক্ষে আমার দুঃখে তব বাজবে জয়ডঙ্ক;
> দেব সকল শক্তি, লব অভয় তব শঙ্খ॥

উদাত্ত কণ্ঠ ইন্দ্রজিতের, কিন্তু কবিতা আবৃত্তি করে মন ভরছে না। মনটা যেন কি এক অসহনীয় পুলক-ব্যথায় অনুরঞ্জিত হয়ে আছে। কী এ? এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এক মহান মানবের মহাপ্রয়াণ সে দেখে এল। মানুষের জীবন-সাধনার বিফলতা আর সফলতার অনিবার্য্য বিবর্ত্তনটাও অনুভব করলো ঐখানেই। নিয়তির চক্রে নিষ্পেষিত মানুষ নিতান্তই নগণ্য প্রকৃতির কাছে—প্রাক্তনের কাছে। প্রাক্তন? ইন্দ্রজিৎ ঘোরতর অদৃষ্টবাদী হয়ে উঠলো নাকি? হাঁ, তাই তো!

মানুষের অদৃষ্ট তাকে কোথায় কেমন করে নিয়ে যায়, কেউ জানে না। জানবার উপাও নেই, তাই তার নাম অ-দৃষ্ট। তাকে দেখা যায় না। কে জানতো কাবেরীর মত অভিজাতা মেয়ে ইন্দ্রজিতের মত পথের মানুষকে ভালবাসবে! সর্ব্বহারা ইন্দ্রজিতই বা কেন অতখানি উচ্চাশা আজ পোষণ করছে! কী সে করবে কাবেরীকে নিয়ে? কোথায় রাখবে? অথচ প্রায় সম্মতি সে দিয়ে এসেছে তাকে গ্রহণ করবার। না—সম্মতি ঠিক দেয়নি ইন্দ্রজিৎ। কাবেরী ঐ ইঞ্জিনীয়ারকেই গ্রহণ করুক, সুখী হোক, সন্তান আর সম্পদে পূর্ণা হয়ে উঠুক প্রবৃটতরঙ্গিনীর মত। কিন্তু ছিঃ, কি সব ভাবছে ইন্দ্রজিৎ! কাবেরী তো তাকে আত্মদান করেই বসেছে। এখন আর ওসব ভেবে লাভ কি? এখন কাবেরীকে গ্রহণ না করার অর্থ কাপুরুষতা শুধু নয়, কর্ত্তব্যচ্যুতি।

ইন্দ্রজিত পুলক-বেদনার কারণটা অনুভব করলো। এই পাওয়া-না পাওয়ার আকুতি, এই পার্থিব-অপার্থিব মনোবৃত্তির দ্বন্দ্ব—এই সন্ন্যাস-জীবনের মৃত্যুর সঙ্গে সংসারজীবনের জন্মলাভ!

কিন্তু এখনো দেরী আছে; গুরুদেবের অনুজ্ঞা লাভ হয়নি, মিঃ চাটার্জ্জির মত পরিষ্কার জানা যায় নি—কাবেরীকে লাভ করার দেরী আছে। কিন্তু···ইন্দ্রজিতের মনটা অকস্মাৎ সেঁজুতির সজল চোখের দিকে ফিরলো। কী অভাগী মেয়ে? কোথায় ও যাবে? কি করবে? ওর কৌমার্য্য-মাল্য কার কণ্ঠে আশ্রয় গ্রহণ করবে?—অকস্মাৎ মনটা যেন অত্যন্ত পীড়িত হয়ে উঠলো ইন্দ্রজিতের। সুবোধের দৃষ্টি আছে সেঁজুতির উপর, এ খবর সে আগের বার জেনেছিল, কিন্তু সে দৃষ্টি প্রেমের নয়, প্যাসনেরও নয়, সে দৃষ্টি সোনার হরিণকে পিঞ্জরাবদ্ধ করে ঐশ্বর্য্য বাড়াবার দৃষ্টি—অথবা চলতি পথে প্রাচীন মন্দিরের পানে দৃষ্টি পড়ায় সংস্কারবশে নমস্কার করার দৃষ্টি! শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা কিছুই জানানো হয়

না তাতে—জানানো হয় যুগব্যাপী অজ্ঞতার দাসত্ব। সেঁজুতিকে ভালোবাসে না সুবোধ! নকুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ওকে সেঁজুতির পানে ছুটতে বাধা করছে। কিন্তু সেঁজুতি বড় অসহায় এখানে। কি সে করবে!

ইন্দ্রজিতের আবার মনে পড়লো, কী ভাবে সেঁজুতি তাকে রক্ষা করেছিল বিয়াল্লিশের বিপ্লবের সময়। অকৃতজ্ঞ ইন্দ্রজিত এত তাড়াতাড়ি চলে না এলেই ভাল হোত। অত্যন্ত অন্যায় করেছে সে আজ। আজই আবার ফিরে আসবে সে এই গ্রামে—ঠিক করে ফেললো।

ভোর হয়ে গেছে। গুরুদেবের আশ্রম-পাহাড়টা ধোঁয়ার মত দেখা যায়—যেন মেঘ জমে আছে ওখানে। ঐ মেঘের আড়ালে আছেন সূর্য্য—শ্রীগুরুদেব—তিনি মৃত্যুঞ্জয়। মানবতার আজন্ম উপাসক ঐ বৃদ্ধ ঋষি তাঁর আদি জীবনের গুরু শ্রীঅরবিন্দের সহকর্মী, হয়তো সহধর্মী আজ—ইন্দ্রজিৎ উদ্দেশে প্রণতি জানালো ওখান থেকেই।

কাবেরীকে বিয়ে করবার অনুমতি তিনি দেবেন—কারণ ওঁর ধর্মে বিবাহ নিষিদ্ধ নয়—অতিমানসের আবির্ভাব-সম্ভাবনা সুস্থ-সুন্দর প্রেমজীবনেই নির্ভর করে—এই বিশ্বাস তিনি পোষণ করেন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিবাহ এইজন্যই দশবিধ সংস্কারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে স্থান পেয়েছে—ইহকাল, পরকাল একত্ববদ্ধ হয়েছে দম্পতীর জীবনে। পুত্র লাভ তার ঐহিক উদ্দেশ্য কিন্তু সেই পুত্রকেই পারলৌকিক ত্রাণকর্ত্তা বলে স্বীকার করা হয়েছে। পুত্র শুধু পরিবারের বা জাতির সম্পদ নয়,—জীবস্রোতের আনন্দ-তরঙ্গ, সৃষ্টিকার্য্যে স্রষ্টার অভিপ্রেত কর্ম্ম, ধর্ম্মও!

ধানজমির চাষ ঐদিকটায় কম, কিন্তু রবিশস্য প্রচুর ফলে। ভোরের আলোয় শস্যক্ষেত্র সুন্দর হয়ে উঠেছে; বনজঙ্গলের মাঝে মাঝে সুন্দর

ক্ষেত, নানান শস্যে পরিপূর্ণ। দেশে খাদ্যাভাব, 'গ্রো মোর ফুড এর' আন্দোলন চলছে, কিন্তু ইন্দ্রজিৎ ইতিহাসের কথা ভাবতে লাগলো ;— ভারত কি শুধু কৃষি-প্রধান দেশই ছিল—শিল্প-প্রধান ছিল না ? বিশেষ করে বাঙলা দেশ ? ঢাকাই মসলিন, মুরশিদাবাদী রেশম, বীরভূমী তসর-গরদ-মটকা থেকে কৃষ্ণনগরের পুতুল আর সরভাজা, বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, মানকরের কদমা, কী না ছিল এখানে ? এই চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেও নাকি গোয়ালে গরু, পুকুরে মাছ, তাঁতে কাপড়, ছুতোরে-কামারে মালীতে-কুমারে যে-শিল্প-সম্পদ সেদিন রক্ষা করতো, কোথায় গেল সে-সব ? শোনা গেছে, বহু তাঁতীর বুড়ো আঙ্গুল নাকি কেটে নেওয়া হয়েছিল বিদেশী কাপড়কে স্থান করে দেবার জন্য। বহু কামারবংশ উচ্ছন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। এগুলো গল্প না ইতিহাস ? ইতিহাস যদি তো এই স্বাধীন ভারতে তার অনুসন্ধান করে ইতিবৃত্ত লেখা হচ্ছে না কেন ? সেই সব শিল্পীবংশকে আবার পুন-স্থাপনের চেষ্টা করা হচ্ছে না কেন ?—কে করবে ? ইন্দ্রজিৎ দীর্ঘশ্বাস ফেললো—যা-গেছে, তাকে আর ফেরানো যাবে না—যাক ! যে দরদী দৃষ্টি নিয়ে মানুষ অতীতের ভিত্তিতে বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ গড়বে, তারই অভাব আজ—মানুষের ভালবাসা আজ আত্মকেন্দ্রিক।

ইন্দ্রজিৎ আর কিছু না ভেবে দ্রুত চলতে লাগলো আশ্রমের পানে। ওখানে যেন কয়েকজন লোক রয়েছে। কে ওরা ? এদিকে তো সাধারণ কেউ বড় আসে না ! সে আশ্রমের কাছে এসে পৌছালো—কিন্তু সাবধান হোল ! লোকগুলো আশ্রমের মধ্যে কি যেন খুঁজছে। লুকিয়ে পড়লো ইন্দ্রজিৎ। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে যে এরা ঐ মেয়ে তিনটিকেই খুঁজতে এসেছে। গুরুদেব কোনরকমে জানতে পেরে ওদের নিয়ে কোথাও লুকিয়েছেন। বিস্তর খুঁজলো ওরা—মেয়েদের কাপড় আর পেটিকোট

টেনে বের করে যাচ্ছেতাই কথা সব বলতে লাগলো গুরুদেব সম্বন্ধে। রাগ হচ্ছে ইন্দ্রজিতের, কিন্তু ওরা সশস্ত্র এবং সংখ্যায় আটদশজন। ইন্দ্রজিতকে দেখতে পেলে রক্ষা রাখবে না। ভাল করে আত্মগোপন করার জন্য ইন্দ্রজিত আরো একটু তফাতে চলে গেল।

কুড়ি পঁচিশ মিনিট খোঁজাখুজির পর লোকগুলো চলে গেল পশ্চিম দিকে। কে জানে, গুরুদেব কোন দিকে লুকিয়ে আছেন? ওরা চলে যাওয়ার পর ইন্দ্রজিত বেরিয়ে এসে দেখলো—সমস্ত গুহাটা ওলোট পালোট করে দিয়েছে। বই পুঁথী উনুনে ফেলে দিয়েছে। ভাতের হাঁড়িটা উল্টে দিয়েছে, আধসেদ্ধ চালগুলো পড়ে আছে পাথরের মেঝেতে।

কি আর করবে ইন্দ্রজিত! চুপ করে বসে খানিক ভাবলো, তারপর উঠে দেখবার চেষ্টা করলো, গুরুদেব কোন দিকে আছেন। কিছুই বুঝতে না পেরে সারাদিন তাঁর ফেরার অপেক্ষায় বসে রইল সাবধানে। দিন কেটে গেল, গুরুদেব বা মেয়েগুলি ফিরলেন না। নিরুপায় ইন্দ্রজিত রাত্রিটাও রইল অপেক্ষা করে। কিন্তু হয়তো গুরুদেব বিপন্ন—মনের অস্বস্তি ওকে যেন চাবুক মারতে লাগল।

সুবোধ অনেক কিছুই ভেবেছিল সেঁজুতির বাবার ঔর্দ্ধদৈহিক কৃত্য করবার জন্য। আদিযুগের বিপ্লবী তিনি—উনিশ-শ' পাঁচ থেকে আরম্ভ করেছিলেন—কাজেই ওঁর মৃত্যুকে শ্রদ্ধা-সম্মান জানানোতে নিজকেও সম্মানার্হ করা যেতে পারে, আর সেঁজুতির অন্তরটাও আকর্ষণ করা যেতে পারে—কিন্তু শবানুগমনের সময় বড়দার মুখ থেকে লকুকে-বলা কথা কয়টা শোনার পর সব উৎসাহ নিবে গেল তার।

কি হবে আর ওসব করে! ধন-মান-ঐশ্বর্য্য সবই তো ওকে কেন্দ্র করেই ঘুরছিল সুবোধের। শিক্ষিত ভদ্র সন্তান সে—গুণ্ডামী করে সেঁজুতিকে অধিকার করবার কথা সে কল্পনা করতে পারে না—কিন্তু কল্পনা যেন জাগছে আজ! শবদাহ্ করে নিজের ঘরে ফিরে সুবোধ ভাবছিল দোতালার বারান্দায় বসে। থ্রি ক্যাসেলস্ সিগারেটের টিনটা শেষ হয়ে গেল, সুবোধ ফাইভ-ফিপটিফাইভ খুলবে, সেটা রেখে বর্ম্মা চুরুটের বাক্স খুললো। বেশ কড়া একটু।—একা, অনন্ত বিস্তৃত পৃথিবীতে, অজস্র অর্থের রথচক্র-ঘর্ঘরিত রাজপথে সুবোধ যেন একান্ত একা আজ! আবাল্যের স্মৃতিসৌধ তার চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে—নাঃ, সুবোধ এ হতে দেবে না। লকু আজ বিখ্যাত সাহিত্যিক, বড়দা আজ দেশবরেণ্য ব্যক্তি, —কিন্তু সুবোধইবা কম কিসে! কেন সেঁজুতি তাকে গ্রহণ করবে না! সেজুতির নিজস্ব মতও নিশ্চয় আছে, এবং কেউ-ই ঠিক জানে না সেঁজুতি কাকে চায়—সুবোধ প্রস্তাবটা আগেই করবে তার কাছে, আজই করবে নিজেই।

রাতটা পোহালে হয়,—এত রাত্রে আর তার বাড়ী যাওয়া চলে না। শবদাহন করে সঙ্গে গেলেই ভাল হত—কোন অসুবিধা ছিল না। কেন যে তখন সুবোধের মাথায় এ চিন্তা আসে নি, কে জানে। কিন্তু গেলেই কথা হোত না; শোকার্ত্তা সেঁজুতিকে অত সহজে বিয়ের কথা বলা চলে না—তাছাড়া ওখানে ইন্দ্রজিৎ আছে। ঐ লোকটাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না সুবোধ। কোত্থেকে যে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে! ঘড়ি দেখলো সুবোধ তিনটে পনর—এখনো অনেক রাত। ঘুম আজ আর আসবে না তার। মোড়ল থাকলে পরামর্শ করতো। ঐ একটী মাত্র লোককে সুবোধ আত্মীয় ভাবে। কিন্তু তার বাড়ী দূরে, নদীর ওপারে। ইচ্ছে করলে মোটরে যাওয়া যায়—কিন্তু এ সময় সেটা ঠিক হবে না।

সুবোধ অস্থির হয়ে পায়চারী করতে লাগলো একটা চুরুট হাতে। সেঁজুতি হয়তো একা আছে, না, ইন্দ্রজিত আছে ওখানে আর তমাল, আর হয়তো স্বাহাবৌদি, এবং লকুও। না—স্বাহা বৌদি নিশ্চয় থাকবে না। বড়দা বহুদিন পরে আজই এসেছেন, স্বাহাবৌদি স্বামীর কাছেই থাকবে। লকুও থাকবে না—থাকা উচিৎ হবে না তার। থাকবে ঐ ইন্দ্রজিত: কেন? কি অধিকারে থাকবে সে সেঁজুতির বাড়ীতে? রাগটা গিয়ে পড়ল ইন্দ্রজিতের উপরই! কিন্তু কি করতে পারে সুবোধ?

আরেকটা সিগারেট ধরালো, আরেকটা—পর পর ধরাচ্ছে। ঠোঁট জ্বালা করতে লাগলো সুবোধের। সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করছে, তা' ঠোঁট! রাতটা শেষ হলে হয়—সুবোধ আর সহ্য করতে পারছে না। রাত থাকতেই সুবোধ হাতমুখ ধুতে গেল—ভোরেই গিয়ে উপস্থিত হবে সেঁজুতির কাছে। এ সময় যাওয়াই তো উচিৎ। কেউ কিছু মনে করবে না এই বিপদের সময়। কিন্তু গিয়ে কি হবে? সেঁজুতি যে লকুকে ভালবাসে, এ তো জানেই সে—নিশ্চয় সুবোধকে গ্রহণ করতে রাজি হবে না স্বেচ্ছায়। কৌশলে, অমানুষিক কিছু অন্যায় আচরণ করে সুবোধ তাকে অধিকার করতে পারে। তাই করবে। ইন্দ্রজিতকে ঘরে ঠাঁই দেওয়া উচিৎ হয় নি সেঁজুতির; গ্রামে বদনাম রটিয়ে দেবে সুবোধ—কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবে না যে! লকুর সঙ্গে সেঁজুতির নাম জড়িয়ে কুৎসা রটনা করা চলে—কিন্তু তাতে লকুরই সুবিধা হবে ওকে লাভ করতে! নাঃ কোনো প্ল্যান ঠিক হচ্ছে না! গুণ্ডা দিয়ে অপহরণ করিয়ে ফেলবে নাকি! —দূর ছাই—তাতে যে সুবোধেরই অসুবিধা হবে তাকে পত্নীত্বে অভিষিক্ত করতে! কি সে করবে? বাথরুমে বসে সুবোধ ভাবতে লাগলো আকাশ পাতাল।

ভোর হয়ে গেছে। বেরিয়ে এল, জামাকাপড় পরলো, চললো সুবোধ সেঁজুতির বাড়ীর পানে। অত্যন্ত ভোর, রাস্তায় জনমানব নেই; এখনও ওঠেনি কেউ। সেঁজুতিদের বাইরের দরজাটা বন্ধ! সুবোধ এগিয়ে চলে গেল গ্রামপ্রান্তে। বড় বটগাছটার কাছে গ্রাম্য চণ্ডী-পূজার বেদী—সেইখানে দাঁড়ালো এসে। শীত বোধ হচ্ছে। এখনো শীতের আমেজ লাগে ভোরের দিকে, সুবোধ ব্যাপার আনে নি।

ঈশ্বর নিয়ে সুবোধ মাথা ঘামায় নি কোনোদিন, দরকারও হয়নি, কিন্তু আজ মনের এই হিমালয়প্রমাণ অস্বস্তির চাপে এই গ্রাম্য পূজাবেদী-তলে এসে মনের মধ্যে অকস্মাৎ যেন একটা কি অনুভূতি হোতে লাগলো ওর—রক্তের চেতনায় যেন কোন্ আদিম চঞ্চলতা—তৃষ্ণা, তৃপ্তিহীনতার অভাবনীয় আকর্ষণ! কি এ? সুবোধ চাইল শূন্য বেদীর পানে। মূর্ত্তি বা মন্দির কিছুই নাই, বেদীতে মোটাকরে সিঁদূরের দাগ মাত্র অবশিষ্ট আছে—বার্ষিক একবার কি দুবার পূজা হয় এখানে চণ্ডীর—যখন মড়ক লাগে গ্রামে বা ঐরকম কিছু ব্যাপার ঘটে। তবু এই সর্ব্বজনপূজ্য দেবতার আশ্রয় আজ নিতে ইচ্ছে করছে সুবোধের—মানত্ করবে নাকি কিছু! ঘুষ দেবে দেবীকে সেঁজুতিকে লাভ করার জন্য? দূর ছাই! কি সব বাজে ভাবছে সুবোধ!

ফিরলো—বেলা হয়েছে, সূর্য্য উঠেছে, এতক্ষণ সেঁজুতিও উঠেছে নিশ্চয়। সুবোধ সটান চলে এলো তার বাড়ীতে। স্বাহা বৌদি দাঁড়িয়ে উঠোনে; বলল,

—এসো ঠাকুরপো—ওদিক থেকে আসছে যে?

—হ্যাঁ বৌদি, সকালে গিয়েছিলাম ওদিকে। তুমি এখানে ছিলে নাকি রাত্রে?

—হ্যাঁ, একা ওকে রাখি কেমন করে?

—কেন? সেই সন্ন্যাসী ছিল যে? সুবোধ ইন্দ্রজিতের নামটাও উচ্চারণ করলো না।

—না তিনি চলে গেছেন রাত্রেই! বসো। স্বাহা বসতে অনুরোধ জানালো।

সেঁজুতি এখনো পড়ে আছে বাবার শূন্য মৃত্যুস্থানটাতে। উঠতে ওর যেন ইচ্ছে নেই। তমালও একধারে পড়ে। সুবোধ স্বাহাকেই বললো,

—ওভাবে ওদের পড়ে থাকলে তো চলবে না বৌদি, উঠিয়ে কিছু খাওয়াও, চা এবং আর কিছু। আমার বাড়ী বা তোমার বাড়ীতেই নিয়ে যাও না হয়।

—খাবে, কেঁদে নিক একটুখানি। স্বাহা যেন নির্লিপ্তকণ্ঠে জবাব দিল।

—অত কাঁদবার কি হয়েছে বৌদি; তাঁর সময় হোল, গেলেন। অবশ্য সন্তানের কাছে পিতৃবিয়োগ সব সময়ই দুঃখের কিন্তু মানুষকে তো বেঁচে থাকতে হবে।

—হ্যাঁ—বাঁচতে হবে বৈকী। জীবন বস্তুটা শুধু মূল্যবান নয় ঠাকুরপো, মূল ঐটাই। ওরই জন্য মানুষ শোকদুঃখ ভোলে, দুঃখদারিদ্র্য ভোলে—ভুলে যায় বাবা, মা, ভাই, বন্ধু, এমন কি সন্তানকে পর্য্যন্ত কিন্তু তবু মানুষ অনন্তকাল বাঁচে না!

—ঠিক বুঝলাম না বৌদি, কি তুমি বলছো?

—বলছি যে—স্বাহা হাসলো একটু—মানুষ চেষ্টাই করে—বাঁচতে পারে না সে! বাঁচবার এই অফুরন্ত আকুতিই তাকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে দিচ্ছে। জন্তু হয়ে হয়তো সে বাঁচে কয়েকটা বছর, মানুষ হয়ে যদি কয়েকটা মুহূর্ত্তও সে বাঁচতো!

সুবোধ ঠিক না বুঝলেও কতকটা আন্দাজ করে নিল স্বাহার কথা।

বলল—সে কথা ঠিক বৌদি, মানুষের মত আমরা বাঁচলাম কৈ! লোভে কামনায় কলঙ্কিত, আশায় নৈরাশ্যে ব্যথিত আমাদের জীবন—জন্তুরই জীবন বলা যায় একে।

স্বাহা আর কিছু বললো না। সেঁজুতিকে তুলতে গেল। ওর শ্বাশুড়ী কিছু খাবার তৈরী করে পাঠিয়ে দিয়েছেন রাণীর হাতে। রাণী আনলো খাবারগুলো। সেঁজুতি আর তমালকে তুলে আনলো স্বাহা।

—তুমি রাত্রে ছিলে এখানে, ইন্দ্রজিতের সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি বৌদি?

—না ভাই, শ্মশান থেকে তোমাদের ফেরার পর ঠাকুরপো আমায় এখানে পৌছে দিয়ে গেল—ইন্দ্র ঠাকুরপো তখন চলে গেছেন।

—কোথায় গেলেন তিনি? তাঁর গুরুদেবের আশ্রমে নাকি? চল না বৌদি আশ্রমটা একদিন দেখে আসা যাক—জীপ গাড়ী দিব্যি চলে যাবে পাহাড়ের তলা পর্য্যন্ত—যাবে বৌদি? সেঁজুতিরও মনটা কিছু হাল্কা হয়!

—তা যেতে পারি! সন্ন্যাসীকে তো আমরা কখনো দেখি নি। তোমার দাদাও কাল বলেছিলেন ওখানে যাবার কথা। তাঁকে বলো!

স্বাহা উঠিয়ে হাত মুখ ধোয়ালো তমালের। পিতৃবিয়োগ হয়েছে—শাস্ত্রানুযায়ী কিছু খাবার নিয়ম নাই ওর কিন্তু ও বড্ড ছোট—অত নিয়ম পালন নাইবা করলো! স্বাহা ওকে খাওয়ালো, সেঁজুতি কিছুই খেল না। কুমারী কন্যা, পুত্রের মতই পিতৃকার্য্যের অধিকারিণী। সুবোধ বলল, —তুমি কিছু খাবে না সেঁজুতি?

—না!—সেঁজুতি অতি আস্তে বলল মাথা নেড়ে। চোখ মুখ বসে গেছে তার—আলুলাইত কেশ, কী অদ্ভুত চেহারাই যে হয়েছে! অত বড় শোক সামলে উঠতে পারছে না যেন সেজুতি! সুবোধ বলল,

—এ সময় সান্ত্বনা দিতে যাওয়াটাই বোকামী, তবু বলছি, কান্নায়

শরীর খারাপ হবে। এখন কর্ত্তব্য সবই তোমার ঘাড়ে এসে পড়ল। ছোট ভাইটাকে মানুষ করতে হবে—নিজের অত বড় জীবনটা রয়েছে.........

—ভগবান দেখবেন!—সেজুতি অতি আস্তে বললো আবার।

—ভগবান চিরদিনই নির্বিকার সেঁজুতি, তিনি কিছুই করবেন না। মানুষকেই সব করতে হয়—তোমাকেই সবটা করতে হবে। নাকি বল বৌদি?

কিন্তু সুবোধ ভুলটা বুঝতে পারলো তার। স্বাহা ভগবানকে নিশ্চয় অবিশ্বাস করে না। এখানে তাকে সাক্ষী না মানাই উচিত; তৎক্ষণাৎ সংশোধন করল,

—কিম্বা ভগবানই করাবেন তোমাকে দিয়ে। কিন্তু তোমার হাত-পা-গুলো চালাতে হবে।

—হবে—সেজুতির উত্তর তেমনি ক্ষীণ, নিস্তেজ।

বিয়ের প্রস্তাব করার এ সময় নয়—আর বেশি এগুবে না সুবোধ। স্বাহা বললো—সারাদিন না-খেয়ে থাকবি সেঁজু,—কান্নাকাটি করে লাভও কিছু নাই, তার থেকে চল, তীর্থদর্শন করে আসি—চল ঐ পাহাড়ে সন্ন্যাসীর কাছে—যাবি?

—না—সেঁজুতি জবাব দিল। ঠিক সেই সময় বড়দা এলেন। সুবোধকে বললেন,

—ইন্দ্র রাত্রেই চলে গেছে, শুনলাম—কোথায় থাকেন ওর গুরুদেব? তোমরা দেখেছ?

—না বড়দা, বহুদিন থেকে শুনি, ঐ পাহাড়ে একজন সাধু থাকেন। এদিকে তিনি কখনো আসেন না। খুবই উচ্চাঙ্গের সাধু নাকি তিনি। সুবোধ বলল।

—বেশি তো দূর নয়—জীপগাড়ী যেতে পারে—সুবোধ ঠাকুরপো বলছেন—গেলেই হয় ওখানে। —স্বাহা কথাগুলো কাকে উদ্দেশ করে বললো, বোঝা গেল না। কেন যে ও স্বয়ং এমন করে সাধুদর্শনের ইচ্ছা আজ প্রকাশ করছে, সেটাও বোঝা দুষ্কর। চিরদিনের স্বল্পভাষিণী তেজস্বিনী স্বাহা—প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা কদাচিৎ বলে—কিন্তু আজ সেঁজুতির এই গভীর দুঃখের দিনেও সে সাধুদর্শনে যাবার ইচ্ছাটা উগ্রভাবে যেন প্রকাশ করছে। এটা কি শুধু সেঁজুতির শোকতপ্ত অন্তরকে সান্ত্বনা দেবার জন্য, না নিজেরও কিছু সান্ত্বনা লাভের আশায়? ওর বজ্রকঠিন অন্তর বিদ্রোহী হয়েছে স্বামীর অধর্ম্মনিষ্ঠার বিরুদ্ধে, কিন্তু সে চিন্তা ওর সতীত্ব আর পাতিব্রত্যকে উপড়ে ফেলতে পারছে না, শুধু নাড়া দিচ্ছে প্রবল ভাবে, মহামহীরূহ যেমন করে ভীষণ ঝড়ে আন্দোলিত হয়। স্বাহার মনের নিভৃতে কি-যেন প্রত্যাশা জাগছে—ঐ সন্ন্যাসীর আশ্রমে সে শান্তি পাবে, পাবে আশ্রয়—পাবে আত্মগোপনের মন্ত্র অথবা আত্মবিসর্জ্জনের অস্ত্র। তাই আজ এমন দিনেও সে সন্ন্যাসীকে দেখতে যাবার মত নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় প্রস্তাবটা গ্রহণ করতে চাইছে।

গত কাল বিকালে সভা থেকে ফেরার পর সেজুতির বাবার দেহত্যাগ ওকে স্বামীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। যে-স্বামীর সঙ্গে সামান্য একটি কথা বলবার জন্য ও এই আঠারো মাস মুহূর্ত্ত গুণেছে—স্বাহা আজ সেই স্বামীকে এড়িয়ে যেতে চায়—আড়ালে থাকতে চায়।

স্বাহা ভাবছিল, কি-যেন মহার্ঘ বস্তু পাবে সে সন্ন্যাসীর কাছে। ভারতীয় নারীদের এই দেবদর্শন, তীর্থদর্শন, সাধু-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা চিরজাগ্রত। আধুনিক শিক্ষা-সভ্যতা হয়তো সহরের মেয়েদের মনের এই ধর্ম্মভাবটা নষ্ট করে দিয়েছে—সেখানে জাগিয়েছে পিকনিক—প্রমোদভ্রমণের বৈদেশিক

প্রীতি, কিন্তু পল্লীর প্রতি-নারীর অন্তরে আজো তীর্থদর্শনের আকাঙ্ক্ষা অগাধ। তীর্থে শুধু আনন্দই লাভ হয় না, লাভ হয় আত্মানুভূতি, আত্মোৎকর্ষ—আত্মোন্নয়নের অভিপ্সা! কিন্তু স্বাহার অন্তরে জাগছে আরো কিছু—আশ্রয়ের সন্ধান-আকঙ্ক্ষা। গৃহবাস তার শেষ হোল হয়তো। সঙ্কর্ষণের কন্যা, রুদ্রাধীশের পুত্রবধূ স্বাহা দেবী দস্যু স্বামীর সংসারে পাতিব্রত্য পালন করে যাবে নীরবে—এ বোধহয় অসম্ভব।

কিন্তু সেঁজুতি যেতে রাজি হোল না! বললো—আজ কোথাও সে যেতে পারবে না। আজ এই পিতৃতীর্থই তার শ্রেষ্ঠ তীর্থ। নিরুপায় স্বাহা এতক্ষণে বুঝলো. কথাটা তোলাই উচিৎ হয়নি। কিন্তু স্বাহা যে স্বামীকে এড়িয়ে যেতে চায় নানা কৌশলে !

—থাক বৌদি—কাল না হয় যাওয়া যাবে—আজ ওর মন চাইবে কেন? —সুবোধ বলল।

—থাক্—স্বাহাও বললো।

এর পর সেজুতির কাছেই সে বসে রইল, উঠলো না। ছেলেটা আছে শাশুড়ীর কাছে। ভালই থাকে সে তাঁর কাছে। কিন্তু আজ রাত্রে হয়তো শাঁশুড়ী এখানে আসবেন সেঁজুতিকে আগলাতে। স্বাহা কেমন করে আত্মরক্ষা করবে? স্বামী-সংসর্গ একেবারে ভাল লাগছে না তার। অথচ স্বাহা আজন্মের স্বামীপরায়ণা সাধ্বী বধূ! মনের গ্লানিটা মুখেচোখে ফুটে উঠেছে; কিন্তু অন্য সবাই ভাবছে, সেজুতির জন্য স্বাহার এটা সহানুভূতি! স্বাহা জানে, তা নয়—স্বাহার অন্তর গুমরোচ্ছে স্বামীর অধঃপতনের জন্য। কিন্তু মানুষের অন্তর কে দেখতে পায় অন্তর্য্যামী ছাড়া? তথাপি স্বাহা অপরাধিনী হচ্ছে তার পাতিব্রত্যের কাছে, তার সতীধর্ম্মের কাছে। হচ্ছে না? না, সতী তার স্বামীকে স্বধর্ম্মে ফিরিয়ে আনবে। নইলে কুলবধূতে আর বারবধূতে তফাৎ কি? স্বাহা ঠিকই

করছে। আপন অন্তরের আদর্শের জন্ম পিতা পুত্রকে ছেড়েছেন—স্বাহাও স্বামীকে ছাড়তে পারবে। যে স্বামীর হাত ধরে জগৎস্বামীর চরণতলে পৌছানো যায়, তিনিই স্বামী,—স্বামীকে আবার স্বামীত্বের গৌরবে ফিরিয়ে আনবার সাধনা করবে স্বাহা;—হোক সে পথ কণ্টকাকীর্ণ, অগ্নিময়, মৃত্যুময়—স্বাহা তার সঙ্কল্পে থাকবে অটল। ওর চোখের অশ্রুতে আগুন গলছে।

নাঃ,—সংসারে কোনো সুখ নেই! যাদের জন্য করি চুরি, তারাই বলে চোর! এর থেকে দুঃখের কি আর আছে!—বড়দা ভাবছিলেন। ছুটির দুটো দিন চলে গেল; মাত্র আজকার দিনটা আছে; আগামী কাল ওঁকে যেতে হবে, যেতে হবে কোন্ সুদূর দেশে। ইচ্ছে ছিল, স্বাহাকে আর গণাধীশকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন—এখানে মা, লকু থাকবে। লকুর বিয়েটা এখনো হয়নি—তবে এবার দিতে হবে তার বিয়ে—পাত্রী তো ঠিক করাই আছে। কিন্তু এই দুটো পুরো দিন চলে গেল, স্বাহার সঙ্গে কথা তাঁর প্রায় হয়নি বললেই চলে। স্বাহা শুধু লকুর ব্যবস্থা আর সেজুতির খবরাখবর নিয়েই আছে। গত রাত্রেও সে সেজুতির বাড়ীতেই ছিল গিয়ে। থাকা অবশ্য উচিৎ তার এই বিপদের সময়—কিন্তু এতকাল পরে প্রবাস-প্রত্যাগত স্বামীর উপরও তো তার কর্ত্তব্য আছে! রাগ না অভিমান, কি যে হচ্ছে বড়দার অন্তরে, তিনি নিজেই বুঝতে পারছিলেন না। টাকা ভালই রোজগার করেছেন—আরো আয়ের ব্যবস্থা করেছেন। —সম্মান, প্রতিপত্তি, কোনোটাই আজ কম নাই তাঁর—কিন্তু কি হবে! কোন্ কাজে লাগবে!

স্বাহাকে ভালোবেসেই তিনি বিয়ে করেছিলেন। নেতা সঙ্কর্ষণের

কন্যা—বজ্রাদপি কঠোর—শিরিষফুলের থেকেও কোমলা স্বাহাকে স্বয়ং উনি নির্বাচন করেছিলেন একদিন জীবনসঙ্গিনীরূপে পাবার জন্য। তাঁর সৈনিক জীবনে স্বাহার প্রয়োজন ছিল অনিবার্য্য—কিন্তু আজ সেই সৈনিক সেনাধ্যক্ষ হয়ে, সাম্রাজ্য জয় করে রাজগৌরবের বিজয়মুকুট পরে এলেন—মুক্ত তরবারি এখন কোষবদ্ধ হয়ে গেছে—কিন্তু কেন? রাজার কি তরবারির প্রয়োজন নেই? আছে, যে রাজা বীর—বিলাসের শয়নগৃহে যিনি বিশ্রাম করেন না—ব্যভিচারে যিনি অতিবাহিত করেন না জীবনের পরম ক্ষণগুলি। স্বাহা সেই বীরের সহধর্ম্মিনী!

তীক্ষ্ণধীশক্তিশালী রণাধীশ ভাবছিলেন বসে বসে একা। একাই যেন রয়েছেন তিনি আজ বিশ্বসংসারে—না, সঙ্গে সুবোধ আছে। সুবোধ সঙ্গী এ পথে—রাজ্যলাভের পথে—সমৃদ্ধি লাভের পথে—কিন্তু স্বাহা এপথে চলবে না। রুদ্রাধীশের আদর্শের সঙ্গে সংঘাত পিতাপুত্রে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিল—স্বাহার আদর্শের সঙ্গে সংঘাত হয়তো স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটাবে। ঘটাবে নয়—ঘটিয়েছে! রণাধীশ অনুভব করছিলেন সারা অন্তর দিয়ে!

গতকাল উনি স্বাহাকে প্রশ্ন করেছিলেন—তাঁর সঙ্গে স্বাহা বিদেশে যেতে রাজি আছে কি না। উত্তরে স্বাহা স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে, বর্ত্তমানে বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবা এবং শ্বশুরের ভিটেতে সন্ধ্যাদীপ জ্বালার থেকে বড় কিছু কর্ত্তব্য নাই তার! স্বামী বিদেশে যান—তাঁর কাজ তিনি করুন—স্বাহা আপনার নিষ্ঠায় অটল থাকবে।

—তুমি কি সেই স্বাহা যে আমার সামান্য সুখের জন্য আগুনে আত্মাহুতি দিতে পারতো?

—তুমি কি সেই স্বামী আমার, যিনি অমিতবীর্য্যে আপনার আদর্শের পথে এগিয়ে যেতেন?

নির্ব্বাক হয়ে গিয়েছিলেন রণাধীশ। এরপর স্বাহা চলে গিয়েছিল

সেজুতির বাড়ী। কিন্তু যে সামান্য কথাকটা সে বলে গিয়েছিল, সংঘর্ষের আগুন উঠ্‌বার পক্ষে তাই যথেষ্ট। তথাপি রণাধীশ স্বাহার যাবার সময় শুধিয়েছিলেন—স্বাহা কি তবে তাঁর সেই আদর্শটাকেই বিয়ে করেছিল—মানুষ রণাধীশকে নয়?

—মানুষই ছিলে তুমি, আমি তাকেই বিয়ে করেছিলাম। আজ মানুষটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে যে অমানুষ লোভী দানব—হয় সে যাক, আমি আসি—নয় সেই থাক—আমি বিদায় নিলাম—স্বাহা চলে গিয়েছিল।

লকু সবটাই শুনেছিল দাঁড়িয়ে। স্বাহাকে পৌছে দিয়ে বড়দার কাছে গিয়ে শুধু বলেছিল—বৌদির অন্তরটা তার তরফ থেকেই বিচার করতে হবে দাদা!

—হ্যাঁ—নিশ্চয়! অবিচার তার উপর কখনো করবো না আমি।

রণাধীশ শুয়ে পড়েছিলেন। আজ সকালে যথারীতি স্বাহা এসেছে এবং পরম নিষ্ঠায় গৃহকাজে আত্মনিয়োগ করেছে। লকু কোথায় যেন বেরিয়েছে—হ্যাঁ, বলেই তো গেল, সেই ফকির বাউরীর গান, আর কবিতার খাতাগুলো আনতে গেছে রমণ বাউরীর বাড়ী থেকে। ওগুলো ওর কি কাজে লাগবে, কে জানে? কিন্তু বড়দা এখন করবেন কি? ইস্তফা দেবেন কাজে—নাকি আরো অথৈ জলে গিয়ে পড়বেন সুবোধের হাত ধরে? ভবিষ্যৎ বংশধরগণ ক্ষমা করবেনা ওঁদের—একথা ভালই জানেন রণাধীশ—এমন কি, ওঁরই পুত্র হয়তো পিতার বর্ত্তমান জীবনের অধঃপতন দেখে ঘৃণায় মুখ ফেরাবে! ইতিহাসের পাতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না সেদিন—যেদিন এই বিপর্য্যয় থেমে যাবে—শান্ত হয়ে আসবে মানুষের অমানুষিক দম্ভাভিযান—আজকার লোভ, ক্রোধ, হিংসার সমাপ্তি ঘটবে কোনো অতিমানবীয় আবির্ভাবে। কিন্তু…না, ফেরা এত সহজে আর

সম্ভব নয় এখন! সহকারী সুবোধ ফিরতে দেবেনা—আর ফিরে লাভই বা কি? কি করবেন—কতটুকু কি করতে পারেন তিনি একা? ভারতকে স্বাধীন করবার সময় যে-শক্তি ছিল কেন্দ্রীভূত, আজ তা শতধা বিচ্ছিন্ন—সহস্রভাগে বিভক্ত, বিদ্বেষপুষ্ট দলীয় স্বার্থে কলঙ্কিত। এ কলঙ্ক ক্ষালন করা তাঁর একার সাধ্য নয়।

সুবোধ হয়তো আসবে এখুনি—আসবার দরকার আছে তার। সুবোধ ধনী—চিরদিনের অত্যাচারী পরিবারের সন্তান সে—সে যা করতে পারে, রণাধীশ তা করতে পারেন না—কিন্তু তিনি আজ সুবোধের সঙ্গেই গলাগলি হয়ে…

সুবোধ এসে পড়লো। বসলো কাছে; বললো—রাত্রে ভাল ঘুমিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ—ভালই।—কথাটা মিথ্যা। তিনি ভাল ঘুমুতে পারেন নি কাল। কিন্তু মিথ্যা বলতে আটকালো না ওঁর; অথচ না বললে কিছু ক্ষতি ছিলনা।

—আমি বলছিলাম কি—সুবোধ আধ মিনিট চুপ করে রইলো, কি ভাবছে। ভাবছে, সেজুতিকে অঙ্কশায়িনী করার প্রস্তাবটা বড়দাকে এখন আর করা চলে না—অথচ কাজ হাসিল করতে হবে বড়দাকে দিয়েই। সে কিছুটা ঔদার্য্যের অভিনয় করবে এখানে! নিজের সম্বন্ধে না বলে প্রস্তাবটা করবে লকুর নাম দিয়েই। এই মতলব ঠিক করেই সে এসেছে এখানে।

—বলছিলাম যে সেজুতির কিছু একটা ব্যবস্থা তো আমাদের করতেই হবে—এমনি কোনো সাহায্য সে নেবে না—আমরাও দিতে পারবো না। লকু যদি রাজি থাকে আর সেজুতির যদি অমত না থাকে, তাহলে এই মাসেই বা বৈশাখ মাসে ওদের বিয়েটা দিয়ে ফেলা যেতে পারে…

—খুবই ভাল কথা—বড়দা চুরুটে টান দিলেন একটা—আমি মাস

দু'তিন পরেই আবার ফিরবো—তখনই কাজ চুকিয়ে দেওয়া যাবে।

—কিন্তু সেজুতির একটা মত নেওয়া দরকার...

—অমত হবে না! বাবার আমল থেকেই ওদের বিয়ের ঠিক আছে।

—তাহলেও সেজুতি বড় মেয়ে, শিক্ষিতা মেয়ে—তাকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

—বেশ তো, করলেই হবে—তোমার বৌদিই করবে সে কাজটা!

লকু ফিরে এলো, হাতে একগাদা হাতে-লেখা পুঁথি। এসেই বললো, —নেতা সংকর্ষণের লেখা বিপ্লবের ইতিহাস দাদা, বৌদির কাছে ছিল, আর এইটা ফকির বাউরীর লেখা লোকসঙ্গীত। বাংলার বিপ্লবী মনস্তত্ত্ব আর সাংস্কৃতিক গরিমার এমন চমৎকার পরিচয় কমই পাওয়া যায়। এইগুলো দিয়ে সাহিত্য স্মৃষ্টি করতে হবে।

—বেশ তো, করবি—বড়দা একটু হেসে বললেন।

—সাহিত্য এখন থাক লকু—স্নবোধ বলল—সেজুতির কি হবে—তার ব্যবস্থা কর।

—সেজুতির জন্য দুজন ক্যাণ্ডিডেট আছে, একজন তুমি, অন্যজন আমি; সেজুতি নিজে নির্ব্বাচন করে নিক, কাকে চায়। তোমাকে নিলে সে বেশ স্নখে থাকবে। আমি ভবঘুরে মানুষ—তারপর আমার জীবনের মমতা অত্যন্ত কম। বর্ত্তমান বাংলার ভাঙন আর ভবিষ্যৎ ভারতের গঠন সংক্রান্ত যে-সব লেখা আমি প্রকাশ করি এবং করবো, তাতে যে-কোনো দিন আমার জীবন যে কোন পথে যেতে পারে। আমার ইচ্ছা, সেজুতিকে তুমি গ্রহণ কর। মানুষের জীবনকে মহত্তর করবার জন্য আমার সাহিত্য-তরবারি কোষমুক্ত থাকবে সবসময়—লকু অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলে গেল।

স্নবোধ শুনলো লকুর কণ্ঠের এই অদ্ভুত আশাতীত কথাগুলো। বিশ্বাস করতে পারছে না। লকু সম্পূর্ণ ভাবে দাবী ছেড়ে দিতে চায়

সেজুতির উপর ! আশ্চর্য্য ! এর থেকে বেশি আশ্চর্য্য জীবনে ঘটে নি তার। বলল,

—তাকে সুখী করতেই আমরা চাইছি লকু—সে যদি তোমাকে পেলে সুখী হয় তো তোমার হাতে তাকে তুলে দেবার মত ঔদার্য্যও নিশ্চয় আছে আমার।

—আছে। থাকা উচিৎ। একটি অনাথা নিরাশ্রয়া মেয়ের জীবন নিয়ে আমরা খেলা করবো না—তার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিশ্চয় গ্রহণ করবো না তুমি বা আমি।

—বেশ, তাকে বৌদি জিজ্ঞাসা করুন—তুমি বা আমি কাকে সে চায় ! কিন্তু আমি জানি—তোমাকেই সে চাইবে—সুবোধ বলে হাসতে লাগলো, কিন্তু হাসিটা অত্যন্ত করুণ হয়ে উঠছে ওর ঠোঁটে। লকু দেখলো ; বললো,

—তুমিই ওকে গ্রহণ কর সুবোধ, ওকে সুখী কর—আমার সঙ্গে জড়িয়ে ও দুঃখ পাবে। আমি জানি, তুমি ওকে সত্যি ভালবাস। সত্যি ভালবাসা সুখীই করতে চায় প্রিয়কে।

সুবোধ কি হেরে যাচ্ছে মানবীয় ঔদার্য্যে লকুর কাছে ? সুবোধ কি সত্যি ভালবাসে না সেজুঁতিকে ? জেনেশুনে সে সেজুঁতিকে অপহরণ করে নেবে—লুণ্ঠন করে নেবে তার প্রেম, যে-প্রেম লকুকে দীর্ঘদিন থেকে দিয়ে আসছে সেজুতি ? না—সুবোধ মুহূর্ত্তের জন্য ভাবলো। দাঁড়িয়ে উঠলো, তারপর বললো,

—কিন্তু সেজুতি তোমাকেই ভালবাসে লকু, এ-খবর আমার অজানা নয়।

—আমাদের বোঝবার ভুল হতে পারে সুবোধ...লকু বলতে গেল।

—না ! এ-খবর সারা গ্রামটাই জানে। বেশ, আগামী বোশেখে

তোমাদের বিয়ে আমি নিজে দাঁড়িয়ে দেব—ঔদার্য্যে সুবোধ তোমায় থেকে খাটো হবে না।

সুবোধ চলে যাচ্ছে—বড়দা ডাকলেন। বললেন—ব্যাপারটা তোমার বৌদির হাতে ছেড়ে দাও সুবোধ—সেজুতির মন সে ভালই বুঝবে। উপস্থিত ওর দাদাকে খবর দেবার কি ব্যবস্থা করবে? দুর্ব্বল রুগী—হঠাৎ পিতৃবিয়োগের খবরটা না দেওয়াই ভাল। অথচ বাবার মৃত্যুসংবাদ বড় ছেলেকে না দিই কেমন করে? মহা সমস্যা!

—সকালেই তো আমরা যাচ্ছি কাল—সুবোধ বললো—আমরাই খবরটা দেব গিয়ে সাবধানে। আর সেজুতি সম্বন্ধে আমার শেষ কথা বড়দা,—আমি জানি, সেজুতি লকুকে ভালবাসে—ওদের মিলন খুবই সুখের হবে। লকুই তার যোগ্য বর—লেখাপড়ায়, সাহিত্য-সৃষ্টিতে, আদর্শ নিষ্ঠায়! আমি তাকে লুণ্ঠন করে কি কোরবো, কোথায় রাখবো? ধনরত্ন লুণ্ঠন করা যায়—মানুষের হৃদয় তো লুণ্ঠন করা যায় না বড়দা! চললাম—কাজ আছে…সুবোধ বার হয়ে গেল, কিন্তু বড়দা দেখতে পেলেন, ওর চোখদুটো চকচক্ করছে—উপচে পড়া জলবিন্দু নাকি?

সুবোধ চলে এলো সটান রাস্তায়—হাঁটতে লাগলো গ্রামপ্রান্ত দিয়ে। সেই চণ্ডীতলার বটগাছ। রাখলরা গ্রাম্য গাভীদল নিয়ে বার হয়েছে—ঐখানে জমা হয়েছে গরুগুলো সব—সাদা-কালো, কালোয় সাদায় নানান রকমের গরু, ষাঁড়ও একটা রয়েছে। সুবোধ থামলো এসে বেদীর কাছে!

উত্তর দিকের ঐ নদীটা যমুনা নাকি? এই গোষ্ঠে কি শ্রীবৃন্দাবনের গরুর পাল? না—কি সব ভাবছে সুবোধ,—আজন্মের স্বপ্নলালিত আশালতাকে সে আজ সমূলে উৎপাটিত করে দিয়ে এলো। ভালই করেছে। চিরদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী লোকাধীশের কাছে মানবীয় ঔদার্য্যে সে হেরে যাবে? না!

সুবোধ আবার জোরে বলল—না। সেজুতিকে ভালবাসে সুবোধ সত্যি, সত্যি ভালবাসে। তাকে সুখীই দেখতে চায় সুবোধ—সুখী করা যদি তার ভাগ্যে না থাকে—নাইবা থাকলো, সেজুতি সুখী হোক—বড় দুঃখ পেয়েছে মেয়েটা—সুখী হোক, পূর্ণা হোক !!!

সুবোধ এগিয়ে চললো গরুর পালটা পার হয়ে। নদী-শুকনো—বালি, নদীতে জল থাকে—এখানে আছে শুকনো বালি ; মানুষের অন্তরে প্রেম থাকে, সুবোধের অন্তরে আছে শুধু শুষ্ক নৈরাশ্য—না, এই বালির তলায় জল আছে—সুবোধের অন্তরেও প্রেম আছে—সে জল আবিল নয় পৃথিবীর ধুলোমাটিতে, সে প্রেম আবিল নয় দৈহিক কামনা বাসনায়। এই স্বচ্ছ সুন্দর অনাবিল প্রেমের অধিকারী সে আজ! কী এক আশ্চর্য্য সুন্দর অনুভূতি জাগছে সুবোধের অন্তরে—দানব সুবোধ মানব হয়ে উঠলো নাকি? না—অতটা কিছু হয় নি, তবে ত্যাগের একটা অনাস্বাদিত অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে তার মনোরাজ্যে—যেটা ওর জানা ছিল না পূর্ব্বে।

কিন্তু এদিকে কোথায় যাবে সুবোধ? ওপারে বন, পাহাড় আর দূরে দূরে পল্লী। বহু দূরে বিহারীনাথ দেখা যায়, সেই সাধুর আস্তানা। মনে পড়লো, মন্দিরে একদিন একজন সাধুকে সে দেখেছিল। যিনি সুবোধকে বিদ্রূপ করেছিলেন ; তিনিই ঐ বিহারীনাথে থাকেন নাকি? কে জানে—কেউ তো দেখে নি তাঁকে! হয়তো খুব উচ্চশ্রেণীর সাধক, হয়তো বিপ্লব-যুগের কোনো পলায়িত ব্যক্তি, হয়তো সাধারণ চোর বা বা খুনী! কিন্তু সাধুকে সর্ব্বাগ্রে সাধু-দৃষ্টিতেই দেখা উচিৎ, যতক্ষণ তার বিরূপ প্রমাণ কিছু পাওয়া না যায়—সুবোধ অনুদার হবে না।

মন্দিরের জন্য ভাল ব্যবস্থা করবে ভেবেছিল সেই দিন, কিছুই করা হয় নি। করতে হবে—পূজা-যজ্ঞ ইত্যাদির সঙ্গে কিছু দরিদ্র-ভোজনের

ব্যবস্থাও রাখতে হবে ওখানে। সম্পত্তি আছে দেবতার, সুবোধ কেন করবে না ব্যবস্থা? আর মন্দির, মূর্ত্তি ইত্যাদির মধ্যে আমরা পরিচিত হই আমাদের কৃষ্টির সঙ্গে—সংরক্ষণ করি আমাদের মনের শাশ্বত নৈতিকতা—অগ্রগামী করি আমাদের সদবৃত্তিকে। সান্ত্বনা লাভ করি গভীর দুঃখের সময়। সেজুতির মনের অবস্থা খুবই খারাপ—স্বাহা বৌদিরও তাই। আজ ওদের সকলকে নিয়ে ঐ মন্দিরে গেলে কেমন হয়? ভালই হয়। সেজুতির মনটা ওখানে জুড়োবে একটু...সুবোধ ফিরলো বাড়ীমুখে।

সেজুতির বাড়ীটা পড়ে রাস্তায়! খবর নিয়ে যাবে নাকি? না! মনকে দুর্ব্বল হতে দেবে না সুবোধ আর। সে সাধারণ চোর-ডাকাত-খুনী নয়—ব্যবসা সে করে, ব্ল্যাকমারকেট করে কিন্তু ব্ল্যাকমেল করে নি কোনো দিন। যে-নারী-অন্তর তার হবে না কোনো দিন, তাকে লুণ্ঠন করে বিবাহের লৌহসিন্ধুকে বন্দী করার কোনো অর্থ নাই, বরং সেই অন্তরের একটা কোণায় যদি এতটুকু যায়গা পায় সুবোধ দাঁড়াতে, অন্ততঃ ছায়া ফেলতে—যেমন গলিত সোনার উপর ছায়া পড়ে সোনা-গলানো মাটির ভাঁড়টার—তাহলেই যথেষ্ট হবে। সুবোধ কোনো দিকে না চেয়ে বাড়ী ফিরে এল—রিক্ত কি পূর্ণ—কে জানে!

—মানুষের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ তার মানবীয় চেতনা; এই চেতনার প্রকাশ তার সাহিত্যে, শিল্পে, সদ্‌বৃত্তির অনুশীলনে, সৎধর্ম্মে!

পরদিন ভোরে উঠে ইন্দ্রজিত নীচের সাঁওতাল পল্লীতে গেল গুরুদেবের অনুসন্ধান করবার জন্য—পথে ঐ সব কথা ভাবছিল সে—মানুষ সর্ব্বত্র

মানুষ, অশিক্ষিত অরণ্যবাসীদেরও মানবীয় অন্তর আছে, আছে সদ্‌বৃত্তির অনুশীলন করবার আকাঙ্খা, শিল্প-সাহিত্যের ক্ষুধা।

ইন্দ্রজিতকে পরম যত্নে গ্রহণ করলো ওখানকার মণ্ডল শনিচরা মাঝি, এবং কিছু দুধ খাওয়ালো। সেই সন্ধান দিল, সন্ন্যাসী ঠাকুরকে তিনটি মেয়ের সঙ্গে সে যেতে দেখেছে ষ্টেশনের পথে। ষ্টেশন বহুদূর কিন্তু ইন্দ্রজিৎ থামলো না—তখনি যাত্রা করলো ষ্টেশনের পানে। বাস পাওয়া যায়। কিন্তু গুরুদেব ট্রেণে চড়ে কোথায় গেছেন, ওরা কেউ জানাতে পারলো না। নিরুপায় ইন্দ্রজিৎ ষ্টেশনে এসে কলকাতাগামী ট্রেণ ধরলো।

কলকাতায় কোথায় যাবেন গুরুদেব? হয়তো অন্য কোথাও গেছেন, সারা পথ এই রকমই ভাবছিল সে, কিন্তু কলকাতায় পৌছে উৎপলার আশ্রমে এসে দেখলো—গুরুদেব প্রসন্নমুখে বসে আছেন; উৎপলা, কৃষ্ণা আর সেই মেয়ে তিনটিও রয়েছে। মানবতা সম্বন্ধেই কথা হচ্ছিল ওঁদের।

—গুরুদেব! —ইন্দ্রজিত অতি বিস্ময়ে প্রশ্ন করলো।

—হ্যাঁ—এসো! অন্য কোন উপায় না দেখে এখানেই চলে এলাম। তোমার কাছে এই আশ্রমের কথা শুনেছিলাম, আর ঐ মেয়েটি ঠিকানাও জানে। উৎপলা-মা যে কাজ আরম্ভ করেছেন, তা খুবই বড় আর ব্যাপক—ইন্দ্রজিৎ, তুমি আজীবন ওকে সাহায্য করো।

ইন্দ্রজিত প্রণাম করে বসেছে। খুবই ক্লান্ত হয়ে রয়েছে সে। গুরুদেব ওর কাছে শুনে নিলেন আশ্রমে অনুসন্ধানের ইতিহাসটা। হেসে

বললেন—এখন কিছুদিন ওরা ওখানে সন্ধান করবে। করুক, আমি এখন আর ফিরছি না। আমারও পৃথিবী ছাড়বার সময় হয়ে এল ইন্দ্রজিত, আমার সঙ্ঘের পরিচালনভার আমি তোমার আর উৎপলার উপর দিয়ে যেতে চাই।—উৎপলাকে পাওয়া আমার পরম সৌভাগ্য বলে মনে করি। তা ছাড়া কৃষ্ণা—অতি অসাধারণ মেয়ে। আমৃত্যু কুমারী থেকে ও সঙ্ঘের সেবা করবে—শুনলাম। ওকেও তোমাদের মধ্যে রাখ।

—আর একজন আছে প্রভু—কৃষ্ণা বলল—তার নাম কাবেরী, আসবে এখুনি—আমি ফোন করেছি!—ইন্দ্রদা, আপনি স্নান করুন গে।

ইন্দ্রজিৎ বিদায় নিয়ে উঠে গেল। বেশ বুঝতে পারলো, উৎপলা আর কৃষ্ণা গুরুদেবকে কাবেরীর কথা জানাবে বলেই তাকে সরিয়ে দিল। জানি না, গুরুদেব কি বলবেন! কি তাঁর মত! ইন্দ্রজিত ধীরে ধীরে স্নান করলো অনেকক্ষণ ধরে। কাপড় ছেড়ে বেরিয়ে এসে দেখলো, কাবেরী গুরুদেবের পায়ের কাছটিতে বসে আছে। তিনি সস্নেহে ওর মাথায় হাত বুলোচ্ছেন। ইন্দ্রজিত আসতেই বললেন,

—তিনরকম পুত্র এই মানবজগতে রেখে যায় মানুষ—ঔরসজাত, দত্তক, আর মানস। ইন্দ্রজিত, তুই আমার মানসপুত্র—পুত্রহীন তোর পিতার আদেশ, এই কন্যাকে গ্রহণ কর।

স্নানপূত ইন্দ্রজিত আভূমি নত হয়ে পড়লো ওঁর চরণে! উনি কাবেরীর হাতখানা ধরে দিলেন ইন্দ্রজিতের হাতে। কাবেরীর দিকে চেয়ে ইন্দ্রজিত বললো,

—মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু!

—শাঁখ নেই পলাদি, উলু দিই। কৃষ্ণা আর অন্য মেয়েগুলো উলু দিল

—শোন ইন্দ্রজিত, উৎপলা, কৃষ্ণা, কাবেরী, আর সব মেয়েরা শোন—, আমার কাজ শেষ হয়েছে। জীর্ণ জীবনকে আর ধরে রাখবার ইচ্ছে নেই আমার।—গুরুদেব বললেন।

—সে কি কথা প্রভু—সবাই সমস্বরে বলে উঠলো।

—হ্যাঁ—উনি বলে চললেন—পাঁচ সাল থেকে আরম্ভ করে প্রায় এই পঞ্চাশ সাল পর্য্যন্ত একটানা পঁয়তাল্লিশ বছর আমি ভারতের স্বাধীনতা ছাড়া কিছু চিন্তা করি নি—মা আজ স্বাধীন হয়েছেন। আমাদের ত্যাগ-বা-তপস্যা যতই কম হোক, আজ আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ হয়েছে, কিন্তু বৎস, এই লাভকে পরিপূর্ণ গৌরবে গ্রহণ করতে বাধছে আমার। এর অনেক কারণই আছে, কিন্তু মুখ্য কারণ আমার নিজের জীবনেই ঘটেছে, কিন্তু থাক সে কথা। মানুষের জগতে মানুষের জন্যই স্বাধীনতা দরকার—স্বরাজ্য বা স্বরাট প্রয়োজন, যেখানে মানবত্বই অনুশীলনীয়; ঋষিকথিত সেই অধ্যাত্মবিজ্ঞানকে যথাসাধ্য আমি তোমাদের মধ্যে দান করেছি—তোমরা তাকে প্রসারিত কর সারা ভারতে, সারা বিশ্বে!

মিনিটখানেক থামলেন উনি; তারপর আবার আরম্ভ করলেন,—মানুষের অন্বেষণা, প্রাণৈষণা বা যৌন-এষণা জীবধর্ম্মী, মাতৃ-এষণাই মানবত্ব —যা সদ্ধর্ম্মী, ভগবদ্ধর্ম্মী—যে এষণা মানুষকে অতি-মানবীয় চেতনার দিকে অগ্রসর করায়; সেই মহত্তম এষণা তোমাদের জৈব-জীবনকে চিন্ময় সত্তার পানে উন্নীত করুক, উপাসনা করাক।

—আপনি এখন কোথায় যেতে চান প্রভু? আশ্রমে তো যাবেন না! ইন্দ্রজিত শুধুলো।

—না—আমি একবার প্রব্রজ্যায় বেরুবো। ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে বিবেকানন্দদ্বীপে গিয়ে একবার দাঁড়াবো, দেখবো মাতা ভারতের রূপ—,

স্বাধীনা ভারত-জননীর খণ্ডিত মূর্ত্তি—পশ্বাচারের পাশ্চত্য-সাধনালব্ধ জৈব-জীবনের পঙ্কিলতা,—তারপর যাব হিমালয়ে...দেখবো আগামী সম্ভাবনার অনিবার্য্য ঈশানকে, নিমীলিত নয়ন রুদ্রের তৃতীয় নয়নবহ্নিকে, মৃত্যুহীন মহাকালের মৃত্যুঞ্জয় রূপকে—যে-রূপ যুগে যুগে অপরূপ হয়ে জেগেছে এই ভারতে—তীর্থে তীর্থে তীর্থঙ্করের পদক্ষেপে, তাপসের কঠোর ত্যাগব্রতে, আর মরণহীন মানবস্রোতের বৈপ্লবিক আবর্ত্তে... তারও পরে যদি আয়ু থাকে তাহলে,—একটু থামলেন, সজল হয়ে উঠেছে আয়ত চোখ দুটি ; সবাই তাকিয়ে রয়েছে—একবার যাবো সেই আমার ধূলো-মাটি-কাদায় যেখানে মাতৃগর্ভ থেকে মাটিতে পড়েছিলাম।

—সে কোন দেশ প্রভু ?

—সে এই মহাভারতের ক্ষুদ্রতম এক পল্লী ইন্দ্রজিত—কিন্তু আর কথা নয়—আমি যাই...

—আর কি দেখা হবে না বাবা...কাবেরী, কৃষ্ণা, উৎপলা একসঙ্গে বলে উঠলো।

—না, আর তো প্রয়োজন নেই মা দেখার। মানুষ পুত্রকন্যাকে রেখে মরণ-রথে যেতে পারলে আর চাই কি! তোমাদের রেখে গেলাম—রেখে গেলাম আমার রক্ত, আমার শিক্ষা, আমার সাধনা, আমার সর্ব্বস্ব। পিছু ডেকো না—শান্তি ওঁ!

ধীরে ধীরে বার হয়ে যাচ্ছেন উনি। ইন্দ্রজিতের চোখে আজ জল বাধা মানে না। আর কিন্তু পিছন ফিরে চাইলেন না উনি। দূরে মোড়ের মাথায় অপূর্ব্ব সুন্দর দিব্যমূর্ত্তি অন্তর্হিত হয়ে গেল। শোকার্ত্ত হয়ে উঠেছে সকলেই। নতুন আনা মেয়ে তিনটিকে উনি এখানেই থাকতে বলে গেছেন। উৎপলা তারই ব্যবস্থা করতে বললো কৃষ্ণাকে! কাবেরী বাড়ী নিয়ে গেল ইন্দ্রজিতকে। আচম্বিতে বজ্রপাতের মত গুরুদেবের

চিরবিদায় ইন্দ্রজিতকে মুহ্যমান করে দিয়েছে একেবারে। কিন্তু কেন উনি অকস্মাৎ এভাবে চলে গেলেন? কেন? কেন? এমন কি ঘটলো এই দু-একদিনের মধ্যে যার জন্য উনি সব ছেড়ে একেবারে চলেই গেলেন? ইন্দ্রজিৎ ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারলো না। পিতৃহারা মাতৃহারা ইন্দ্রজিত আজ সত্যিই মা-বাবা হারালো। চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল ওর, কিন্তু পুরুষমানুষের পক্ষে সেটা অসম্ভব। কাবেরীদের বাড়ীতে পৌঁছেই ও শুয়ে পড়লো একটা ঘরে। মা এসে বললেন,

—মেয়ের কাছে সবই আমি শুনলাম ইন্দ্র—ওঁর প্রয়োজন হয়েছে, গেলেন—ওঁর পথে ওঁকে যেতে দাও বাবা।

—উনি গেলেন মা, কিন্তু আমরা একেবারে পিতৃহীন হয়ে গেলাম।

—ওঁর কাজ কর বাবা—জীবনের সবশক্তি দিয়ে ওঁর কাজ শেষ কর।

—তাই যেন করতে পারি মা।

ইন্দ্রজিত কিন্তু কোনো রকমেই স্বস্তি পাচ্ছে না। গুরুদেবের চিন্তা তো আছেই, তাছাড়া স্বাহার জন্য, সেজুতির জন্য সহস্র চিন্তা ওর মাথায় কিলবিল করছে। সেজুতির কি হবে? স্বাহা বৌদি কি করে সহ্য করবে স্বামীর অধঃপতন! লকুই বা আপনার মনের বিরুদ্ধে কতকাল সমর্থন করে চলবে দাদাকে তার! বড়দা যে-ভাবে ডুবছেন, তাতে ঐ আজন্ম সত্যনিষ্ঠ দেশসেবক পরিবারটা গোটাই ডুবতে বসেছে! উদ্ধারের কোনো উপায় কি নেই? ওদের পেলে ইন্দ্রজিৎ তার গুরুদেবের কাজটা আরো ভালো ভাবে করতে পারতো!

মোহিতবাবুও শুনেছেন ইন্দ্রজিতের গুরুদেবের প্রব্রজ্যা নেওয়ার কথা। বিকালের দিকে উনি ইন্দ্রজিতেকে ডেকে লনে বসিয়ে নানান কথা বলে তার মনটা ভাল করবার চেষ্টা করছিলেন। ইন্দ্রজিত শুনে বলল আস্তে,

—গুরুদেবের অসমাপ্ত কাজের জন্য জীবনের সবই সে ব্যয় করবে—সে কাজ মহান শুধু নয়—সে কাজ আগামী দিনের ভারতে অবিনশ্বর গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

মোহিতবাবু আনন্দিত হচ্ছিলেন শুধু এই ভেবে যে কন্যাকে তিনি তার মনোনীত পাত্রেই অর্পণ করতে পারবেন। কিন্তু ইন্দ্রজিতের এই নিরাসক্তি তাঁকে পীড়িত করছিল কিঞ্চিৎ। যতই হোক, ধনিক এবং ধনবাদী তিনি।

—মানুষকে মানবতার দিকে এগিয়ে নেওয়ার কাজ নিশ্চয় বড় কাজ ইন্দ্রজিত, কিন্তু মানুষের জৈব-জীবনটাও অগ্রাহ্য করা চলে না; এ দুইএর সমন্বয় হওয়া দরকার।

—সমন্বয় করা হয়েছে ঋষিপ্রদর্শিত পথে। ভারতীয় সাধনায় ঐক্যই মূল কথা, সেই ঐক্যকে অবলম্বন করে জাগবে একাত্মবোধ,—সমস্ত মানব-গোষ্ঠির একতা। এ কথা অবশ্য আজ কল্পনা বলে মনে হতে পারে কিন্তু একদিন এই মানুষের রাজ্যে ঘটবে অতিমানসের আবির্ভাব-যার ধী-বুদ্ধি মন, অহঙ্কারে থাকবে জৈবজীবনকে অবলম্বন করে জীবাতীত জীবনকে লাভ করার আকুতি—কিন্তু তা হয়তো বহু দূরের কথা—বর্ত্তমানে মানুষের সদবৃত্তিগুলোর অনুশীলন করুক মানুষ…

—মানুষের মধ্যে অসদবৃত্তির প্রাবল্য বড্ড বেশি ইন্দ্রজিত!

—ওটা সাধারণ জীবধর্ম্মী—কিন্তু মানবধর্ম্ম অনাদি কাল থেকে জীবধর্ম্মকে পরাজয় করার সাধনা করে আসছে!

—আজও কিন্তু সক্ষম হোল না…মা বললেন হেসে।

—সক্ষম হয়েছে মাতৃত্বে—মমত্বে…মহত্বে! রণক্ষেত্রে নিরস্ত্র শত্রুকে নিরাপদে মুক্তি দান থেকে অন্ধজনকে লাঠি ধরে রাস্তা পার করে দেওয়ার মধ্যে যে মাতৃএষণা, তাকে কিছুতেই সাধারণ জীবধর্ম্ম বলা যায় না মা—সেটা মানবধর্ম—মৃত্যুঞ্জয় মনোধর্ম্ম সে। অসৎ প্রবৃত্তি তাকে যতই আক্রমণ

করুক, ধূলিসাৎ করুক, সে অমর মানুষের অন্তরে। আর আমাদের ঋষিগণ এই মৃত্যুঞ্জয় মহদ্ধর্ম্মেরই অনুশীলন করতে বলেছেন...।

ইন্দ্রজিতের কথা সব সময়ই আবেগময়—সাধারণ কথাকেও সে হৃদয়াবেগ দিয়ে বলতে অভ্যস্থ—যুক্তিকে অতিক্রম করেও জয়ী হয় যে কথা শ্রোতার হৃদয়ে। ওঁরা আর কিছু বললেন না। ইতি মধ্যে টেলিফোনে খবর এলো যে বড়দা, লকু আর সুবোধবাবু এসে পৌঁছেছেন বিকালের ট্রেনে কলকাতায়। বড়দা কাল ভোরেই বিদেশে যাবেন। ইন্দ্রজিত এখন এলে দেখা হতে পারে। ইন্দ্রজিত আবার রওনা হোল; গিয়ে শুনলো—সেজুতির দাদা আছেন হাসপাতালে—উৎপলা লকুকে নিয়ে গেছে সেখানে। অতি সাবধানে পিতৃবিয়োগের খবরটা তাঁকে দিতে হবে—তাই উৎপলা নিজে নিয়েছে সে-ভার। ইন্দ্রজিত গিয়ে দেখলো, বড়দা খুবই বিমর্ষ হয়ে আছেন। বিশেষ কোনো দুর্ঘটনা আবার ঘটলো নাকি? কিন্তু কি ভাবে জিজ্ঞাসা করবে? হয় তো দূর বিদেশে যাচ্ছেন বলেই মন খারাপ! কিন্তু সত্যি কি তাই? কিম্বা স্বাহা বৌদির সঙ্গে সংঘর্ষ কিছু ঘটেছে? ঘটাই স্বাভাবিক। স্বাহার মত তেজস্বিনী মেয়ে স্বামীর এই পতন নিশ্চয় বরদাস্ত করবে না!

—এসো ইন্দ্রজিত—তোমার গুরুদেবকে দেখতে যাবার খুবই ইচ্ছে ছিল আমাদের কিন্তু যাওয়া ঘটে উঠলো না। শুনলাম, তিনি নাকি তীর্থ-ভ্রমণে গেলেন!

—হ্যাঁ, হয় তো আর দেখা হবে না—ইন্দ্রজিতের চোখ ছলছল করে উঠলো।

—তা না হোক, তিনি তাঁর কাজ ভাল ভাবেই করে গেছেন—বড়দা বললেন—শুনলাম, আদি যুগের বিপ্লবী তিনি—ওঁরা সবাই একে একে

আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন—যেন অভিমান করেই চলে যাচ্ছেন আমাদের ওপর! প্রায় সকলেই গেলেন!

কণ্ঠস্বরে কেমন যেন ব্যথার আর্দ্রতা, ইন্দ্রজিত লক্ষ্য করলো, বললো,

—ওঁরা ভারতমাতার স্বাধীনতা-যজ্ঞের আদি ঋত্বিক। আজ স্বাধীন-ভারতের সন্তানদের অধঃপতন ওঁদের ব্যথিত তো করবেই বড়দা—নীতি যেদেশে নৈতিক শক্তিকে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলে—নেতা যেখানে নিজ জনেরই পোষণপরায়ণ, রাষ্ট্র যেখানে অন্ধের মমত্বে ধৃত দুর্য্যোধনের পিতা, সেখানে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নচারী ওঁরা থাকতে পারছেন না... গুরুদেব কোনো কারণ বলেন নি, তবু আমি বুঝতে পেরেছি! কিন্তু যাক্ সে কথা, আপনাকে যেন অসুস্থ লাগছে?

—না—হ্যাঁ—অত দূর যাব। তাছাড়া—বড়দা একটু থেমে বললেন—মানুষ নিজেকে বড় করতে চায় ইন্দ্রজিত—মহৎ করতেও চায় সে নিজেকে কিন্তু সত্যিকারের মহৎ হওয়া বড় কঠিন সাধনা। সর্ব্বভূতে সমদর্শনের যোগদৃষ্টি আমাদের নেই—নৈতিক দীপকরাগ মানবতার বীণাযন্ত্রে তো আমরা বাজাই না—বাজাই জীবনের জৈব তাগিদে! জীবনকে বাস্তব দিক থেকে পূর্ণ করাই তাই লক্ষ্য হয় সুযোগ পাবামাত্র; কিন্তু জীবনের অবাস্তব স্বপ্নটাই বোধহয় বৃহত্তম—আদর্শটাই বোধ হয় সত্যিকার শান্তিভূমি।

—কথা ঠিক বড়দা। আদর্শের মহত্তম রূপের পানেই মানবাত্মার অনিবার্য্য গতি!

বড়দা আর কিছু বললেন না। লকু আর উৎপলা ফিরে এলো। সেঁজুতির দাদাকে খবরটা দেওয়া হয়েছে—দুঃখের সীমাহীনতা এই যে পিতাপুত্রে দীর্ঘকাল দেখা হয় নি—আর হোল না ইহজগতে। কিন্তু বীর পুত্র, বীরের মতই পিতার তিরোধান-শোক সহ্য করতে পারবেন। শুধু সেঁজুতি আর তমালের চিন্তাটা তাঁকে কিঞ্চিৎ বিমর্ষ করেছে!

বড়দা আর সুবোধ থাকবেন গ্রাণ্ডহোটেলে। লকু এখানেই থাকবে; আর ইন্দ্রজিতও থাকবে আজ—কারণ লকুর সঙ্গে তার কিছু পরামর্শ আছে—ভাবীযুগের সাহিত্যের মধ্যে তাদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে প্রচারিত করার বিষয় নিয়ে। বড়দা আর সুবোধ চলে গেলেন হোটেলে। লকুর সঙ্গে অনেক কথাই হোল ইন্দ্রজিতের, কৃষ্ণার এবং উৎপলারও। লকু বলল, —সাহিত্যকে কোনো কিছু প্রচারে নিযুক্ত করা যায় না। সাহিত্য স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ রস। অবশ্য সাহিত্য চিরদিনই সুন্দরের উপাসক—কদর্য্যতাকে চাবুকমারা তার স্বভাব। জনৈক ইংরেজ লেখক সেদিন বলেছেন: "In America and in England a good writer is the watch-dog of society. His job is to satirize its silliness, to attack its injustices, to stigmatize its faults. And this is tha reason that in America neither society nor Government is very fond of writers. The two are completely opposite approaches toward literature. And it must be said that in the time of the great Russian writers, of Tolstoy, of Dostoeyaski, of Turgenev, of Chekhov, and of the early Gorkey, the same was true to the Russians. And only time can tell whether the architect of the soul approach to writing can produce as great a literature as the watch-dog of society approach. So far, it must be admitted, the architect school has not produced a great piece of writing" লকু বলে চললো—সঙ্ঘবাদ সাহিত্যে অচল। অথচ মানুষ আজ সঙ্ঘপন্থী। ব্যক্তিগত সত্ত্বা ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এই সঙ্ঘ-পন্থার আশ্রয়ে। এখন জীবনকে বিকশিত করার

ভার পড়ছে ষ্টেট, ইউনিয়ন বা বুরোর হাতে। কিন্তু শুধু সঙ্ঘশরণ যে কতবড় দুর্ভাগ্য এনেছিল এই ভারতেই,—ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। অথচ বুদ্ধদেব সঙ্ঘের সঙ্গে ধর্ম্মের শরণও নিতে বলেছিলেন। শুধুমাত্র সঙ্ঘশরণ সাহিত্যিক্যের কাজ নয়, কর্ত্তব্যও নয়। তার কাজ মানুষের রস-পিপাসার পরিতৃপ্তি সাধন। ·প্রচারের জন্ম সাহিত্য নয়, সাহিত্য প্রাণকে উদ্দীপিত করবার জন্ম, আনন্দিত করবার জন্য ; রসস্বরূপ সে, আত্মা-রূপী ঈশ্বর তার উপাসনার বিষয়।

—অনেক রাত হয়েছে, এবার শুয়ে পড়ুন দেখি! উৎপলা অভিভাবিকার সুরে আদেশ করলো। সত্যি রাত সাড়ে বারো! ইন্দ্রজিতও বলল,

—থাক এ আলোচনা আজ।

শুয়ে পড়লো ওরা। ভোরে উঠে দমদম বিমান ঘাটিতে বড়দাকে বিদায় দিয়ে এল। ইন্দ্রজিত দেখলো, বড়দার মুখ তেমনি বিষণ্ণ। ইন্দ্রজিতকে বললেন, বিদেশে যতখানা পারেন, ইন্দ্রজিতের মিশন প্রচার করবেন তিনি।—আরো কয়েকটি কথা উনি বললেন ইন্দ্রজিতকে একান্তে ডেকে,

—জানি না, কি করছি ইন্দ্রজিত, হয়তো পিতৃঅভিশাপ লাগছে, হয়তো ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে হেয় হয়ে উঠছি, হয়তো তোমার বৌদির চোখে বীভৎসতার মূর্ত্তি হয়ে গেলাম···তবুও ফিরতে পারছি না—অসহায় যেন আমি আজ।—সত্যি অসহায়ভাব জেগে উঠছিল চোখে ওঁর।

উনি উড়ে যাওয়ার পর লকু আর সুবোধ বেরুলো বাজার করতে। বিস্তর জিনিষ কেনবার আছে সুবোধের। সেঁজুতি-গ্রামকে সাজাবার জন্য, সেখানকার স্কুল, লাইব্রেরী ইত্যাদির জন্য। তাছাড়া নিজের বাড়ীর জন্যও কিছু কেনা-কাটা করতে হবে। সারাদিন প্রায় কেটে গেল ঐ সব করতে। লকু বলল,

—চলো সুবোধ, কোনো একটা মুভিতে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিই।

—চলো। সুবোধের যেন কিছুমাত্র উৎসাহ নেই। লকু অনুভব করছে, কিন্তু কি সে বলবে! সন্ধ্যাটা কাটালো একটা মুভী দেখে। তারপর বেরিয়ে সুবোধ গেল হোটেলে, লকু এলো উৎপলার আশ্রমে। ইন্দ্রজিত আগের দিনের আলোচনাটা চালাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। লকু ক্লান্ত, আলোচনা আজ আর চলল না—শুধু কথা হোল যে লকুর সাহিত্য লোক-সাহিত্য হয়ে লোকোত্তর সাহিত্যের পানে অগ্রসর হবে—আর সেই অগ্রগতির পথে মানববাদই হবে আদর্শ।

পরদিনও কেটে গেল জিনিষপত্র কেনা-কাটা করতে। সন্ধ্যায় লকু আর সুবোধ গাড়ীতে চড়লো। সঙ্গে প্রকাণ্ড ছবি আছে দুখানা মহাত্মা গান্ধীর; মোড়লের জন্য একখানা কিনেছে সুবোধ। ঐ ছবি লকুর হাতে দিয়ে সে বললো—তুমি ওঁর পূজারি! দেখো, যেন ভীড়ে ভেঙ্গে না যায় কাঁচগুলো!

অতি সাবধানে উপরের তাকে বসিয়ে রাখলো লকু ছবি দুখানি।

প্রথম শ্রেণীর কামরা। সুবোধ সারা পথ কেবল সিগারেট টানছে আর একখানা বই পড়ছে। বইখানা শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ। ঐ বইএর একটা চরিত্রের নাম সুরেশ, তারই জন্য গৃহদাহ হয়ে গেল। সুবোধের নামের সঙ্গে ধ্বনিগত সাম্য আছে লোকটার। সুবোধও গৃহদাহ করতে পারে! না। সুবোধ বইখানা শেষ করার সঙ্গে আর একবার জোরে বললো,—না।

—কী না ? লকু ঘুমের ঘোরেই প্রশ্ন করলো। জবাবে সুবোধ হেসে বলল,—না, নো, নেহি—এইতো সর্ব্বত্র। ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয় না, ঈশ্বরকে খুঁজে মেলে না, মনের জিজ্ঞাসার জবাব মেলে না, মৃত্যু-পারের রহস্যের খবর মেলে না,—সবই 'না'।

—ঐ 'না' টা অনন্তে গিয়ে 'হ্যাঁ' হয়ে যায়—কিন্তু ভোর বেলা একথা কেন সুবোধ ?

—উষার প্রকাশের সঙ্গে আমার মনের অন্ধকারটা নাশ হোক, তাই বলছি।

ষ্টেশন এসে পড়েছে। আর কথা চললো না। জিনিষপত্র নামানো হোল। দুখানা গাড়ী এসেছে ওদের নিতে। একখানা 'কার' একটা 'জীপ'; জিনিষগুলো জীপে তুলতে বললো সুবোধ তার। লকুর সামান্য জিনিষ নিয়ে কারে উঠলো দুজনে। খানিকটা এসে সেই টিনের প্লেটে লেখা "সেজুতি গ্রামে যাবার পথ"—সুবোধ কার থেকে নামতে নামতে বলল—তুমি বাড়ী চলে যাও, আমি জিনিষগুলো ঐ 'সেজুতি গ্রামে' দিয়ে পরে যাব—নেমে গাড়ীর দরজাটা বন্ধ করছে সুবোধ।

—এটার নাম তুমি 'সেজুতিগ্রাম' রাখলে কেন সুবোধ ? লকু অকস্মাৎ প্রশ্ন করলো।

—সেজুতিকে ভাগ করে নিয়েছি। তুমি ওকে নাও, আমি শুধু নামটুকু নিলাম। জানো তো—কৃষ্ণের থেকে কৃষ্ণের নাম বড়—হাসছে সুবোধ, হাসিটা কী করুণ ! কী কোমল ! কী মর্ম্মান্তিক ! দরজাটা জোরে ঠেলে দিয়ে চলে গেল সুবোধ জীপে উঠতে। লকু দেখতে পেলো, ওর চোখে জ্যোতির্ম্ময় আলো একটা ! এ কোন সুবোধ ?

—সুবোধ !—লকু ডাকলো,

কিন্তু জীপে উঠেই সুবোধ চালাতে বলেছে গাড়ী, শুনতে পেল না।

প্রায় চার মাস কেটে গেল, ভারতের স্বাধীনতা-বার্ষিকী উদযাপিত হবার দিন এগিয়ে আসছে। আয়োজন হচ্ছে সারা ভারতে। জাতীয় জীবনে নানা দুর্ভাগ্য দেখা দিয়েছে, তথাপি এই দিনটি জাতির জীবনে পরমোৎসবের দিন। সুবোধ আয়োজন করেছে, মন্দিরের সুবিশাল প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করাবে বড়দাকে দিয়ে। তিনি ঐ দিন আসবেন বিদেশ থেকে। সেজুতি-গ্রামে এখন বেশি সময় থাকে সুবোধ। গ্রামটাকে যেন সারা অন্তর দিয়ে ভালবাসে ও। মানুষের পদধ্বনিতে, কণ্ঠসঙ্গীতে আর কলকাকলিতে উপলাকীর্ণ সেই বিজন প্রান্তর অপরূপ আবাস হয়ে উঠেছে। ওদিকে ফ্যাকটরীতে বিস্তর লোক অন্নসংস্থান করবার সুবিধা পায়। সুবোধ দেখে আর ভাবে, এই গ্রাম হাজার বছর টিকবে—মানবী সেজুতির আয়ু আর কদিন! বড় জোর শ'খানেক বছর কিন্তু সুবোধের গ্রাম-সেজুতি অবিনশ্বর।

ওদিকে সায়ন্তনী সহরটা এখনো গড়ে উঠতে পারলো না, খবর রাখে সুবোধ। তবে ওখানে নাকি অনেক ভাল ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওটা সহর। হোক—সুবোধ সহর চায় না। গ্রামের সান্ধ্যপ্রদীপটাই চেয়েছিল সে।

মন্দিরের পাকা ব্যবস্থা করেছে সুবোধ এর মধ্যে। মন্দিরটা সারিয়েছে, সাধুমোহান্ত এসে থাকবে, তার জন্ম ঘর করে দিয়েছে, নিত্য ভোগের বরাদ্দ বাড়িয়েছে। সব থেকে বেশি করেছে, জাতিধর্ম-নির্ব্বিশেষে এখানে প্রবেশাধিকার পায়। যে-কেউ দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারে, পূজা করতে পারে; কিন্তু আশ্চর্য্য, সুবোধ এতবড় খবরটা কোনো খবরের কাগজে ছাপায় নি। এই দেব মন্দির আজ শুধু উপাসনালয় নয়, সর্ব্বজাতির মিলনতীর্থ। মন্দিরের সামনে মার্ব্বেল-ফলকে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিয়েছে সুবোধ—

"এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য, হিন্দু-মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার—
এসো হে পতিত করো অপনীত সব অপমানভার।
মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গল ঘট হয় নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্রকরা তীর্থনীরে…"

স্বাধীনতা উৎসব দেখতে নিমন্ত্রণ করেছে সুবোধ সেজুতিগ্রামের সকলকে, সায়ন্তনীতেও নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে। তাছাড়া উৎপলা, কৃষ্ণা, কাবেরী, ইন্দ্রজিৎ এমনকি মোহিতবাবুকে পর্য্যন্ত বাদ দেয় নি। অযুত লোকের বিরাট সমারোহ হবে ওখানে। লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীতের ব্যবস্থাও করেছে। এ ছাড়া বাজীপোড়ানো, ব্যায়াম প্রদর্শন ইত্যাদিতো আছেই। শ্যামলিমার হাতে মেয়েদের ব্যবস্থার ভার…স্বাহা আর সেজুতির হাতে সমস্তটা দেখবার ভার দিয়েছে।

আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে উঠলো। বড়দা সকালেই নামবেন। আজই স্বাধীনতা-দিবস। দীর্ঘ চার মাস পরে আসছেন তিনি। গাড়ী নিয়ে

সুবোধ গেছে তাঁকে আনতে। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে মন্দির, প্রান্তর, নদীকূল। বর্ষার স্তবকাবনম্র তরু-বল্লরী; সুবোধের 'কার' বড়দাকে নিয়ে ফিরছে, সঙ্গে সুবোধ। উনি এসে পতাকা উত্তোলন করবেন।

নাটমন্দিরের ওদিকে সাধু-মোহান্ত এসে থাকবার জন্য কয়েকটা চালাঘর তৈরী করিয়ে দিয়েছে সুবোধ। দুতিনজন সাধু ওখানে আছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বিশেষ অসুস্থ। দুর্গা, পুরোহিতঠাকুরের মেয়ে, ওঁর মাথায় জল দিচ্ছিল আর হাওয়া করছিল। সুবোধ গাড়ীথেকেই প্রশ্ন করলো,

—কি হয়েছে দুর্গা ?

—এঁর শরীর ভাল নেই, বড় অসুস্থ আছেন।

সুবোধের মনটা খারাপ হয়ে গেল। এমন শুভদিনে কে একটা রুগী এসে ওখানে আশ্রয় নিয়েছে আবার! দুর্গাকে হেঁকেই বললো,—ডাক্তারকে খবর দে দুর্গা···ওঁরা চলে এলেন।

অসুস্থ সাধু দুর্গাকে শুধুলেন—কে এলো মা, কে কথা বললো ?

—এলেন বড়দা—রণাদীশ! উনিই পতাকা তুলবেন।

—আমাকে একবার নিয়ে যাবি মা ? দেখবো।

—আপনি বড় দুর্ব্বল—যেতে পারবেন না।

—যেতেই হবে। মৃত্যুর পূর্ব্বে এই উৎসব আমাকে দেখতেই হবে। বলেই উঠে পড়লেন। দুর্গা এবং আর দুজন সাধু ওঁকে ধরে নিয়ে এলো। সর্ব্বাঙ্গে চাদর ঢেকে এলেন। জ্বর রয়েছে ওঁর গায়ে এখনো।

নামলেন বড়দা জয়ধ্বনির সঙ্গে। ক্লান্তিতে যেন মুখখানা অত্যন্ত শুষ্ক, বিমর্ষ—না, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, হয়তো আনন্দে অবশ। ধীরে এসে

দাঁড়ালেন দণ্ডের কাছে। কাবেরী, উৎপলা, কৃষ্ণা, সেজুতি এবং অল্প দূরে স্বাহাও মাল্যাকারে ঘিরে দাঁড়িয়েছে দণ্ডটিকে। গণাধীশও ওখানে ইন্দ্রজিতের কোলে চেপে দেখছে—কি কলবে ওটা ?

—ঐ পতাকা ঐ নীলোজ্জ্বল আকাশে তুলে দেবেন তোমার বাবা, যেখানে জ্বলছে ঐ চিরজ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য।

বড়দা পতাকা উত্তোলন করবার পূর্ব্বে সমবেত জনতাকে বাণী দিচ্ছেন, —"আমাদের জাতীয় স্বপ্ন শুধু স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন নয়, আমরা চাই স্থায়, সত্য, সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক স্বাধীন রাষ্ট্র..."

—মিথ্যা কথা!...কে যেন কোথায় বিদ্রূপ করে উঠলো!

—আমরা চাই এক নূতন সমাজ, এক নূতন রাষ্ট্র, যার মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠবে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ, পবিত্র আদর্শগুলি...

—মিথ্যা কথা...আবার কে কোথায় বিদ্রূপ করছে। কে ?

—ভারতের মহাজাতির মহাসাধনাকে মূর্ত্ত করবার জন্ত আমাদে মাতৃভূমির সন্তানগণ আজ অধিকতর ত্যাগ-তপস্থার জন্য প্রস্তুত হোন...

—মিদ্যাবাদী! ত্যাগ আর তপস্থার ভণ্ডামী করে কোন্ লজ্জায় তুমি এই পবিত্র পতাকা স্পর্শ করতে যাও...অসুস্থ সন্ন্যাসী সিংহবিক্রমে এসে হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন দণ্ডটা—সরে দাঁড়াও কুকুর!

স্তব্ধ জনতা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কে ঐ সন্ন্যাসী? আশ্চর্য্য সাহস তো! সুবোধও খুঁব বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু সন্ন্যাসী গায়ের চাদরখানা ফেলে দিলেন, এবং সুবোধ তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলো—এঁর সঙ্গেই দেখা হয়েছিল কিছুদিন আগে এই মন্দিরেই। কিন্তু লোকটা তো অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করলো! বড়দা থরথর করে কাঁপছেন—হয়তো রাগে। সুবোধ বললো চেঁচিয়ে—সরে যান ঠাকুর—সরে যান...।

—না—সন্ন্যাসী সুগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—এই পতাকা তোমার রণাধীশের ছোঁবার অধিকার নেই। শোন সব, মরণের দ্বারপ্রান্তে এসে আমি আজ এই পতাকা উত্তোলনের সৌভাগ্য লাভ করেছি—ইন্দ্রজিত!

ইন্দ্রজিত গণাধীশকে কোলে নিয়েই এগিয়ে এল। সন্ন্যাসী বললেন, —আমার মৃত্যুর পর মুখাগ্নি করবে তোমার কোলের ঐ ছেলেটা—আর এই পতাকা আমি ওরই হাতে তুলে দিলাম—ছেলেটাকে ইন্দ্রজিতের কোল থেকে টেনে নিলেন, বললেন—

কর্মভার নবপ্রাতে নব সেবকের হাতে
করে যাব দান…

গণাধীশ দড়ি টেনে পতাকাটা তুলে দিচ্ছে। বেশ মজা লাগছে ওর। সন্ন্যাসী উর্দ্ধ পানে চেয়ে দেখছেন আর গণুকে সাহায্য করছেন। পতাকা তুলে বললেন,—মৃত্যু আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আজ, ইন্দ্রজিত—ঐ কাপুরুষ কুলাঙ্গার অর্থলোভী দস্যু যেন আমার মৃতদেহ স্পর্শ না করে; দেখবি তুই।

—বাবা, বাবা, চাকরী আমি ছেড়ে দিয়ে এসেছি—বড়দা চীৎকার করে উঠলেন—বাবা, আমি প্রলোভনকে জয় করেছি বাবা…ক্ষমা করুন…

—ছেড়ে দিয়েছিস…আমার নিষ্ঠায় তোর পুনর্জ্জন্ম লাভ হোক! রণাধীশ—চিরবিজয়ী পুত্র আমার…সন্ন্যাসী দুবাহু বাড়িয়ে রণাধীশকে কোলে নিতে গেলেন, কিন্তু ওঁর কোলে গণাধীশ—আর মাঝে পতাকার দণ্ডটা। উনি ওখানেই পড়ে যাচ্ছেন। ছুটে এসে ধরলো ইন্দ্রজিত, রণাধীশ, নকু, স্বাহা, সেজুতি, সুবোধ! ধীরে ধীরে ভারতের স্বাধীনতার পতাকামূলে শুয়ে পড়লেন সন্ন্যাসী! অত্যধিক উত্তেজনায় হার্টফেল হয়েছে।

ইন্দ্রজিত ডাকলো—গুরুদেব, প্রভু, পিতা!

আকাশের জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য সমবেত গণদেবতার উপর প্রভাতের আলোকাশিস্ বর্ষণ করছেন। গণাধীশ তখনো দণ্ডটা ধরে হাসছে; বললো,—কেমন উল্‌ছে কাকু! দেখ।

বীরের চিতায় বীর্য্যাগ্নি,—মৃত্যুর শ্মশানে মৃত্যুঞ্জয় শিশুদেবতা!